নগরসুন্দরী ও নাগর

সুভাষ সমাজদার

সাহিত্য
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৪৪

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর : ভোলানাথ পাল : স্টার প্রিন্টিং প্রেস

২১ এ, রাধানাথ বোস লেন : কলিকাতা-৬

চোদ্দ টাকা

প্রথম স্তবক

নগরসুন্দরী বারনারী সুলসার খরযৌবনের
মতই ছিল তার ক্ষুরধার প্রত্যুৎপন্নমতি।

—সুলসাজাতক

একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল।

কাজলআঁকা করুণ দুটো চোখ। দোলানো খোপায় রজনীগন্ধার কুঁড়ি। দীঘল শরীরটা পেঁচিয়ে পরেছে গোলাপী রঙের সিল্কের শাড়ি।

শীতের রাত। কনকনে ঠাণ্ডা। উত্তুরে হাওয়া বইছে। চৌরঙ্গী রোড আর পার্ক স্ট্রীটের মোড়ের মত ট্র্যাফিকের গর্জনে মুখরিত রাস্তাতেও গাড়ি চলাচল কমে এসেছে। থেকে থেকে দু'একটা 'প্রাইভেটকার' হুস হাস শব্দ তুলে দূরে অন্ধকারে উধাও হয়ে যাচ্ছে। এই শীতার্ত রাত্রে প্রায় জনহীন নির্জন পথে ভদ্রমহিলা একেবারে একা। হযতো পথ হারিয়ে ফেলেছে। কিংবা হঠাৎ কোন কারণে সঙ্গী ছাড়া হয়ে পড়েছে।

আপনি কোথায় যাবেন—আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি—এসব কথা আমার মুখে এসে গিয়েছিল। পথে ঘাটে বিপন্ন কোন মহিলাকে দেখলে যেমন হয় আর কি। এমন সময় হঠাৎ একটা গাড়ির হেডলাইটের উগ্র সাদা আলোর ঝলক এসে পড়ল তার মুখে! ও কী!—এ কে?—এ কাকে দেখছি!

ফুটপাতের আবছা অন্ধকারে তার যে চোখদুটো বিষন্ন ও করুণ বলে মনে হয়েছিল। সেই চোখেই স্পষ্ট দেখলাম, আমন্ত্রনের হাতছানি। লিপষ্টিক মাখা শুকনো ঠোঁটে মিটি মিটি হাসি। সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের ভেতরটা কেমন শিরশির করে উঠল। আর মুহূর্তের ভেতরে আমি তার পাশ কাটিয়ে দ্রুত—যত দ্রুত সম্ভব হাঁটতে শুরু করলাম। আমার আর বুঝতে বাকী রইল না—কে সে!—কেন সেই শীতের রাতে, ঠাণ্ডা শাঁ শাঁ বাতাসকে অগ্রাহ্য করে কিসের আশায় দাঁড়িয়ে আছে? নিঃসন্দেহে সে আর কেউ নয়। সে—

পিক্ আপ গার্ল!

কখন—কখন—কতক্ষনে নারীমাংসলোলুপ কোন পুরুষ আসবে আর তাকে সযত্নে আদরে ডেকে নিয়ে তার হোটেলে কি কোন আশ্রয়ে তুলবে। তার সঙ্গসুখের জন্য তাকে ন্যায্য পারিশ্রমিক দেবে। রাত্রি শেষে দেহ-বেসাতির সেই কয়েকটা টাকা ব্যাগে ফেলে সে ক্লান্ত, অবসন্ন পায়ে তার আস্তানায় ফিরবে! এটাই তার জীবিকা—

সে দেহপোজীবিনী। সে পিক্ আপ গার্ল!

দূরে গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন বিশাল গড়ের মাঠের দিকে তাকিয়ে আমার ভাবনাও বিস্তীর্ণ হয়ে যায়। পিক্ আপ গার্লস (Pick up Girls), কল গার্লস (call girls), গুড ফাইন গার্লস (Good Fine girls), সোশ্যাল হোষ্টেস (Social Hostess), ইত্যাদি নানা আধুনিক নামের 'লেবেল' লাগিয়ে পৃথিবীর আদিমতম ব্যবসা—এই পতিতাবৃত্তি চলেছে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে। দুনিয়াজুড়ে সমাজবিজ্ঞানীরা, রাষ্ট্রনায়করা, জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতেরা বেশ্যাবৃত্তি দূর করতে চেষ্টাও করে চলেছেন। তাঁরা কেউ বলছেন—বর্তমান যুগের সর্বনাশ বীভৎসতা এই ঘৃণ্য দেহব্যবসা; কেউ বলছেন—পৃথিবীর দেশে দেশে ক্রমবর্দ্ধমান 'প্রষ্টিটিউশান' আর কিছুই নয়—সমগ্র মানবসমাজ যে দারুণ একটা অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছে—এ তারই ইঙ্গিত। কিন্তু—

কিন্তু সৃষ্টির প্রথম মানবী না কি পুরুষকে দেহ দান করেছিল সামান্য একটু খাদ্যের লোভে—Accepts coitus in exchange of foods! আবার কেউ বলে দেবদাসী প্রথা থেকে এর উদ্ভব। তাহলে মানুষের ইতিহাসের একেবারে গোড়া থেকে যে ব্যবসায় সূত্রপাত, অর্থনীতি আর ধর্মের চোরাগলি দিয়ে যার প্রবেশ, পৃথিবীর বুক থেকে তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা আদৌ কখনও সম্ভব হবে কি না, সেসব নিয়ে জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতরা মাথা ঘামাচ্ছেন—আরও মাথা ঘামাবেন। যাক সেসব কথা—

বারনারী।

গণিকা।

কথাগুলোর গায়ে মাখানো নোংরা পাঁকের আড়াল থেকে কিন্তু উঁকি দেয় ফুলের মত শুভ্র আর শাশ্বত একটি সত্য—বারাঙ্গনার পেশাই হলো মনোরঞ্জন করা। বলাবাহুল্য, পুরুষের চক্ষু ও মনকে উৎফুল্ল করার জন্য শুধু যৌবন আর স্বাস্থ্যই যথেষ্ট নয়। দেহকে ছাড়িয়ে দেহাতীত অনেকগুলো গুণ থাকা বাঞ্ছনীয় এবং অধিকাংশ রূপজীবিনীর তা থাকে। তারা শুধু সপ্রতিভ নয়, নৃত্যগীত পটিয়সী। সুচতুর। তাদের কথায়, ব্যবহারে প্রখর বুদ্ধির আভাসও পাওয়া যায়। তাই হয়তো বেদেও উল্লেখ আছে বেশ্যাবৃত্তির। বাৎসায়ণের কামসূত্র তো বটেই, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রও বারাঙ্গনাকে বাদ দিয়ে অর্থনীতির হিসাব কষতে পারেন নি। আমাদের পূর্বসূরীরা বারাঙ্গনাকে সমাজে যে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন তার ইঙ্গিত বহন করছে প্রাচীন সাহিত্যে, কাব্যে,

জাতকে থরে থরে সাজানো অনেক আদর আর সম্মান ও শ্রদ্ধা দিয়ে গড়া তাদের এক একটা নাম—

নগরশোভনা।

নগরসুন্দরী।

জনপদবধূ।

জাতক কাহিনীর এক একটি নায়িকা নগরশোভনা রূপসী গণিকার কারো অসাধারণ বুদ্ধি, কারো গভীর মানবতা বোধ আবার কারো পাপের অন্ধকার থেকে উত্তরণের বিস্ময়কর ইতিবৃত্ত আমাদের মুগ্ধ করে। যেমন—

সুলসা জাতকের নায়িকা সুলসা।

সুলসা।

অপূর্ব সুন্দরী। দীর্ঘ ভাটিয়ালী গানের সুরের মতো তার দেহবল্লরী। কাজলটানা বড় বড় দুটো ডাগর চোখে চঞ্চল দৃষ্টি। ঘন মেঘের মত কালো চুল তরঙ্গায়িত হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে একেবারে পিঠের নীচ পর্যন্ত। আর গায়ের রঙ?

ফরসা? দুধে আলতা মেশানো?

না।

কোনটাই নয়। জাতকে আছে—উষা সমাগমে যেমন আকাশের রঙ হয়ে ওঠে নীলকৃষ্ণবর্ণ তেমনি আশ্চর্য রকমের ঈষৎ কালো রঙের আভায় মেশানো নীল ছিল তার গাত্রবর্ণ।

সুলসা।

নগরশোভিনী গণিকা।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে সুলসা নাম্নী এক নগরশোভনা রূপজীবিনী ছিল। সে পঞ্চশত বর্ণদাসী পরিবৃতা হইয়া বাস করিত এবং প্রতি রজনীর জন্য এক সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিত .....

এই কথা দিয়ে শুরু হয়েছে তার বিচিত্র কাহিনী।

বারাণসীর এক প্রান্তে এক সুরম্য অট্টালিকা। তার সামনে মনোরম উদ্যান। সেই উদ্যানে নানাবর্ণের ফুলের বিচিত্র সমারোহ। স্তবকে স্তবকে ফুটে রয়েছে বেলী, হাসনুহানা, মালতী আর কলাবতী—আরও কত রকমের ফুল।

সেই ফুলের বনের মাঝখানে শ্বেতপাথরের বেদী। বেদীর ওপরে নীলাভ

নিবিড় ছায়া ফেলেছে বহুকালের প্রাচীন এক বকুলগাছ। মৃদু বাতাসে ঝরে পড়ছে বকুল—টুপ—টাপ—

সেই সকালে যখন রোদের সোনা গলে গলে পড়ছে বকুল আর শিরিষের পাতায় পাতায়, যখন ফুলে ফুলে মৌমাছি গুণ গুণ করছে, ঠিক সেই সময় সেই সুরম্য প্রাসাদের দোতলায় অলিন্দ থেকে ভেসে এল ত্রিরত্নাদি বন্দনার সুমধুর সঙ্গীতের সুর—তিরতিনেষু কায়েন বাচায মনসা পি চ, পমাদেন কতং ভন্তে সর্ব্বং দ্যোসং খমন্তু মে।

প্রমাদবশত বারভোগ্যার ঘৃণিত জীবনযাপন করে যে অপরাধ করছে ভগবান তথাগত যেন তা মার্জনা করেন · ···তার কৃতকর্মের অনুশোচনা, তার নিবিড় ব্যথা যেন ঝরে ঝরে পড়ছে সেই বন্দনা গানের ভেতরে। সেই গানের সঙ্গে দোহার ধরছে আরও কতগুলো স্ত্রী কণ্ঠ।

সুলসা তার সাথীদের সঙ্গীত শিক্ষা দিচ্ছে। শুধু নগরশোভনা বারবণিতা নয়—শুধু সুন্দর রূপজীবিনী নয়—

নৃত্যগীতপটিয়সী স্বনামধন্যা এক যুবতী নারী এই সুলসা।

সুলসা নামে যেন এক যাদু আছে। সেই পৌরানিক কালের বারাণসীর প্রতিটি মানুষ তাকে এক ডাকে চিনতো। তার বাড়ির পথ কে না চেনে। তার কাছে স্বয়ং বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত থেকে শুরু করে স্বর্ণ শ্রেষ্ঠী আমীর ওমরাহ উজীরদের ভীড় লেগে থাকতো। সে রাণীর মহিমায় বিরাজ করতো সহরের প্রতিটি মানুষের মনে। থাক এখন সে সব কথা—যা বলছিলাম—

সেই মনোরম প্রভাতে যখন মৃদুমন্দ বাতাসে বকুল ঝরছিল, সুলসার বন্দনা গানের মধুর সুরে চারিদিকের বাতাস কেমন আচ্ছন্ন আর বিবশ হযে আসছিল সেই সময় এক আগন্তুক সুলসার প্রাসাদের দেউড়ীতে এসে দাঁড়াল।

কি চাই? প্রতিহারী এসে সামনে পথরোধ করে দাঁড়াল।

আমি সুলসাদেবীর দর্শনপ্রার্থী!

এখন তার সঙ্গে দেখা হবে না—

কেন?

দিনের আলোয় কখনো তিনি কারো সঙ্গে দেখা করেন না—

কিন্তু আমি বহু—বহু দূর থেকে আসছি ভাই—তাঁকে আমায় খুব প্রয়োজন—

প্রতিহারী আর কোন কথা বলল না। তার পাথুরে মুখে নির্বিকার কাঠিন্য ফুটে উঠল। আঙুল দিয়ে অদূরে উদ্যানের কোণে একটি ঘরের দিকে ইঙ্গিত করল।

আগন্তুকের মুখে আশার আলো ফুটে উঠল। সে ধীরপায়ে এগিয়ে গেল সেই লতাবিতানে ছেয়ে থাকা ঘরের দিকে।

ভেতরে আসতে পারি?

আসুন—এক পক্ককেশ বৃদ্ধ ভাঙা ভাঙা গলায় সম্ভাষণ জানাল। যুবক তার কাছে তার অভিপ্রায় বলতেই তিনি বিরাট একটা খাতা খুলে চোখ দুটো কুঞ্চিত করে বললেন, উঁহু আজ সন্ধ্যায় তো বারাণসীর স্বর্ণশ্রেষ্ঠী ধনকুমার আসবেন, একটু থেমে আবার বলল, শুধু কি একজন—কোশলের রাজা, কৌশম্বীর নগরপাল এবং মগধের পৌরসংস্থার অধিকর্তারা আসবেন—

আমি তো শুধু মাত্র একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই, যুবকটি সবিনয়ে বলল, বিশ্বাস করুন আর কোন অভিপ্রায় আমার নেই—

বৃদ্ধ সেই আগন্তুকের মুখের দিকে তাকালো। পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত। আর বড় দুটো চোখে কি কাতর দৃষ্টি। আস্তে আস্তে বলল, চলুন দেখি—

সুসজ্জিত কক্ষের পর কক্ষ পার হয়ে চলল সেই বৃদ্ধ। আগন্তুকের চোখে মুখে বিস্ময়ের দৃষ্টি!

ঘরে ঘরে মেহগিনির ময়ূরপঙ্খী খাট। দেওয়ালে দেওয়ালে স্বপ্নের নীলাভ রঙ। সেই ঘন নীল দেওয়ালে সুদক্ষ শিল্পীর হাতে আঁকা কুঞ্জবনের ছায়াভাস, আবার কোন দেওয়ালে আঁকা দূর বিসর্পিল ধূলি-ধূসরিত পথ। পথপ্রান্তে বিশ্রামরত শ্বেতকপোতের মত নিরালা গ্রাম্য কুটির।

ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠে পা দিতেই থমকে দাঁড়ালো তরুণের হৃদস্পন্দন। এত বিপুল ঐশ্বর্য আর বৈভব। সে-ঘরে-ইন্দ্রধনুর মত নীলমণিখচিত স্বর্ণ ও রত্ননির্মিত তোরণ। শিল্পীরা বৈদূর্য, মুক্তা, প্রবাল, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীল, কর্কেতর, ও মরকত সাজিয়ে রাখছে। সোনার সুতোয় মানিকের মালা গাঁথছে। বৈদূর্যমণিগুলো ঘসছে। শঙ্খ কাটছে। শানযন্ত্রে ফেলে গোল করছে প্রবালগুলো।

যুবকের মনে হল সে যেন একটা মধুর স্বপ্নের রাজ্যের ভেতর দিয়ে চলেছে! তারা যত যায়, পথ ফুরোয় না। ঘর আর শেষ হয় না।

শেষপর্যন্ত স্বর্ণমণ্ডিত এক গোলাপ জলের ঝরণার পাশ দিয়ে এক দীর্ঘ

অলিন্দের দুধারে সুদৃশ্য ও চিত্র বিচিত্র রঙীন টবে সাজানো চন্দ্রমল্লিকা আর রজনীগন্ধার ভেতর এসে দাঁড়ালো। সেখানে যেন চাঁদের হাট।

পঞ্চশত সখী পরিবৃত্ত হয়ে বসে আছে নগরশোভনা গণিকা সুলসা। সখীরা প্রত্যেকে তরুণী। সুঠাম অঙ্গসৌষ্টব। তাদের মিষ্টি গলার খিল খিল হাসির ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো কথায় সেখানকার আকাশ বাতাস মুখরিত।

কি ব্যাপার! এখন সাক্ষাৎপ্রার্থী নিয়ে এসেছেন—

যুবক বহুদূর পথ অতিক্রম করে এসেছে—শুধু একবার আপনাকে দেখতে চায়—করজোড়ে বলল সুলসার সাক্ষাৎপ্রার্থী নিয়ামক সেই বৃদ্ধ!

সুলসা কোন কথা বলল না। তার সুর্মা টানা ভ্রুলতা তীব্র ক্রোধে বঙ্কিম হয়ে উঠল। শুধু আদেশের মত গম্ভীর আর কর্কশ গলায় বলল, এইবার তো আমাকে দেখা হয়েছে—এবার ওকে নিয়ে যান—

যুবকটির বুদ্ধি বিবেক যেন অভিভূত আচ্ছন্নতায় হারিয়ে গেছে। লুপ্ত হয়ে গিয়েছে চৈতন্য!

এই অতুলনীয় রূপরাশি কোন মানুষের হয়? যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে কোন অপ্সরী!

সুলসা কাজলটানা দুটো ডাগর চোখের কোণা দিয়ে যুবকটির সুন্দর মুখে তার কঠোর আদেশের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল।

না। বিন্দুমাত্র ব্যথার ছায়াভাস নেই, নেই কোন দুঃখের বিষন্নতা। যেন মুগ্ধ এক ভক্ত দেবী দর্শনে একেবারেই বিমোহিত।

যুবকটি নির্বিকার বলেই যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠল সুলসা। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল তার কর্মচারীকে, দাঁড়িয়ে আছেন কেন—ওকে নিয়ে চলে যান—একটু থেমে আবার বলল, আপনি তো জানেন দিনের আলোয় আমি কোন পুরুষের মুখ দেখিনা—

তারপর?

তারপর আর কি?

রূপের পসারিণীদের লীলা বোঝা ভার। যার ঘরে নিত্যরাত্রে বারো-বাসরের লীলা আর যার প্রমত্ত নিশির নায়ক নিত্যি নতুন নতুন ধনবান ও

সুদর্শন যুবাপুরুষ, সে-কে জানে, কোন অকারণ খেয়ালে বিতাড়িত করল অনিন্দ্যসুন্দর এই যুবককে!

তরুণ আগন্তুক পলকহীন চোখে সুলসার দিকে তাকিয়ে রইল।

চলুন—চলুন—আর দেরী করবেন না—

আমি—আমি কিন্তু আপনার প্রতি রজনীর যে দক্ষিণা এক সহস্র মুদ্রা—তাও সঙ্গে এনেছিলাম—যুবক সুলসার দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল।

তার সঙ্গে একটা কথাও বলল না সুলসা। শুধু সেই বৃদ্ধকে ইঙ্গিত করল তাকে নিয়ে যেতে। আর দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল, ওই অর্বাচীনকে বলে দেবেন বারাণসীর সুলসা কখনো মুদ্রার লোভে যে কোন সময় পুরুষকে সঙ্গ দান করে না—

তরুণের মুখে কে যেন কালি দিল। অপমানে দুঃখে অনুশোচনায় তার বুকটা ভারী—খুব ভারী হয়ে উঠল। কিন্তু আর একটি কথাও বলল না। মাথা নীচু করে সে চলে গেল। আর ঠিক—

সেইদিন।

সেইদিন ঘটে গেল কাণ্ডটা। দুপুরে রাজপথে একটা ঢ্যাঁড়ার শব্দ বেজে উঠল—ডুগ—ডুগ—ডুগ—ডুগ—

শোন শোন বারাণসীবাসী—

মহারাজা ব্রহ্মদত্ত আদেশ দিয়েছেন—শক্তুক নামে নাগবলসম্পন্ন অসম্ভব শক্তিশালী এক তস্কর শহরের উপকণ্ঠে খুব দৌরাত্ম্য করছে—তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য জনসাধারণের সহযোগীতা চাই—ডুগ—ডুগ—ডুগ—ডুগ—

বারাণসীতে আশঙ্কার ছায়া নামল। শহরবাসীর সুখী জীবনের ভেতরে বিষ ঢালল সেই নাগবলে বলীয়ান শক্তুককে ঘিরে দুশ্চিন্তা। কে জানে কখন অতর্কিতে আর নিঃশব্দে সাপের মত এসে পড়বে সে। আর সর্বস্ব লুটে নিয়ে একেবারে নিঃস্ব করে দেবে!

দিন কাটে। মাস যায়। শহরবাসীরা ঘন ঘন খবর নেয় *নগরগুপ্তিকের কাছে—শক্তুক কি ধরা পড়ল। নগরগুপ্তিকের মুখে কালো ছায়া।

শুধু মাথা নাড়ে আর বলে—পারিনি—এখনও—পারিনি—

ওদিকে সুলসার সেই প্রমোদভবনের জীবনের হাসি উল্লাস গানের আর

---

* নগরগুপ্তিক—বৌদ্ধযুগের আরক্ষা অর্থাৎ পুলিশ বিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অধিকর্তা।

মুগ্ধ স্তাবকদের মিষ্টি মিষ্টি কূজনের ভেতরে কোথায় যেন ছন্দপতন হয়ে গিয়েছে!

স্তাবকরা ধরতে পারে না। বুঝতে পারে না—কেন সুলসার বড় বড় দুটো চোখের কোণে কোণে বিষণ্ণতার ছায়া জমে থাকে, কেন নিশিরাত্রে আশ্লেষ-ক্লান্ত আর বিনিদ্র প্রণয়ীর উষ্ণ আলিঙ্গন পাশ থেকে বেরিয়ে এসে অলিন্দে প্রেতিনীর মত পায়চারী করে। তারা কেউ জানে না।

তারা জানে না, সেই আশ্চর্য সুন্দর তরুণের মুখাবয়ব তার মনে আঁকা হয়ে আছে।

কত শত রজনীতে কত সৌমকান্তি অগনন নাগর তার কাছে এসেছে। তাদের বিপুল ঐশ্বর্যের সঙ্গে তাদের অন্তরের অগাধ প্রীতিও উজাড় করে দিয়েছে তাকে। আবার কেউ দুস্থ ভিখারীর মত তার পা দুটো ধরে তার প্রণয় ভিক্ষা করেছে। তাদের কাউকে অকারণ খেযালে দূরে ছুঁড়ে দিয়েছে। আবার কাউকে কাছে টেনে নিয়েছে। তাদের কণ্ঠলগ্না হয়ে কত প্রমত্ত নিশিযাপন করেছে। কিন্তু—আশ্চর্য। ঘসা ঘসা কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা বহু বহু দূরের দৃশ্যের মত কেমন অস্পষ্ট আর ঝাপসা হয়ে গিয়েছে তাদের মুখগুলো। কিন্তু—কিন্তু মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য যাকে দেখেছে তাকে ভুলতে পারছে না কেন? কেন—কেন সে বুকের ভেতরে একটা তীব্র জ্বালা ধরিয়ে দিতে পারল। কেমন করে তা সম্ভব হলো। সে নিশ্চয়ই যাদু জানে। তানাহলে সে শ্রেষ্ঠা বারাণসী সুন্দরী। তার জ্বালাধরা রূপের আগুনে কত অসংখ্য তরুণ পতঙ্গের মত পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আর সে আজ নিজেই পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে কেন—আর কোন যুবকের অমন দেবতার মত দিব্যকান্তি সুঠাম তনু সে কখনও দেখেনি বলে? কেন—কেন যে তাকে নির্মমভাবে ফিরিয়ে দিল?

তার নিজের রূপরম্য দেহকান্তির ওপরেই মর্মান্তিক আক্রোশে সে জ্বলে যেতে লাগল। এই পোড়া রূপই তাকে গর্বিত করেছে। করে তুলেছে দাম্ভিক, ভাবতে শিখিয়েছে সব পুরুষই এক ধাতুতে গড়া! সে ভেবেছিল—যেমন হয়, একবার ফিরিয়ে দিলেও সে আবার আসবে—

অনুতাপে জ্বলে। বুকের ভেতরে কান্নার ছলো ছলো ঢেউ ওঠে। তার মনে হয় শক্তুক বারাণসীর ধনীদের ধনদৌলত অপহরণ করেছে সত্যি, কিন্তু তার সর্বস্ব যেন অপহরণ করে নিয়ে গেছে সেই অনিন্দ্যসুন্দর যুবক!

কয়েকদিন পর।

সুলসা স্নানান্তে ভিজে চুল এলো করে ছাদে ধীর পায়ে পায়চারী করছিল। তাকে মনে হচ্ছিল ভোরের শিশিরে ভেজা স্থলপদ্ম—কিন্তু কেমন ম্লান বিষন্ন! বুকের ভেতরে সেই ক্ষতমুখ থেকে নিঃশব্দে রক্ত ঝরছে।

ডুগ—ডুগ—ডুগ—হঠাৎ ভোরের বাতাসকে সচকিত করে আবার ঢ্যাঁড়া বেজে উঠল।

ঘোষক চৌমাথার মোড়ে উঁচু বেদীতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল—সেই নাগবলসম্পন্ন তস্করকে গতরাত্রে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই কিছুক্ষণ পরেই শহরবাসীদের চিনিয়ে দেওয়ার জন্যেই তাকে প্রধান রাজপথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে—

সুলসার মন খারাপ। তবুও কৌতূহলী হলো। একটু পরেই কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে এলো বিশাল শোভাযাত্রা। সর্বাগ্রে নগরগুপ্তিক! তার চোখে গর্বের দৃষ্টি। তারপরেই নগরের প্রধান কোতোয়াল এবং আরক্ষা বিভাগের আরও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী। আর—

আর তারপরেই সেই নাগবলসম্পন্ন অসম্ভব শক্তিশালী সেই তস্কর শক্তুক! পিঠমোড়া করে বাঁধা। হাতদুটো শৃঙ্খলাবদ্ধ। আর যমদূতের মত প্রহরীরা চতুষ্কের কষাঘাত করতে করতে তাকে মশানে অর্থাৎ বধ্যভূমিতে নিয়ে চলেছে।

কিন্তু ও কি! বুকের ভেতরে থমকে দাঁড়াল হৃদস্পন্দন। মাথার ভেতরটা ঝিম ঝিম করে উঠল।

তস্কর—কে এই তস্কর! তার বুকের ভেতরে যে মুখের ছবি আঁকা হয়ে আছে—এ যে সেই মুখ। থর থর করে কেঁপে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে বদ্ধ একটা উন্মাদিনীর মত ছুটে এল রাজপথে। পাঁচশত সখী অসংখ্য পরিচারক পরিচারিকা সবাই বিস্মিত!

একি সুলসা তুমি! তুমি নিজে এসেছ রাজপথে। নগরগুপ্তিকের মুখে সাফল্যের হাসি।

আপনি একটু আমার সঙ্গে আসবেন। আপনার সঙ্গে কথা ছিল—খুব—খুব জরুরী!

নগরগুপ্তিকও সুলসার অনুগ্রহপ্রার্থী। বারাণসীর কোন পুরুষ তার একটু মিষ্টি হাসি, একটু প্রিয়সম্ভাষণের কাঙাল নয়? অতএব—

অতএব শোভাযাত্রাকে দাঁড় করিয়ে স্থুলসার মন্ত্রণাকক্ষে এল নগরগুপ্তিক। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল। কিন্তু—

তার মুখে চিন্তার ছা.া।

তার বুকে তখন শুভ নি শুভর লড়াই। একদিকে তস্কর গ্রেপ্তারের সাফল্যের জন্যে পদোন্নতি আর একদিকে পর পর তিনটি রজনীতে স্থুলসার কবোষ্ণ সান্নিধ্যের সাদর আমন্ত্রণ, উপরন্তু নগদ পাঁচ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

শোভাযাত্রা চলে। কাড়ানাকাড়া বাজে। আরক্ষা বিভাগের প্রধানের বুকের ভেতরে চিন্তার ঢেউ ওঠা নামা করে। কত রাত্রে হাতে বেলীফুলের মালা জড়িয়ে সুসজ্জিত পোষাকে এসেছে স্থুলসার প্রাসাদের সামনে। কিন্তু তখন আমীর ওমরাহ রাজা উজীরদের ভীড়। অতএব অনুমতি মেলেনি। বুকে জ্বালা নিয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু—

এইবার?

কয়েকদিন পরেই গভীর শোকের ছায়া নেমে এল বারাণসীতে। নাগবল সম্পন্ন সেই তস্কর প্রহরীর সতর্ক প্রহরার বেড়া ডিঙ্গিয়ে পালিযেছে।

রাত নেমেছে ঘন হয়ে।

আকাশে জ্বলছে তারার দীপালি। স্থুলসা শক্তুকের কণ্ঠলগ্না হয়ে বসে রয়েছে। স্থুলসার ঘন চুলে হাত বুলিযে দিতে দিতে সে বলল, তুমি আমার জন্য প্রতি রাত্রে এক সহস্র মুদ্রার রোজগার ছেড়ে দিলে?

আমি তোমার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারি—তীব্র একটা ব্যথায় স্থুলসার বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। দারুণ আবেগে আর কিছু বলতে পারে না—

কি জানি, তুমি আমার ভেতরে কি পেলে? শক্তুক হাসে। আর তার বুকের ভেতরে উল্লাসের কলধ্বনি বাজতে থাকে।

দিন কাটে।

শক্তুক আর স্থুলসার আনন্দমুখর জীবনের দিনগুলো নীল আকাশে সাদা মেঘের মত ভেসে ভেসে চলে যায়।

রাত্রির পর রাত্রি স্থুলসার দেহ উপভোগ করে এবং তার পরম আদরে ও যত্নে আরও বহুকালই শক্তুক কাটাতে পারতো কিন্তু—

তা হলো না।

আর তা হবেই যদি তাহলে একদিন স্থুলসার কাছে শক্তুক এসেছিল কেন রবাহুত হয়ে?

যখন সারা বারাণসী জুড়ে তাকে খোঁজা হচ্ছিল তখন নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ের জন্য সে এসেছিল সুলসার কাছে। সে জানে, যেখানেই খোঁজা হোক না কেন, রাজপুরুষদের মাথার মণি, সুলসার কাছে কেউ আসবে না।

শুধু কি তাই ?

আরও একটি ভয়ঙ্কর—অতি ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য ছিল নিষ্ঠুর সেই তস্করের।

আরও দিন যায়।

শক্তুকের বুকের ভেতরে লোভের দৈত্যটা গজরায় আর ফোঁসে।

একদিন সে বলল, সুলসা আমি দেবাদিদেবের পূজা দেব—

কেন ?

আমি যখন ধরা পড়েছিলাম, মহাদেবের কৃপায় দেবীর মত আবির্ভূতা হয়ে তুমি আমাকে উদ্ধার করেছ। তাই দেবাদিদেব আমাকে পূজা দিতে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন—

বেশ, ওই মহাকাল পাহাড়ে শিবের মন্দিরে ষোড়শপোচার পূজা উপকরণ পাঠিয়ে দেব, শক্তুকের চওড়া বুকে মাথা ঘসতে ঘসতে কিশোরীর মত আদুরে গলায় বলল সুলসা।

না, ভদ্রে, পূজার উপকরণ পাঠালেই চলবে না, শক্তুক সস্নেহে তার পিঠে হাত রেখে বলল, আমরা নিজেরা পূজা দেব—তুমি আমার সঙ্গে যাবে সর্ব আভরণে মণ্ডিত হয়ে—

বেশ—বেশ—তাই হবে গো—তাই হবে, খিলখিল করে হেসে উঠল সুলসা। হাসির রেশ টেনে বলল, আমাকে সালঙ্করা দেখতে বুঝি তোমার খুব ভাল লাগে—

দেখতে দেখতে এসে পড়ল দেবাদিদেবের পূজার সেই শুভদিন। সেদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে যখন পূবের আকাশে জাগল ভোরের রেখা, তখন সুলসা ধীর পায়ে এল তার প্রসাধনকক্ষে। দাঁড়ালো তার বিশাল সুদৃশ্য আরশির সামনে। সে আজ সাজবে। সাজবে তার প্রাণাধিক প্রিয় প্রেমাস্পদের মনের মত করে। প্রথমেই বুকের সেই একজোড়া উদ্ধত দুরন্ত গ্রহকে বন্দী করল সোনার চুমকী বসানো কাঁচুলীতে। পেঁচিয়ে পরল গরদের গঙ্গাজলী শাড়ি। ঘি রঙের সেই বস্ত্রাভরণের আড়ালে দীপশিখার মত জ্বলতে লাগল তার দেহ-বল্লরী। তারপরেই পুষ্ট নিতম্বমণ্ডলে পরল সোনার ঘাঘর কিঙ্কিনী, গলায়

ঝুলিয়ে দিল গজমতি, কানে পরল কর্ণপুর, নাকে মুক্তাবলী ! হাতত্নটোতে টাড় বালা পরতে যাবে এমন সময় আয়নায় কার ছায়া পড়ল—

কে—কে ওখানে ?

আমি—আমি শম্বুক—কেমন ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্পষ্ট গলায় বলল সে।

ও মা ! তুমি চোরের মত বাইরে কেন ? এস না ভেতরে—

শম্বুক এল। আর তার চোখদুটো যেন ধাঁধিয়ে গেল। এত স্বর্ণাভরণ—এত ঐশ্বর্য ! এসব—এসব সুলসার ! মনের ভেতরের তীব্র উত্তেজনা সংযত করে কেমন নিস্পৃহ আর শীতল গলায় বলল, এই তোমার সব গয়না ?

বলো কি তুমি—এ তো কিছুই না, চঞ্চলা কিশোরী যেমন তার নিজের প্রিয় কোন জিনিস তার সখীদের দেখাতে ভালবাসে, তেমনি করে সুলসা তার হাত ধরে টেনে নিয়ে এল রৌপ্যখচিত মেহগিণি কাঠের বাক্সের কাছে। তার ডালা খুলতেই শম্বুকের চোখদুটো লোভের আভায় চক চক করে উঠল। কেমন অভিমানী গলায় বলল, আমার সঙ্গে যাচ্ছো বলে তুমি কিছুই পরলে না—অন্য কোন নাগরের সঙ্গে—

কি বলছো তুমি ? সাপিনীর মত দুলে উঠল সুলসার দীঘল দেহটা। কান্নায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলল, তুমি ছাড়া আর কোন পুরুষের কথা আমি কল্পনাই করতে পারি না—তা কি তুমি—আর কিছুই বলতে পারল না। মনের অবরুদ্ধ ব্যথা কণা কণা জল হয়ে গড়িয়ে পড়ল চোখ বেয়ে।

শম্বুক তাকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরে বলল, আচ্ছা—আচ্ছা—আর বলবো না—ঘাট হয়েছে। কিন্তু আমি যে যে গয়না পরতে বলবো—তাই পরবে তো তুমি—?

নিশ্চয়ই—শম্বুকের আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত উঠে দাঁড়ালো সুলসা। সেই বাক্সটার ডালা খুলে বলল, বলো—কি কি পরতে হবে—

তুমি ওই হারটা পরো—

ও মা—এই গজমতির সাতসেরী হারের ওপরে আবার ওই মুক্তাপ্রবাল মণিময় হার !

তা হোক—

অগত্যা গজমতির ওপরেই মুক্তাপ্রবাল মণিময় কণ্ঠহার পরল সুলসা।

ও কি মোটা মোটা টাড় বালাদুটো রেখে দিলে কেন—ওপরের হাতে পরো—

সুলসা ওপরের বাহুতে পরল টাড়বালা। সঙ্গে সঙ্গে শম্বুক বলল, একী দুটো হাতে শুধু শঙ্খবলয় পরেছো কেন? ওই সোনার কঙ্কনদুটো পরো না?

এমনি করে শম্বুকের নির্দেশে সুলসা সর্বাঙ্গে সর্ববিধ স্বর্ণাভরণে সুসজ্জিত হয়ে যাত্রা করল মহাকাল পাহাড়ের উদ্দেশে। যেতে যেতে শম্বুক পরম পরিতৃপ্তিতে চোখ বুজে বলল, এইবার আমার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে! দেবাদিদেব স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন, সর্বাভরণেভূষিতা হয়ে তুমি যাবে—

বারাণসী ছাড়িয়ে অনেক—অনেক দূরে জনশূন্য এক একটা প্রান্তর ছাড়িয়ে ছোট ছোট দুটো নদী পেরিয়ে তারা পৌছল মহাকাল পাহাড়ের নীচে। সেখানে এত ঘন অরণ্য যে সূর্যের আলো প্রবেশ করে না। সেই নিবিড় বনের নীলাভ স্যাঁতসেঁতে ছায়ায় দাঁড়িয়ে দূরে—বহুদূরে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে আগত পূজার্থীদের দিকে ইঙ্গিত করে বলল শম্বুক—সুলসা, এত লোকজনের ভেতরে পূজা দিলে তো দেবতা খুশী হবেন না—

তাহলে কি করবে—মন্দিরে তো পুজো দিতে লোকজন আসবেই—

চল—এই পাহাড়ের একেবারে শিখরেও মহাদেবের একটা মন্দির আছে—আমরা শুধু দুইজন সেখানে পূজা দেব—

বেশ—তাই চলো, দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত সুলসা। তবুও উৎসাহ করেই বলল, এত কষ্টই যখন করেছি—তখন এটুকু পারবো না—

খাড়া পাহাড়। জায়গায় জায়গায় পাহাড়ী বাঁশ আর লতা-গুল্মের বন। কখনো গাছের ডাল ধরে কখনো শিকড় আঁকড়ে ধরে কোনরকমে তারা ওপরে উঠতে লাগল। আবার কোথাও হয়তো রাস্তা আছে। কিন্তু সে পথ এত সংকীর্ণ আর তার পাশেই অতল অন্ধকারে আচ্ছন্ন গভীর খাদে অনিবার্য মৃত্যুর ইঙ্গিত। সেইসব বিপদসঙ্কুল আর দুর্গম পথে শম্বুক বারাণসী সুন্দরীর কবুতরের মত নরম আর হাল্কা দেহটাকে অবলীলাক্রমে পিঠে করেই নিয়ে অতিক্রম করে গেল।

পাহাড়ের শিখরে পৌছল তারা।

যেদিকে তাকাও কী বিশাল দিগন্ত। দূরে দূরে ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতা। মাথার ওপরের বিপুলব্যপ্ত নীল আকাশটা যেন নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে। কিন্তু—

কোথায় মহাদেবের মন্দির! প্রকৃতির সেই উদার অবারিত পরিবেশে সৃষ্টির প্রথম মানবীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে সুলসা! আস্তে—খুব আস্তে তার

মাখমের মত নরম দেহটাকে বুকের ভেতরে জাপটে ধরে শঙ্কুক বলল, সুলসা তুমি আমাকে খুব—খুব ভালোবাসো—

পরম একটা সুখের আবেশে আবিষ্ট হয়ে সুলসা বলল, তুমি বুঝতে পারো না ?

তুমি আমার জন্য সব করতে পারো—

বলো, কি করতে হবে—

হঠাৎ কেন যেন সুলসাকে ছেড়ে একটু সরে দাঁড়ালো সে। গঙ্গাজলী পট্টবস্ত্র পরিহিতা সেই অনিন্দ্যসুন্দর রমণীমূর্তি। হাতে নৈবদ্যের থালা। চোখে মুখে কেমন একটা আরাত্রিক পবিত্রতা। অনন্ত উদার সেই নির্জন প্রকৃতির পটভূমিতে শঙ্কুকের মনে হল—মনে হল, সুলসা মানবী নয়, দেবী। তাই সকালের প্রথম সূর্যের আলো পুণ্যের আলোর মত ঝরে ঝরে পড়ছে তার মুখে। তার মাথার পিছনে লাল আলোর গোলকটা জ্যোর্তিময় রেখার মত ফুটে রয়েছে। আর—আর মনে হল, সে ভুল করেছে মস্ত ভুল করেছে। যে উদ্দেশে এখানে এসেছে তা সে পারবে না—কখনো পারবে না—

বলো না গো, কি করতে হবে? সুলসা তার ভাবান্তর লক্ষ্য করে বলল, কি এত ভাবছো বলো তো ? আবার শঙ্কুকের বুকে মাথা রেখে যেন বহু-বহু দূর থেকে বলল, তুমি তো জানো, তোমার জন্য আমি হাসতে হাসতে মরে যেতেও পারি—

কী! সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কুকের বুকের ভেতরে লোভের দৈতটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল! বলল, সুলসা আমি পূজা দিতে আসি নি—

সে কী! বিস্ময়ে ছটফট করে উঠল সুলসার চোখদুটো। তাহলে কেন সাত সকালে এত কষ্ট করে এই দুর্গম পথে—

সুলসা, আমি এসেছি, দূরে—বহুদূরে কুয়াশাচ্ছন্ন দিকচক্রবালের দিকে তাকিয়ে খুব ঠাণ্ডা নিরাসক্ত গলায় বলল, আমি এসেছি, তোমাকে খুন করে তোমার গয়নাগুলো আত্মসাৎ করবো বলে—

তুমি বলছো কি গো! ও, তুমি বুঝি তামাসা করছো—

না। ঠাট্টা তামাসা নয় ভদ্রে, তুমি তোমার গয়নাগুলো একটা একটা করে খুলে ওই পুঁটলীতে বেঁধে ফেলো তো—এবার কেমন কর্কশ আর গম্ভীর শোনালো শঙ্কুকের কথাগুলো। এইবার-এইবার বারাণসী সুন্দরী শ্রেষ্ঠার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। শঙ্কুকের হিংস্র কঠোর মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে

হল, দীর্ঘদিন তার কবোষ্ণ সান্নিধ্যে থেকেও ওর সত্তাটার পরিবর্তন হয়নি, তার গভীর অন্তহীন ভালোবাসা ওকে ওর সেই অন্ধকার কবরখানা থেকে আলোতে নিয়ে আসতে পারে নি। অতএব—

অতএব মৃত্যু অনিবার্য। তবুও একবার—একবার মোহিনীশক্তি দিয়ে শেষ চেষ্টা করতে হবে। মুখে মোহমাখা হাসি ফুটিয়ে শক্তুকের কণ্ঠলগ্না হয়ে বলল, তুমি আমাকে খুন করবে—আমাকে হত্যা করতে তোমার হাত উঠবে? আমি যে তোমাকে কত ভালোবাসি—

বৃথা কথা বলে কালব্যয় করো না ভদ্রে। গয়নার পুঁটলীটা দিয়ে দাও—

তারপরে?

তারপরে তোমাকে ঠেলে খাদে ফেলে দেব—

আর একটি কথাও বলল না—বলতে পারল না সুলসা। তার ভয়, বিস্ময় সমস্ত অনুভূতি যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবুও নিজেকে সংযত করে কান্নায় ভার ভার কণ্ঠে বলল, আমার যা আছে সব—সব তুমি নিয়ে তার বদলে শুধু জীবনভিক্ষা দাও—

তা হয় না। নগরগুপ্তিক থেকে শুরু করে স্বয়ং বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত পর্যন্ত তোমার বয়স্য—তোমার অনুগ্রহপ্রার্থী—

আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি বারাণসীর কাউকে তোমার কথা বলবো না—আমার সমস্ত মূল্যবান আভরণ তুমি নাও—আমাকে শুধু বেঁচে থাকতে দাও গো—

তবুও শক্তুককে নির্বিকার থাকতে দেখে সুলসা আবার হাতজোড় করে যা বলেছিল তা জাতকে লেখা আছে—আমার যাহা আছে—তাহা লও, হও সুখী তুমি, চরণে তোমার দাসী বলি স্থান দাও। বলতে বলতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে খুলে ফেলল দেহের সব আভরণ, খুলল কাঁচুলী, আর পট্টবস্ত্র ও রঙীন অন্তর্বাস। নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাবরণ করে বলল, দেখ প্রিয়তম, আমার এই দেহটার জন্য বারাণসীর যে কোন পুরুষ সর্বস্ব দিতে পারে—সারা জীবন আমার পায়ের নীচে থেকে দাসত্ব করতে পারে। আর তুমি—তুমি আমাকে—আর পারল না। অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ল। ভোরের আলোয় নির্জন সেই পর্বতশিখরের পটভূমিতে তার সেই কান্না ভার ভার সম্পূর্ণ নিরাবরণ নগ্ন মূর্তিকে যেন কোন অভিশপ্ত অপ্সরীর মত মনে হচ্ছিল।

শক্তুকের মন ভিজল। যত বড় তস্কর হোক—চোখের সামনে উদ্ভিন্ন

যৌবনা নারীর নগ্ন দেহ। সে সুলসার বুকে নদী হয়ে মিশল। বলল, আর বলব না—তোমাকে নিয়ে কখনো এসব আর ভাবব না—আমি বড্ড অপরাধী—

কিন্তু রূপের পসারিণীর বুকে তখনঘৃণা আর বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি। কূটিল একটা দুরভিসন্ধি বিষধর সাপের মত ফনা তুলেছে তার বুকের ভেতরে। হাঁপ ছেড়ে সে বলল, বাঁচলাম—তুমি আমার জীবন দাতা—এস তোমাকে প্রণাম করি—

শত্রুকের কবোঞ্চ আলিঙ্গন থেকে উঠে এসে তাকে ঘিরে উল্লাসে নেচে নেচে ছড়া কেটে কেটে বলল—জীবনে তোমার এই বোধের উদয় হলে, তোমা হতে প্রিয়তর আর যে কেহ নাহি ভূমণ্ডলে। তিনবার প্রদক্ষিণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনবার প্রণাম করেই শত্রুকের সুডোল মুখে চুমু এঁকে দেওয়ার ভঙ্গীতে কাছে এগিয়ে এসেই দিল একধাক্কা—গভীর অতল অন্ধকার খাদের মধ্যে সশব্দে পড়ল সেই তস্কর। আর সুলসা—চিৎকার করে বলল, তোমার মত হীন, অকৃতজ্ঞ তস্কর বেঁচে থাকলে সমাজের অকল্যাণ হবে, বলেই বারাণসীর সেই নগরশোভনা গণিকা চারিদিক কাঁপিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল।

বহু জন্ম পরে ভগবান তথাগত লোভের পরিণাম বোঝাতে গিয়ে শিষ্যদের সুলসার এই কাহিনী বলেছিলেন। তারপরে ছড়া কেটে কেটে বলেছিলেন—

পুরুষ(ই) সর্বত্র পণ্ডিত, একথা বিশ্বাস যোগ্য নয়।
নারীর বুদ্ধিতে, হয় কভু কভু, পুরুষের পরাজয়॥

এই রূপসী বারাঙ্গনা সম্বন্ধে আরও বলেছিলেন—

পুরুষ(ই) সর্বত্র পণ্ডিত একথা, বিশ্বাস যোগ্য নয়।
নারীর প্রত্যুৎপন্নমতি, রমণী নিজের, দেখ বুদ্ধির পরিচয়।

দ্বিতীয় স্তবক

নগরশোভনা গণিকা নয়। শুদ্ধান্তঃপুরের এক কুলরমণীই সেই সর্বনাশা পাপ-লীলার নায়িকা—

—বন্ধনমোক্ষজাতক

জাতকের আর এক অঘটন-ঘটন-পটিয়সী নারী।

তবে এই অঘটন কিন্তু ঘটেনি কোন নগরশোভনা রূপজীবিনীর বার-বাসরে। ঘটেছিল একেবারে স্বয়ং বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজপ্রাসাদের শুদ্ধান্তঃপুরে। কিন্তু—

কে সেই সর্বনাশা পাপলীলার নায়িকা—কি হয়েছিল তার শেষ পরিণতি সে-সব জানতে হলে যেতে হবে, যেতে হবে আরও দূর অতীতে।

ভোরের আভাস জেগেছে পুবের আকাশে। ব্রহ্মদত্ত এল রাজসভায়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো ঐকতান। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেজে উঠল হাজারো নটীর নূপুর নিক্কনের ধ্বনি। বিভোর হয়ে গেল ব্রহ্মদত্ত। প্রতিটি রাজ-নর্তকী তন্বী, উদ্ভিন্ন-যৌবনা! নৃত্যের মুদ্রায় তাদের প্রত্যেকের পেশীর লীলাচপল ভঙ্গীতে, তাদের ক্ষীণ কটিদেশ আর সুপুষ্ট নিতম্বের বিভ্রমে বারাণসীরাজের অপলক দুটো চোখের দৃষ্টি মুগ্ধ হয়ে এল।

বিভোর আর তন্ময় ব্রহ্মদত্ত কিন্তু জানতে পারল না। জানতে পারল না, দূরে অন্তঃপুরের অলিন্দ থেকে চিকের আড়ালে আর একজোড়া চোখের খরদৃষ্টি তার বিমোহিত দু'চোখের মুগ্ধ দৃষ্টিকে অনুসরণ করছে। জানতে পারল না, আর একটা নারীর বক্ষদেশে হিংসার আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে।

এক সময়ে নাচ শেষ হলো। নৃত্যস্থলী শূন্য করে সুন্দরী নটীরা মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে একে একে বিদায় নিল।

ব্রহ্মদত্ত অন্তঃপুরে এল। এসেই দেখল, তার অগ্রমহিষীর (পাটরাণী) মুখখানা কেমন গম্ভীর আর কঠোর হয়ে উঠেছে। ব্রহ্মদত্তের মনে আশঙ্কার ছায়া পড়ল। তার এই অগ্রমহিষীটিকে সে খুব ভালো করেই চেনে। সে প্রচণ্ড অভিমানী। পান থেকে চুন খসলে সে রেগে অনর্থ করে। যেমন তীব্র তার অভিমান, রাগ তেমনি ভয়ঙ্কর, উদগ্র তার কামনা। একটি রাত্রিতেও নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে তাকে নিদ্রা যেতে দেবে না। সস্নেহে তার পিঠে হাত রেখে ভয়ে ভয়ে বলল, চিত্রা, তুমি আমাকে বলবে না? কি হয়েছে তোমার—

আস্তে মহারাজের হাতটা সরিয়ে দিল চিত্রা। কিন্তু একটা কথাও বলল না।

ব্রহ্মদত্ত তার নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করল, কোথাও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে কি না—

ওর মনে আঘাত লাগতে পারে, এমন কোন কাজ কি করেছে!

ব্রহ্মদত্ত নিঃশব্দে দাবদাহের মত জ্বলে যেতে লাগল। আর চিত্রা ধীর পায়ে কক্ষান্তরে চলে গেল।

রাত্রির মধ্যযাম।

বারাণসীর রাজপ্রাসাদের চারিদিকে কৃষ্ণা রাত্রির স্রোত বয়ে চলেছে। দূরে প্রধান দেউড়ীতে প্রহর ঘোষণা করে ঘণ্টা বাজল। রাত্রির নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে ঘণ্টার সেই ধাতব শব্দটা বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল বহুদূরে। প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে নাগবৃক্ষ থেকে একটা ভবন-শিখী আকুল হয়ে ডেকে চলেছে। হয়তো ডাকছে তার সঙ্গিনীকে।

এই ভবন শিখীর মতই বিনিদ্র নিশিযাপন করছে রাজ-অন্তঃপুরের নিভৃতে আরও দুটো প্রাণী।

ব্রহ্মদত্ত।

চিত্রা।

সুরম্য প্রকোষ্ঠ। দুগ্ধফেননিভ শয্যা। ময়ূরপঙ্খী পালঙ্ক সুগন্ধপুষ্পের বলয় দিয়ে পরিবেষ্টিত। ধাতব আধার থেকে গন্ধধূপের ধোঁয়া বাতাস ভারী করে তুলছে। না—কোথাও কোন ত্রুটি নেই। বিচ্যুতি নেই। নেই কোন অশান্তি।

তবুও—

তবুও ব্রহ্মদত্তের চেতনার ভেতরে নিদারুণ একটা অস্বস্তি তীক্ষ্মমুখ কাঁটার মত বিঁধছে। কি হয়েছে চিত্রার—কি হতে পারে! প্রতিটি রাত্রে সে শয্যায় এসেই বন্যার ভরা নদীর ঢেউয়ের মত তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে; আর তপ্ত চুম্বনে চুম্বনে তার সমগ্র মুখাবয়ব আচ্ছন্ন করে দেয়। প্রণয় রভসে কেমন আকুল হয়ে ওঠে। কঠিন কুচকলিকা আবেগে কোমল হয়ে যায়। একবার রমনেও যার উদগ্র কামনার আগুন নির্বাপিত হয় না। পুনঃপুন নানা কৌশলে রতিক্রীড়ায় তার লেলিহান লালসাকে তৃপ্ত করতে হয়। তারপর একসময় নিবিড় একটা সুখের অনুভবে আবিষ্ট হয়ে আশ্লেষক্লান্ত দেহটা শয্যায় এলিয়ে

দেয়। সেই চিত্রা—তার অগ্রমহিষী কৃশকরুণ, হৃতযৌবনা একটা মরা নদীর মত নিস্তেজ হয়ে শয্যার এক কোণে পড়ে রয়েছে। কেন?

কেন—কি হয়েছে তার? কি হতে পারে?

তার আরও এক সহস্র খরযৌবনবতী অপ্সরীর মত মহিষী আছে। তাদের কারো ঘনকৃষ্ণ মেঘের মত কেশদাম, কেউ বা মৃদুলগতি মরালীর মত —সেইসব রূপধন্যা সুযৌবনাদের কাউকে কখনও অঙ্কশায়িনী করা তো দূরের কথা, তাদের কারো সঙ্গে হাসিমুখে একটা বাক্য বিনিময় পর্যন্ত করে না। তাহলে?

গভীর উদ্বেগের কালরাত্রির আয়ু শেষ হয়। সর্বসাক্ষী আকাশে সূর্য ওঠে। কাঞ্চনময় মঞ্চে এসে বসে মহারাজ ব্রহ্মদত্ত! বসতে হয়, তাই বসে। গম্ভীর, বিষণ্ণ মুখ। তার মর্যাদার মত ব্যবধান রচনা করে বসে রয়েছে সভাসদ আর মাণ্ডলিকবর্গ। তাদের ভেতরে একজন স্তুতিগানে মহারাজাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে শুরু করল—

ত্রিভূবন প্রভাকর ওহে রাজেন্দ্রবর
গুণবান মহীয়ান হে প্রভাকর······

স্তুতিগানের পরেই অদূরে নৃত্যস্থলীর চারিদিকের যন্ত্রবাদকদের স্ব-স্বরযন্ত্রে ঐকতানের মৃদু মধুর ধ্বনি বেজে উঠল। ঝঙ্কার বাজতে লাগল বীণার তারে তারে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পদমঞ্জীরের মধুর নিক্কনে চারিদিক মুখর করে এল নৃত্যপটিয়সী রাজনর্তকীরা। প্রস্ফুটিত পদ্মকোরকের মত সজীব ও অনিন্দ্য সুন্দর তাদের এক একজনের মুখশ্রী। স্বাস্থ্য, যৌবন আর রূপ প্রখর হয়ে জেগে রয়েছে তাদের সুঠাম দেহে। এইবার—এইবার ব্রহ্মদত্তের চোখদুটো সজাগ হয়ে উঠল। আর তার স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল নর্তকীদের একজনের দিকে।

প্রধানা রাজনর্তকী—কাঞ্চনমালা।

সে কিন্তু মৃদঙ্গের গম্ভীর ধ্বনি আর জলতরঙ্গের মধুর উতরোল আওয়াজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নেচে চলেছে। আর আকণ্ঠ মধুপানে পরিতৃপ্ত একটা মধুকরের মত তন্ময় হয়ে দেখছে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত—সুনিপুনা নর্তকী কাঞ্চনমালার লীলাপূর্ণ বাহুবিক্ষেপ, ছন্দায়িত অঙ্গহার আর রত্নসূত্রে মণ্ডিত গুরুনিতম্বের বিভ্রম রচনাকারী বিচিত্র এক একটা মুদ্রা! মহারাজের দুচোখে কেমন একটা মুগ্ধ আচ্ছন্নতা থম থম করে। সেই ছন্দোসুরভিত মুহূর্তকে দীর্ঘ-

বিদীর্ণ করে রাজসভা এবং নৃত্যস্থলীর শেষপ্রান্তে স্ত্রীকণ্ঠের এক করুণ আর্তনাদ বেজে উঠল—মহারাজ, শীঘ্র একবার অন্তঃপুরে আসুন—অগ্রমহিষীর প্রধানা পরিচারিকা সুচরিতা ছুটতে ছুটতে এল। ভয়ে, আশঙ্কায় বিবর্ণ তার মুখ। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, মহারাজ, রাণীমা কেমন যেন করছেন—

সে কী! দ্রুত পায়ে ব্রহ্মদত্ত এল অন্তঃপুরে। কিসের যেন অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে তার অগ্রমহিষী। পরম স্নেহে তার উত্তপ্ত কপালে হাত রেখে ব্রহ্মদত্ত বলল, কি হয়েছে তোমার চিত্রা—রাজবৈদ্যকে ডাকবো—

তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে অগ্রমহিষী যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, বৈদ্য আমার এ যন্ত্রণার উপশম করতে পারবে না মহারাজ—

কেন—কি হয়েছে তোমার চিত্রা?

কোন কথা বলে না অগ্রমহিষী। কিন্তু আস্তে আস্তে শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তার মনের ভেতরের প্রচণ্ড যন্ত্রণাকে সংযত করে ধীর পায়ে ব্রহ্মদত্তের কাছে এল। তার কাজলটানা আয়তচোখে কান্নার ছায়া। কিসের এক মর্মান্তিক দুঃখে ক্ষোভে তার প্রতিমার মত সুন্দর ও সুডৌল মুখখানা করুণ হয়ে উঠেছে।

কি হয়েছে—আমাকে বলবে না? ব্রহ্মদত্তের কণ্ঠস্বর ব্যাকুল হয়ে ওঠে, গত কয়েকদিন থেকেই লক্ষ্য করছি তোমার এই ভাবান্তর, তুমি কি আমার কোন ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়েছো?

অগ্রমহিষীর এইবার মাথা নীচু করে কান্না অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, মহারাজ আমার মনস্তাপের কারণ পরে বলছি—তার আগে বলুন আমি যে বর চাইবো—আপনি তা দেবেন—

ব্রহ্মদত্তের দু'চোখে বিস্ময় ছটফট করে। বলে, তুমি তো জানো—তুমি আমার চোখের মণির মত, আমার বুকের ভেতরের প্রাণের ধুকধুকির মত—

অগ্রমহিষী জলভরা চোখদুটো চিকচিক করে। মুখে খুশীর হাসির ঝরণা। ব্রহ্মদত্তের নিশ্বাসের সীমানায় ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, মহারাজ প্রতিজ্ঞা করুন, আপনি আমাকে ছাড়া অন্য কোন নারীর মুখদর্শন করবেন না। তার চওড়া বুকে মাথা রেখে বর্ষার কদমফুলের মত রোমাঞ্চিত হয়ে বলে, মহারাজ আপনাকে এত ভালবাসি যে—আপনি অন্য কোন নারীর দিকে দৃষ্টি দিলে আমার বুকের ভেতরটা জলে যায়—পুড়ে যায়—

কিন্তু তুমি ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোককে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না—

হ্যাঁ দেখেছেন—দেখেছেন—একজন নয়—দুইজন নয়, সহস্র যুবতী নারীর সর্বাঙ্গে আপনার লোভী দৃষ্টি আমি নিজে দেখেছি—

বলছ কি রাণী? না-না এ কখনো হতে পারে না—

কথা বলল না অগ্রমহিষী। উদ্যত ফণা সাপিনীর মত দুলে উঠল তার সারা শরীর। চোখের কোনা দিয়ে মহারাজের ব্যথিত আর বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, মহারাজ প্রতিদিন প্রভাতে আপনার কি কাজ স্মরণ করুন—

কেন? নৃত্যস্থলীতে যাই—রাজনর্তকীদের নৃত্যগীত শুনি—

হ্যাঁ—তখুনি—তখুনি প্রতিটি নর্তকীর অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকে তাকান—আর আপনার দৃষ্টিতে কামনার ছায়া ফুটে ওঠে—

বলছ কি মহারাণী? কেমন নিভু নিভু গলায় বলে ব্রহ্মদত্ত।

একটু থামল অগ্রমহিষী চিত্রা। হিংস্র বাঘিনীর মত রুদ্ধ আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে সে অভিশাপ উচ্চারণের মত করে কেটে কেটে বলল, মহারাজ, আমি চিকের আড়াল থেকে প্রতিদিন—প্রত্যেকদিন আপনাকে লক্ষ্য করেছি, আপনি আপনার ওই প্রধানা নর্তকী কাঞ্চনমালার—ওই বারনারীটার মেদপুষ্ট দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকেন লোভীর মত—

চমকে উঠল ব্রহ্মদত্ত।

কিছুক্ষণ কথা বলে না কেউ।

অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতায় থম থম করে অগ্রমহিষীর সেই সুরম্য কক্ষ। আর দূরে স্বর্ণখচিত দাঁড়ের ওপর থেকে তখন পোষা ময়নাটা ডেকে উঠল—হরি—হরি কেষ্ট—কেষ্ট!

ব্রহ্মদত্ত কোন কথা বলল না। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, নীবার ধান্য মঞ্জরীর প্রধানা নর্তকী কাঞ্চনমালার তন্বী সুঠাম চেহারাটা।

কাঞ্চনমালারা নৃত্যস্থলী আলো করে আসবে। সুমধুর ঐকতানে আর নৃত্য গীতে মুখর হয়ে উঠবে। কিন্তু তার এসব দেখা হবে না। যাওয়া হবে না—এ কী আশ্চর্য প্রতিশ্রুতি—কী অদ্ভুত আব্দার। কিন্তু না—কোন উপায় নেই। অগ্রমহিষীর সান্নিধ্য থেকে, তার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার নেই কোন

পথ। রাজতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী পাটরাণীকে নিয়ে তাকে করতেই হবে রাত্রিযাপন। তার মনে হল—মনে হল, শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী নারী প্রকৃতির সেই বিভিন্নতা—চিত্রনী, পদ্মিনী, শঙ্খিনী, হস্তিনী। তার অগ্রমহিষী, তার অঙ্কশায়িনীর দুর্দমনীয় কামুকতা, তার হিংসা, তার ক্রোধ, তার কলহপ্রিয়তা, বাচালতা—সব লক্ষণগুলো, বোধ করি হস্তিনী প্রকৃতির নারীর সঙ্গেই মিলে যায়—

কি ভাবছেন মহারাজ? অভিমানে রাণীর চোখের পাতাদুটো ভারী হয়ে উঠল। বলল, আমার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া বোধ হয় সম্ভব হবে না?

হবে—নৃত্যস্থলীতে যাবো কিন্তু চোখ বেঁধে যাবো, প্রত্যেকটি কথা কেটে কেটে স্পষ্ট করে বলল ব্রহ্মদত্ত, কিন্তু তুমি তো জানো, প্রভাতে গানের সুর কানে না এলে আমার সারাদিন খুব খারাপ যায়—তাই—

তা বেশ। যাবেন প্রমোদকক্ষে। কিন্তু আপনার চোখে আমি নিজ হাতে কাপড় বেঁধে দেব মহারাজ—সুগন্ধি ঘনচুলে ভরা মাথাটা রাজার বুকে ঘসতে ঘসতে বলল অগ্রমহিষী।

ব্রহ্মদত্ত কথা বলল না। গভীর প্রণয়ের নিখুঁত অভিনয় করে নিবিড় আবেশে রাণীর মেদপুষ্ট নরম শরীরটা জড়িয়ে ধরে বলল, আচ্ছা—তাই দিও—আর আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি ভিন্ন অন্য কোন নারীর মুখদর্শন করব না—

আঃ—মহারাজ—মহারাজ আপনি আজকে আমাকে—তীব্র আনন্দের আবেগে রাণীর চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। কান্নাভরা গলায় ফিস ফিস করে বলল, আমাকে যে আপনি কী নিশ্চিন্ত করলেন মহারাজ—

কাহিনী এইখানেই শেষ হতে পারতো।

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত তার অগ্রমহিষীর প্রস্তাবে সম্মত হলো। স্ত্রীর দাবী মেনে নিল স্বামী। স্বামীকে পুরোপুরি অধিকার করল। বেশ মিলনান্তক হলো ঘটনাটা। কিন্তু—

তা হয়নি। হতে পারে না। আকাঙ্খার মৃত্যু নেই, মৃত্যু নেই তৃষ্ণার। বুদ্ধদেব এই আকাঙ্খাকে বলেছেন—'তন্‌হা'—বলেছেন, তন্‌হা মানুষকে হিংস্র করে তোলে, করে তোলে শঠ্।

অতএব বন্ধনমোক্ষজাতকের সেই বিচিত্র লীলাময়ী নায়িকা অগ্রমহিষীর পরিণতি নিশ্চয়ই শুভ হয়নি।

দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল বেশ।

হয়তো আরও কিছুদিনও কেটে যেত। কিন্তু তাহলে বন্ধনমোক্ষজাতকের এই বিচিত্র আর রোমাঞ্চকর গল্প অসম্পূর্ণ থেকে যেত। একদিন খবর এল, বারাণসী থেকে অনেক দূরে উচ্চপদস্থ এক রাজকর্মচারী বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। সে একদল সেনা সংগ্রহ করে উন্মত্ত বেগে রাজধানীর দিকে আসছে।

এখুনি তাকে বাধা না দিলে অনর্থ হবে। মহামাত্যকে এই দুঃসংবাদ দিল গুপ্তচর।

মহামাত্যের চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল। মহারাজের মন-খারাপ। কালো রেশমী কাপড়ে চোখ বেঁধে নৃত্যস্থলীতে আসেন। কাঞ্চনমালার পায়ের নুপূরের ধ্বনি শোনেন—শোনেন উৎকর্ণ হয়ে। বাজনার তালে তালে মাথা দোলান। কিন্তু—

কিন্তু চোখের সামনে থাকে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। মনের ভেতরে কাঞ্চনমালার এক অনির্বচনীয় রূপ ফুটে ওঠে। এই রকম মানসিক অবস্থায় যুদ্ধ বিদ্রোহের কথা কি করে গোচর করবেন?

কিন্তু এই অশুভ সংবাদটা তাকে আর বহন করতে হয় না। বারাণসীর দিকে দিকে রব ওঠে। বিদ্রোহীরা আসছে।

মহারাজের কানে যায়।

বন্ধ হয়ে যায় প্রমোদ ভবনের স্বর্ণখচিত বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত সেই বিশাল দরজা! হাজারো প্রদীপের ঝাড়বাতি নিভে যায় মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে।

ব্রহ্মদত্ত কেন যেন খুশী হয়।

বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা। সৈন্য শিবিরে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। মহাজ্ঞানী তরুণ এবং সুদর্শন রাজপুরোহিত পাঁজি দেখে যুদ্ধযাত্রার দিন স্থির করেন।

বারাণসীর অদূরে বিপুলব্যাপ্ত প্রান্তরে ব্রহ্মদত্তের অযুত অশ্বারোহী আর পদাতিকরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে শুধু মহারাজের একটি নির্দেশের। কিন্তু—

ব্রহ্মদত্ত আসে না।

নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়—তবুও মহারাজা আসে না। প্রধান সেনাপতি মন্ত্রীরা আর অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা খুব চঞ্চল হয়ে ওঠে।

প্রধান সেনাপতি প্রতীক্ষার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠে বলল, মহারাজকে না নিয়েই যুদ্ধে রওনা হবো—

তা হয় না। মহামাত্য বললেন, মহারাজা ভিন্ন যুদ্ধযাত্রা সম্ভব নয়—বলেই তিনি প্রাসাদের দিকে গেলেন—

মহারাজের খাস কক্ষের দি:কে যেতেই কানে এল অগ্রমহিষীর কান্নাভরা ব্যাকুল কণ্ঠস্বর, আমাকেও নিযে যেতে হবে মহারাজ, আমি আপনার বিরহ এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য করতে পারব না—

সে হয় না—সম্ভব নয় প্রিযে, যুদ্ধক্ষেত্র খুব বিপদসঙ্কুল স্থান। যে কোন মুহূর্তে শত্রু আমাদের ওপর—

আপনি তো থাকবেন—আমাদের অযুত সৈন্য-সামন্ত থাকবে বলেই, মহারাজকে সাপিনীর মত নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল, আর আদুরে গলায় বলল, আর কোন আপত্তি করবেন না মহারাজা—

বাইরে মহামাত্য অস্বস্তিতে জ্বলে যেতে লাগল। তার মনে হল, এই দাম্পত্যকূজন অনন্তকাল ধরে চলতে পারে।

আশেপাশে কোন পরিচারক বা পরিচারিকাকেও দেখা যাচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে গলা খাঁকারির শব্দ করল—

কে বাইরে?

আমি মহারাজ,' মহামাত্য সাড়া দিল, প্রধান সেনাপতি ও সৈন্যরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে—

মহারাজ ব্রহ্মদত্ত যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সেই মারাত্মক রোগের মত তীব্র কামুকতায় আক্রান্ত নারীর কবল থেকে পরিত্রাণের কোন আশাই ছিল না। তার কথায় কাঞ্চনমালার লীলাচপল নৃত্য উপভোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বিচিত্র আর উদগ্র দেহলোভী এই নারীর সঙ্গে প্রতি রজনীতে নিয়ম করে সহবাস করতেই হবে। দেহ অবসন্ন কি মন চিন্তাকুল থাকলেও রেহাই নেই—তার মনে হল, দীর্ঘ—সুদীর্ঘ দিন ধরে সে যেন একটা অন্ধকার কারাগারে বন্দী হয়ে আছে। অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে চেঁচিয়ে বলল, আমি যাচ্ছি—যুদ্ধের পোষাকটা পরে নিযেই যাচ্ছি মহামাত্য।

মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল মহারাণী। হঠাৎ তার মুখের কঠোরতা মিলিয়ে গিয়ে সেখানে অনাবিল হাসি ফুটে উঠল। বলল, বেশ যাবো না।

আপনি বলুন মহারাজ, প্রত্যেক যোজনে গিয়ে একটি করে দূতের মারফত আপনার কুশল জ্ঞাপন করবেন—"

ব্রহ্মদত্ত সম্মত হল।

সেই তরুণ রাজপুরোহিতের ওপর রাজধানী এবং অন্তঃপুরের ভার দিল বারাণসীরাজ। তারপর কাড়ানাকাড়া আর দামামা বাজিয়ে অযুত সৈন্যের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

দিন কাটে।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে অগ্রমহিষী। এখনও কি মহারাজ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এক যোজন পথ অতিক্রম করতে পারেনি।

পুরুষহীন নির্জন প্রাসাদের এক কোণে বসে চিন্তায় জ্বলে পুড়ে যায় অগ্রমহিষী।

একদিন পরিচারিকা এসে খবর দেয়, রাণীমা, মহারাজ প্রেরিত দূত এসেছে—

এসেছে। বিপুল আনন্দে ভেতরে ভেতরে উল্লসিত হয়ে উঠল মহারাণী! বলল, শোন, তুই এক কাজ কর, বলেই পরিচারিকার কানে ফিস ফিস করে কতগুলো কথা বলল সে।

দাসী সুচরিতা বিস্মিত হলো না। রাণীমার প্রকৃতি তার অবিদিত নয়। সে বিনা বাক্যব্যয়ে প্রভুপত্নীর নির্দেশ পালন করতে গেল।

ধীরপায়ে রাজদূতের কাছে গেল সুচরিতা। তাকে অন্তঃপুর সংলগ্ন উদ্যানে ডেকে নিয়ে এল। সকালের সোনার রোদে ঝলমল করতে লাগল তার রৌপ্যখচিত উষ্ণীষ। চিকের আড়াল থেকে তাকে দেখল অগ্রমহিষী। উন্নত শির। তারুণ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল প্রশস্ত ললাট। দেহবর্ণে স্বর্ণের দ্যুতি।

সুগঠিত দেহে লীলায়িত পেশীপুঞ্জের অনুরাগ। সুপুরুষ। নিঃসন্দেহে সুপুরুষ।

অগ্রমহিষীর দেহের রক্তে গুরু গুরু ঝড় ভেঙ্গে পড়ল। আর তীব্র—তীক্ষ্ণ একটা জ্বালা তরঙ্গায়িত হয়ে গেল তার ধমনীতে ধমনীতে। তার শয়নকক্ষে টলতে টলতে ফিরে এল।

সুচরিতা উত্তমরূপে শয্যা রচনা করল। স্বর্ণমণ্ডিত ধূপাধারে জ্বালিয়ে দিল সুগন্ধী ধূপ। সমস্ত গবাক্ষ আবদ্ধ করে স্বপ্নের মত নীলাভ আলো

জ্বালিয়ে দিয়ে এক মায়াময় পরিবেশ রচনা করল সুদক্ষ পরিচারিকা সুচরিতা। তারপর—

তারপর।

অপেক্ষমান রাজদূতের কাছে গিয়ে বলল, মহারাজের বার্তা আপনি স্বয়ং মহারাণীর কাছে নিবেদন করুন—

রাজদূত এল মহারাণীর খাসকক্ষে। তার কাছে যেতে অগ্রমহিষী বলল, বলুন রাজদূত, মহারাজের কুশল জ্ঞাপন করুন—

রাণীমা, মহারাজ সুস্থ আছেন এবং মনের স্ফূর্তিতেই আছেন—

তার কথা যেন শুনতেই পেল না অগ্রমহিষী। মৃদু কণ্ঠে বলল, রাজদূত মহারাজকে আমার সম্পর্কে কি বার্তা জ্ঞাপন করবেন?

বলবো, কুশলে আছেন—

মিথ্যা ভাষণ করবেন রাজদূত হয়ে? কপট ক্রোধের ভঙ্গী করে বলল অগ্রমহিষী, কেউ কেমন আছে জানতে হলে তার কাছে আসতে হয়। দুদণ্ড বসতে হয়—

—আমার অপরাধ মার্জনা করবেন রাণীমা, রাজদূতের মুখে লজ্জার ছায়া পড়ে।

অগ্রমহিষী বলে, না-না-কিছু অন্যায় হয়নি—কোন অন্যায় হয়নি, বলেই রাজদূতের হাত ধরে শয্যাপ্রান্তে নিয়ে এসে বলল, আপনি যে শুভ কুশল বার্তা বহন করে এই এক যোজন পথ অতিক্রম করলেন তার মজুরি নেবেন না?

মানে? আমি তো রাজকোষ থেকে নিয়মিত বেতন পাই—

বেতন! টাকা! এক টুকরো ধারালো হাসি জ্বল জ্বল করতে লাগল অগ্রমহিষীর ঠোঁটের কোণে! চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আপনারা সব পুরুষ মানুষই এত মূর্খ কেন? সংসারে কি বেতন ছাড়া আর কোন মজুরি হয় না।

এইবার—এইবার রাজদূতের মুখে হাসি ফুটল। তার বুকের ভেতর বেজে উঠল রক্তের কলধ্বনি। অগ্রমহিষীর উদগ্র কামনায় উদ্ধত সেই সুডৌল বক্ষ-দেশের দিকে নজর পড়তেই তীব্র উত্তেজনায় মাতাল হয়ে উঠল সেই যুবা-পুরুষ। সঙ্গে সঙ্গে তার মেরুদণ্ড বেয়ে যেন উত্তপ্ত জলের স্রোত বয়ে যেতে লাগল। আর তার মাথার ভেতরে লেলিহান আগুনের একটা চাকা আবর্তিত হতে লাগল তীব্র বেগে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে

কাঁপতে মত্ত হস্তীর মত এগিয়ে এসে অগ্রমহিষীকে নিবিড় করে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরল। আর—

আর সুগন্ধী ধূপের ধোঁয়ায় আমোদিত আর সেই নীলাভ আলোয় উজ্জ্বল ঘরের নিস্তব্ধতায় এক নিবিড় সুখে আবিষ্ট হয়ে গেল।

আবার আর এক যোজন পৌঁছায় ব্রহ্মদত্ত। আবার আর এক তরুণ যুবা বারাণসীতে আসে রাজদূত হয়ে।

রাজমহিষীর সুসজ্জিত খাসকক্ষে তার ডাক পড়ে। এই দ্বিতীয় রাজদূত এসে দেখল, ফেননিভ শয্যায় জ্যোৎস্নার একটা রেখার মত গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে মহারাণী।

মহারাজ ব্রহ্মদত্তের কুশল নিবেদন করার পরই চলে যেতে উদ্যত হয় কর্তব্যনিষ্ঠ রাজদূত। রাণী তাকে বাধা দেয়। চোখের কটাক্ষে বিদ্যুতের ঝিলিক হেনে বলে, আমার কুশলবার্তা না নিয়ে চলে যাচ্ছেন যে বড়— মহারাজাকে আমার কথা কি বলবেন। একটু থেমে সুদক্ষ অভিনেত্রীর মত কণ্ঠস্বরে কান্নার আভাস ফুটিয়ে আবার বলে, আমার দেহ যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে এই দেখ—দেখ বলেই রাজদূতের হাত ধরে সবলে শয্যার দিকে আকর্ষণ করে। তারপর—

তারপর। যা হয়—যা স্বাভাবিক। তাই হলো।

যোজনের পর যোজন অতিক্রম করে ব্রহ্মদত্ত। দূত আসে। আর অগ্রমহিষীর উত্তাল বন্যার মত কামনার নদীতে স্নান করে ফিরে যায়।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বারাণসী বত্রিশ যোজন। অতএব বত্রিশজন দূত এসেছিল। এই বত্রিশটি যুবককেই অঙ্কশায়ী করেছিল অগ্রমহিষী।

এইবার ফেরার পালা।

আবার বত্রিশ যোজন পথ পাড়ি দিতে শুরু করল ব্রহ্মদত্ত। আবার এক এক যোজন পৌঁছেই এক একজন দূত আসতে শুরু করল। আর রাণীর খাসকক্ষে সেই বিচিত্র ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে লাগল।

কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয় অগ্রমহিষীর এই বৃত্তান্ত।

কিন্তু তার নিরবিচ্ছিন্ন পাপাচারেই যদি কাহিনীর শেষ হতো, তাহলে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের অগ্রমহিষী চিত্রা আর বন্ধনমোক্ষজাতকের নায়িকা হতে পারতো না—

দ্রুতগতিতে ব্রহ্মদত্ত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করছেন। সৈন্যদের কণ্ঠে

উল্লসিত জয়ধ্বনি। রাজকীয় ঘোষণা এল তরুণ সেই রাজপুরোহিতের কাছে—'আমি খুব শীঘ্র রাজধানীতে উপনীত হবো। আপনি আমার যথা-যোগ্য অভ্যর্থনা এবং অভিনন্দনের যাবতীয় সুব্যবস্থা করবেন—প্রতিটি নগর-বাসীকে এই মর্মে প্রস্তুত থা। কতে আদেশ দেবেন—

রাজপুরোহিত তৎপর হয়ে উঠলেন। মহানগরীর প্রতিটি রাজপথের দুই পাশে সুদৃশ্য সৌধগুলিকে আলোকমালায় সুসজ্জিত করলেন। নগরের প্রধান তোরণদ্বার থেকে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত বিস্তৃত পথে রেশম ও পশম মিশ্রিত সুদৃশ্য গালিচা বিছিয়ে দিলেন। রাজপথের মোড়ে মোড়ে এক একটা তোরণে বসালেন নহবত। আর সেই নহবতের সুরে সুরে উদ্দাম জয়জয়ন্তী রাগের ভেতরে যেন যুদ্ধ জয়েরই উল্লাস দিকে দিকে বিলসিত হয়ে যেতে লাগল!

বার্তা এল—মহারাজ ব্রহ্মদত্ত মহানগরীর উপকণ্ঠে জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করেছেন। অনতিবিলম্বেই তিনি সৈন্যসম্ভার নিয়ে রাজধানীতে পৌঁছে যাবেন—

পুরোহিত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। রাজধানী-নগর পরিক্রমা করে দেখতে শুরু করলেন, কোথাও কোন ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে কিনা! হঠাৎ তার মনে হল, রাজপ্রাসাদ তো সাজানো হয় নি। মহানগরীর দিকে দিকে যাবতীয় ব্যবস্থার তদারক করতে গিয়ে তিনি মহারাজের নিজস্ব রাজভবনের কথাই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছেন—

রাজপুরোহিত তড়িৎগতিতে এলেন রাজপ্রাসাদে।

প্রাসাদসংলগ্ন অশোক আর নাগবৃক্ষের নীলাভ মিষ্টি ছায়ার নীচে এসে দাঁড়াতেই, অগ্রমহিষীর মনে হল—মনে হল, যেন কোন দেবদূত নেমে এসেছে স্বর্গ থেকে। কেয়া ফুলের মত দীর্ঘ তার তনুদেহ। সোনার মত গায়ের রঙ। মুখাবয়বে আশ্চর্য একটা জ্যোতির্ময় আভা। চঞ্চলমতি, লালসাদুর্বল সেই বিচিত্র নারী ক্ষিপ্রপায়ে তার কক্ষ থেকে বেরিয়ে অলিন্দে এসে দাঁড়ালো। ও কে?—কে হতে পারে! রাজদূত? না। মহারাজ তো নগরীর উপকণ্ঠে পৌঁছে গিয়েছেন! তাহলে দেবতার মত ওই কনককেতকী কুসুম গৌরের রূপ ধরে এ কে এল রাজান্তঃপুরে।

রাণীমা, রাজপুরোহিত আপনার দর্শন অভিলাষী—পরিচারিকা সুচরিতা এসে দাঁড়ালো।

ওঃ ইনিই নবীন পুরোহিত, এখুনি ওকে আমার খাসকক্ষে নিয়ে আয়

সুচরিতা, কামনার জ্বরে তখুনি আচ্ছন্ন হযে গিয়েছে অগ্রমহিষীর সমস্ত চেতনা।

ঘর আলো করে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

অপরূপ রূপবান তরুণ সেই যুবকের দিকে কযেক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েই মুখ নামিয়ে নিল অগ্রমহিষী। প্রজ্ঞার আলোয় প্রদীপ্ত সেই তরুণের মুখমণ্ডল। বিশাল দুটো অপলক চোখে সুদূর দৃষ্টি। যেন মনে হয়—মনে হয়, স্নেহপ্রীতি মায়ার এই সংসার থেকে অনেক—অনেক দূরে কোন দূরান্ত-বর্তী এক অজানালোকে যেন তার আনাগোনা।—

পুরোহিত। রাণীমা, আমি রাজপুরোহিত। আপনি বোধ করি অবগত আছেন। আমাদের বীরকেশরী মহারাজ বিদ্রোহীকে দমন করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করছেন—

রাণী। এসব আমার অবিদিত নেই। আপনার আগমনের অভিপ্রায়?

পুরোহিত। রাজাজ্ঞায় আমি এই অন্তঃপুরকে সুসজ্জিত করতে এসেছি—

রাণী। বেশ, উত্তম প্রস্তাব। আমি আপনাকে সহযোগীতা করবো—এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—

শুধু কথা নয়। সত্যি—সত্যি জীবনে সেই প্রথম কটিদেশে আঁচল পেঁচিযে সাংসারিক মূর্তি ধরে অগ্রমহিষী এসে দাঁড়ালো রাজান্তঃপুরের প্রাঙ্গনে। তারই ইঙ্গিতে এক ঝাঁক রঙীন প্রজাপতির মত এসে পড়ল সুনিপুন পরিচারিকাদের দল। অগ্রমহিষীর নির্দেশেই তারা রাজসভা, প্রমোদভবন ও নৃত্যস্থলীর সীমানা থেকে অন্তঃপুর পর্যন্ত প্রসারিত সেই শ্বেতপাথরে বাঁধানো প্রশস্ত পথের দুপাশে সুদৃশ্য রঙীন সূত্রে সুগন্ধি পুষ্পবলয় দিয়ে সজ্জিত করলো। অন্তঃপুরের স্বর্ণখচিত তোরণের দুদিকে দুইটি পত্রভারে অবনত কদলীবৃক্ষের নীচে স্থাপন করল আম্রপল্লবে সযত্নে সাজানো মঙ্গলঘট! মহারাজের সুরম্য শয়নকক্ষের পাথরের রক্তবর্ণ দেওয়ালে আলপনায় আঁকা মাঙ্গলিক স্বস্তিকাচিহ্ন জ্বলজ্বল করতে লাগল।

বলুন পুরোহিত মহাশয়, আপনাদের মহারাজার যথোচিত মর্যাদা অনুযায়ী সজ্জা হয়েছে? অনুরাগের হাসি হেসে কাছে এল অগ্রমহিষী। সম্মানযোগ্য ব্যবধান রচনা করে সরে দাঁড়ালেন পুরোহিত। তাকে খুশী করার জন্যেই সেই নবীন ঋত্বিক বলল, মহারাণী, নারী যে সীমাস্বর্গের ইন্দ্রানী, তা আপনার সুরুচির পরিচায়ক এই মনোরম গৃহসজ্জা লক্ষ্য করলেই হৃদয়ঙ্গম হয়—

তাঁর কথায় কোন ভ্রূক্ষেপ না করে অগ্রমহিষী অনুনয়ের স্বরে বলল, আসুন আমার শয়নকক্ষে। মহারাজের তো পৌঁছাতে বিলম্ব আছে—আমরা ক্ষণকাল বিশ্রম্ভালাপ করি—

না, মহারাণী, এখনও আমার অনেক কাজ আছে। মহারাজকে অভিবাদনের জন্য নাগরিকদের প্রস্তুত—

ঋত্বিক, বিস্মৃত হবেন না, আমিও মহারাণী। আমার অনুরোধ প্রায় আদেশের পর্য্যায়েই পড়ে—

বাধ্য হয়েই শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন সেই দিব্যকান্তি নবীন পুরোহিত। সঙ্গে সঙ্গে সুচরিতা পূর্ব নির্দেশমত বাইরে থেকে অর্গল বন্ধ করে দিল।

এ কী!—কি করছেন মহারাণী। ছিঃ ছিঃ—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের গৌরবর্ণ দেহ তীব্র উত্তেজনায় আরও রক্তিম হয়ে উঠল। সেই দুটো বিশাল চোখে ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠল।

শোনো ব্রাহ্মণ, আমাকে কেউ কখনো প্রত্যাখ্যান করেনি। এর আগে মহারাজ প্রেরিত চৌষট্টিজন বার্তাবহই আমার আদেশ পালন—

অসম্ভব! আপনার অভিলাষ পূরণে আমি অক্ষম। মহারাজ আমার পিতৃস্থানীয়—আপনি আমার মাতৃসদৃশ—

চুপ করো ব্রাহ্মণ, আহত বাঘিনীর মত গর্জে উঠল অগ্রমহিষী। নীতিশাস্ত্র আউড়ে আমাকে এড়িয়ে যেও না। তুমি না শাস্ত্রজ্ঞানী ব্রাহ্মণ। তুমি—তুমি—তীব্র আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল তার। নেশার ঘোরে কেমন আচ্ছন্নের মত অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, তৃষ্ণার্তকে জল দান যেমন পুণ্য, ঠিক তেমনি জেনে রাখো ব্রাহ্মণ, অতৃপ্ত নারীর মনোবাঞ্ছা পূরণও যে কোন পুরুষের—

অসম্ভব! আমি পাপকে ঘৃণা করি। ভয় করি—আপনার আবিল কামনা চরিতার্থ করার জন্য আমি পঙ্কে নামতে পারি না মহারাণী—

কোন কথা বলল না অগ্রমহিষী।

কুপিতা নাগিনীর মত বিষাক্ত আক্রোশের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেমে থেমে বলল, চৌষট্টিজন তরুণ রাজদূত তো রাজাকে গুরু বলে মনে করেনি—

মনে করেনি বলেই আপনি তাদের পঙ্কে টেনে নামাতে পেরেছেন—শীঘ্র খুলে দিন দরজা—

কেন প্রলাপ বকছো—আমার নির্দেশ পালন না করলে ঘাড়ে তোমার মাথা থাকবে না ব্রাহ্মণ—

শুধু এ জন্মে কেন—শত সহস্র জন্মেও যদি মাথা কাটা যায় তবুও আমি নরকে নামতে পারবো না মহারাণী—উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে বলল ব্রাহ্মণ। বলেই রুদ্ধ দ্বারে সে করাঘাত করতে লাগল। এইবার—

এইবার অগ্রমহিষী একটা বিচিত্র কাণ্ড করে বসল। সেই নবীন ব্রাহ্মণের উরুদেশ দুটো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে অতি দীনাতিদীন, দুস্থ ভিখারিণীর মত ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, ব্রাহ্মণ, যে মুহূর্তে তোমাকে দেখেছি তখন থেকেই আমার ভেতরটা যে কি রকম করছে তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না, একটু থামল সে। হয়তো সম্রাজ্ঞীর মহিমা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে একটু সংযত হওয়ার চেষ্টা করল। কান্নার আবেগে অবরুদ্ধ গলায় বলল, শুনেছি তুমি বেদজ্ঞ—তুমি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, তুমি জানো না, আমরা সরোবর, তোমরা মরাল! মরালের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে শান্ত জলে আলোড়ন তুলে অবগাহন স্নান করতে তোমার কী কিঞ্চিৎ বাসনাও হয় না ব্রাহ্মণ—তোমার কী—

না—না—আমাকে মুক্ত করে দিন মহারাণী—আমি রাজপুরোহিত। প্রজারা আমাকে সম্মান করে—তরুণ ব্রাহ্মণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অগ্নিদগ্ধ নাগিনীর মত তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে অপমানিত অগ্রমহিষী কক্ষের আর একটা দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। তীব্রবেগে বেরিয়ে যায় তরুণ রাজপুরোহিত।

দ্রুত—খুব দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটতে থাকে ব্রাহ্মণ। প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানের ভেতর দিয়ে তার অপস্রিয়মান দেহরেখার দিকে জ্বালা ধরা চোখে তাকিয়ে মর্মান্তিক আক্রোশে ফুঁসতে থাকে অগ্রমহিষী। তরুণ পুরোহিতের মনে হলো, যেন অনেক—অনেকগুলো তীক্ষ্ণমুখ সূঁচ তার পিঠে এসে বিঁধছে।

জয় মহারাজার জয় !!

বীরকেশরী ব্রহ্মদত্তের—

জয়—হোক—!!

জনতার বিপুল জয়ধ্বনির ভেতর দিয়ে ব্রহ্মদত্ত রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। নগর পরিক্রমা করে এলেন প্রাসাদে। প্রাসাদের ভারপ্রাপ্ত মহামাত্য রাজপুরোহিত ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা তাকে সসম্মানে সহাস্য অভিনন্দন

জ্ঞাপন করল। এল অন্তঃপুরে। এক সহস্র নটী ও তাদের অনুগামিনী পরিচারিকাদের একটা রঙীন শোভাযাত্রা রাজার দীর্ঘজীবন কামনা করে জয়ধ্বনি তুলল। একে একে এল তার হাজারো মহিষী। এল না—এল না—

শুধু একজন।

শঙ্কার ছায়া পড়ল ব্রহ্মদত্তের মনে। তাহলে কি চৌষট্টিজন বার্তাবহ রাণীকে তার কুশলবার্তা জ্ঞাপন করে নি? আহা—না, জানি, তারই জন্য তীব্র উদ্বেগে কত কাতর হয়ে পড়েছে অগ্রমহিষী। তার উদ্দাম ভালোবাসার রাশি রাশি স্মৃতি তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আর নিবিড় সহানুভূতির রসে মনটা কেমন সিক্ত হয়ে উঠল। দ্রুত পায়ে গেল তার শয়নকক্ষের দিকে।

এ কী! দুয়ার বন্ধ কেন?

কড়া নাড়তেই দরজা খুলল সুচরিতা। আর ব্রহ্মদত্তের চোখদুটোর দৃষ্টি কেমন বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে উঠল। ভূমিশয্যায় জীর্ণ একটা মাদুরের ওপরে দেহ এলিয়ে দিয়ে অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করছে। নিটোল দুটো বাহু এবং মেদবহুল দেহের এখানে সেখানে ক্ষতচিহ্ন থেকে বিন্দু বিন্দু রক্তক্ষরণ হচ্ছে। পরণে শতচ্ছিন্ন মলিন পোষাক।

এ কী। কি হয়েছে তোমার? তাড়াতাড়ি ভূমিতেই উপবেশন করে সস্নেহে বলল ব্রহ্মদত্ত। হাতে পায়ে ক্ষত হলো কি করে?

আহত পশুর মত নিদারুণ যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে অগ্রমহিষী বলল, মহারাজ, আপনি জীবিত থাকতেই এই দুর্ভাগিনীকে পরপুরুষের মন জুগিয়ে চলতে হবে—

প্রিয়ে, তুমি কী বলছো, বুঝতে পারছিনা—

আপনার তরুণ পুরোহিত আমার এই দশা করেছে মহারাজ। বলতে বলতে তীব্র কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল অগ্রমহিষী। আর কান্নাজড়ানো অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, তার কুপ্রস্তাবে আমি সম্মত হই নি বলেই এই দেখুন—বলেই একটা তীক্ষ্ণধার ছুরিকা তুলে ধরে আবার বলল, এটা দিয়ে আমার দেহে—

আর বলতে হবে না—আর বলতে হবে না রাণী। প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ভেতরে যেন শর্করা পড়ল। ওকে আমি শূলে দেব—ক্রুদ্ধ কণ্ঠে মহামাত্যকে আদেশ দিল ব্রহ্মদত্ত। এখুনি সেই অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসী ব্রাহ্মণকে পিঠমোড়া

করে বেঁধে মশানে নিয়ে যান এবং যত দ্রুত সম্ভব সেই দুর্বৃত্তের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করুন—

দিব্যকান্তি সেই তরুণ ঋত্বিক চলেছে বধ্যভূমিতে। শৃঙ্খলিত দুটো হাত। পিঠমোড়া করে বাঁধা। প্রহরীদের চতুষ্কের (বেত্রদণ্ড) আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে গিয়েছে তার পৃষ্ঠদেশ। তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে মিনতি করে বলছেন, আমাকে একবার মহারাজের কাছে নিয়ে চল—

কেন, মহারাজকে তোমার কী প্রয়োজন?

আমার কাছে গুপ্তধনের সন্ধান আছে—মৃত্যুর পূর্বে রাজাকে তার সম্বন্ধে জানিয়ে দিতে চাই—

কেন জানি, নগরাধীন সম্মত হলো।

বধ্যভূমি থেকে তাকে নিয়ে আসা হলো আলোকোজ্জ্বল রাজসভায়। মহারাজ, আমার একটি আবেদন আছে। সেই তরুণ ব্রাহ্মণ তার শ্বেতশুভ্র উপবীত দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে বললেন, মহারাজ, শ্রোত্রিয় কুলে আমার জন্ম। আমি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। উপবীত স্পর্শ করে বলছি, আমি যা বলবো, তার প্রতিটি কথা সত্য—একটু থেমে মহারাজের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, মহারাজ, বিনা অপরাধে আমাকে প্রাণদণ্ড দিয়েছেন—আমি নিরপরাধী। কখনো কোনদিন এক মুহূর্তের জন্য কোন পরস্ত্রীর দিকে লোভবশেও দৃষ্টিপাত করি নাই। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন, আপনার অর্ধাঙ্গিনী অতিমাত্রায় কামুক। আমি তাঁর অসম্মানজনক প্রস্তাবে সম্মত হতে পারিনি বলে আমাকে শাসিয়েছিলেন এবং নারীপুরুষের মিলনে যে কোন পাপ নাই, তার নজীর স্বরূপ আপনার প্রেরিত চৌষট্টিজন তরুণ রাজদূতের সঙ্গেই তাঁর ব্যভিচারের কথা অকপটে ব্যক্তও করেছিলেন—

সে কী! বলছেন কি আপনি?

মহারাজ, বিশ্বাস না হয়, রাজদূতদের আপনার মহিষীর সম্মুখে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন—

গভীর শোকের মত স্তব্ধতা নেমে এল রাজসভায়।

তরুণ ঋত্বিকের গৌরবর্ণ দীর্ঘ দেহ একটি দীপশিখার মত জ্বলতে লাগল। তার দিকে তাকিয়ে মহারাজ ব্রহ্মদত্ত একটি কথাও বলতে পারলেন না। কি বলবে—কী বলতে পারে সে? তাঁর পাটরানী যে হস্তিনী শ্রেণীর নারী আর তার যৌনসম্ভোগলিপ্সা যে সমুদ্রের মতো অন্তহীন—সেই নির্মম সত্য তার

চেয়ে বেশি আর কে জানে! তাই গভীর লজ্জায় অধোমুখে বসে রইলেন ব্রহ্মদত্ত।

কিন্তু মহারাজ, অগ্রমহিষীর দেহে তাহলে ক্ষতচিহ্ন কেন? তরুণ রাজ-পুরোহিতের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ মহামাত্য মন্ত্রণা দেয়।

রাজপুরোহিত বললেন, মহারাণীকে ডেকে তাকে প্রশ্ন করলেই—

না, আমি পারছি না আর। সেই শ্বাসরোধী পরিবেশে অসহ্য হয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে আদেশ দিলেন মহারাজ,—প্রতিহারী—নিয়ে এস বার্তাবহদের, নিয়ে এস এখুনি অগ্রমহিষীকে—

কিন্তু—

কাউকেই আনতে হলো না।

অঘটন-ঘটনপটিয়সী নিজেই এল। সম্রাজ্ঞীর দৃপ্ত মূর্তি কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। কেমন রিক্ত আর অবসন্ন মনে হলো তাকে। জলভরা দুটো চোখ। সেই চোখের দৃষ্টিতে গ্লানির অপচ্ছায়া আর তার দুষ্কর্মের অনুশোচনাই জানিয়ে দিল তার কলঙ্কের ইতিবৃত্ত।

রাজদণ্ড ঘোষিত হলো।

চৌষট্টিজন বার্তাবহের প্রাণদণ্ড। অগ্রমহিষীর শূলদণ্ড।

মহাপ্রাজ্ঞ সেই তরুণ পুরোহিত মহারাজের সামনে এগিয়ে এসে বলল, ভুল করছেন—ভুল করছেন মহারাজ! আপনার রাজদূতরা অপরাধী নয়। তারা প্রভুপত্নীর নির্দেশ পালন করেছে মাত্র, আর—

স্তব্ধ হলেন কেন তপস্বী, নির্ভয়ে নিবেদন করুন—

মহারাজ, অগ্রমহিষীকে ক্ষমা করুন—

সমবেত সভাসদরা তার উদার মহিমায় বিস্মিত হয়ে গেল। আর রাণীর দুটো করুণ চোখের দৃষ্টি হঠাৎ একটু কেঁপে উঠল। দিব্যকান্তি সেই তরুণের দিকে তাকিয়ে তার চোখদুটো গভীর শ্রদ্ধায় অগাধ হয়ে উঠল।

কিন্তু ব্রাহ্মণ, প্রজানুরঞ্জন বারাণসীরাজ প্রতিবাদ করলেন, ব্যভিচারিণী নারীকে সমুচিত দণ্ড না দিলে যে দেশজুড়ে ঘরে ঘরে কুলরমণীরা—

মহারাজ, পুরুষ প্রকৃতির সম্যক জ্ঞান নেই আপনার। প্রকৃতি অন্ধ। কিন্তু দুর্বার তার গতি। পুরুষ খঞ্জ, চলৎশক্তিহীন। কিন্তু তার আছে দৃষ্টি। তাই সাংখ্যকার কপিল বলেন, পুরুষ আত্মাপ্রকৃতির স্কন্ধারূঢ় হয়ে তাঁকে নির্ভুল পথে চালিতকরছেন। পুরুষ-প্রকৃতির এই সমন্বয়েই যুগযুগান্তর ধরে সৃষ্টির স্রোত চলেছে—

কিন্তু তাতে কি? ব্রহ্মদত্তের সরলচোখে দিশেহারা দৃষ্টি ফুটে ওঠে।

মহারাজ, আপনি পুরুষ। আপনি স্বামী। আপনি কখনো রাণীর কাছে কোন মহৎ আদর্শ তুলে ধরতে পারেন নি। শুধু বিলাসব্যসনের স্রোতে গা ভাসিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন—একটু থেমে রাজপুরোহিত আবার বললেন, রাণীর পদস্খলনের জন্য আপনিই দায়ী মহারাজ—

আমাকে ক্ষমা করুন ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মদত্ত হাত জোড করে বলল।

মহামাত্য আর সহ্য করতে পারল না। কটুকণ্ঠে বলল, মহারাজ, বধ্যভূমি থেকে ফিরে আসা বন্দী বাক্যজাল বিস্তার করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে।

মহসত্ত্ব পুরোহিত একটা কথা বললেন না। তার প্রশান্ত মুখে স্মিত হাসি ফুটল। শুধু মন্ত্রোচ্চারণের মত করে একটি গাথা বলল—

মূর্খ বক্তা যথা, পণ্ডিতের তথা, সদা বন্ধনের ভয়।
পণ্ডিত বচনে, কিন্তু মূর্খজনে, বন্ধনবিমুক্ত হয়॥

ব্যাখ্যা করে পুরোহিত বললেন, মহামাত্য শুনুন, অগ্রমহিষীর বক্তব্যে আমি অপরাধী হয়েছিলাম, কিন্তু আমার জবানবন্দীতে আমিই শুধু মুক্ত হলাম না, রাণী এবং রাজদূতদেরও মুক্ত করতে সক্ষম হলাম—

এইভাবে মহারাজকে পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব এবং মহামাত্যকে ধর্মতত্ত্ব শিখিয়ে সেই বিচিত্র স্বভাবের ঋত্বিক বললেন, মহারাজ, এইবার আমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে অনুমতি দিন—একটু থেমে অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, এতদিন সংসারে ছিলাম, তাই এই লাঞ্ছনাটুকু আমার প্রাপ্য ছিল—

ব্রহ্মদত্তের সনির্বন্ধ অনুরোধ, বারাণসীবাসীদের সাশ্রুনয়নের মিনতি কিছুই তাকে তার সন্ন্যাসগ্রহণের দৃঢ়সঙ্কল্প থেকে বিরত করতে পারল না।

ধূলি ধূসরিত দূর বিসর্পিল পথ।

সেই পথ আলো করে চলেছে এক দিব্যকান্তি তরুণ সন্ন্যাসী*। তিনি জানতে পারলেন না, নিশব্দ পায়ে তাকে অনুসরন করছে এক রমণী। আলুলায়িত কুন্তল। তার পরণের গৈরিক বাস গোধূলির ছায়ার মত শোভা পাচ্ছে।

---

*এই সুদর্শন তরুণ ঋত্বিক আর কেউ নয়, স্বয়ং বোধিসত্ত্ব! বুদ্ধদেব যে জন্মে বারাণসীর রাজপুরোহিত ছিলেন—এই বিচিত্র কাহিনী সেই জন্মের সমসাময়িক। ঐহিক সর্বসুখ বিসর্জন দিয়ে বন্ধনমোক্ষজাতকের নায়িকা, অনুতাপবিদ্ধ অগ্রমহিষী যে সন্ন্যাস অবলম্বন করেছিলেন, এই বৃত্তান্তের ভেতরে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে সেই ঐতিহাসিক সত্য—অনেক নগরশোভনা বারাঙ্গনাকে তাদের পঙ্কিল জীবনের অন্ধকার কারাগার থেকে উদ্ধার করে ভগবান তথাগত তাদের অবারিত পৃথিবীর আলোর রাজ্যে নিয়ে এসেছিলেন।

তৃতীয় স্তবক

রূপ-যৌবনের কারবারের রাশি রাশি স্বর্ণ-মুদ্রার স্তূপের ওপরে বসে যৌবনমদমত্ত যে বারাঙ্গনা বলে, আমি ঈশ্বর মানি না পাপ-পুণ্য মানি না, আমার যৌবনকেই আমি ঈশ্বর বলে মনে করি—তারই রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত— —অস্থানজাতক

এক রাজপুত্র।

এক সওদাগরপুত্র।

আর এক নগরশোভনা পরমাসুন্দরী সৌভাগ্যশালিনী বর্ণদাসী।

এই কাহিনীর—এই তিন কুশীলব। বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র ব্রহ্মদত্ত কুমার এবং বারাণসীর সুবর্ণশ্রেষ্ঠী ধনকুমারের পুত্র—মহাধনকুমার। তারা দুই বন্ধু। অভিন্নহৃদয়। অন্তরঙ্গ। একে অন্যকে দুদণ্ডও চোখের আড়াল করতে পারে না। একসঙ্গে তারা মৃগয়ায় যায়। পাশাক্রীড়ায় মত্ত হয়ে ওঠে। একই আচার্যের গৃহে বিদ্যাভ্যাস করে।

কালক্রমে এই দুই বালক পূর্ণযৌবনে উপনীত হলো। মহারাজ ব্রহ্মদত্ত দেহত্যাগ করলেন। সিংহাসনে উপবেশন করল ব্রহ্মদত্তকুমার। মহাধন-কুমারও পিতার ব্যবসাকার্যে মনসংযোগ করল।

গুরুভার রাজকার্য আর বাণিজ্যবিষয়ক জটিল কাজের দুরূহ দায়িত্ব—এ দুটোতে উত্তরমেরু-দক্ষিণমেরুর ব্যবধান। স্বভাবতই তাদের পরস্পরের অদর্শন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে। শিথিল হবে তাদের নিবিড় সখ্যতার সুদৃঢ় সেতু-বন্ধন। অবশ্যম্ভাবী এই পরিণতি থেকে পরিত্রাণের জন্যেই হয়তো ব্রহ্মদত্তকুমার প্রস্তাব করল তার বান্ধবকে, শোন, প্রভাতে, অপরাহ্নে, আর সায়ংকালে—এই তিনবার নিয়মিত তুমি রাজপ্রাসাদে আসবে—প্রতিশ্রুতি দাও—

মহাধনকুমার কোন কথা বলে না। তার প্রশান্ত মুখাবয়বে স্মিত হাসির আভা জেগে ওঠে। বন্ধুর এই ব্যাকুলতায় মুগ্ধ হয়। শান্ত, মৃদুকণ্ঠে বলে, বন্ধু প্রথম দুটি সময়ে আমি নিশ্চয়ই তোমার কাছে আসবো, কিন্তু—

কেন? সন্ধ্যায় কি তুমি ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকো?

মহাধনকুমারের চোখে বিস্ময় ছটফট করে। বলে, রাজসিংহাসনে উপবেশন করার পর তুমি কী সব কিছুই বিস্মৃত হয়েছো?

কেন বলো তো—এরকম বলছো—

বন্ধু সায়ংকালে রাজপ্রাসাদে আমাকে আসতে হবে কেন, আমাদের উভয়েরই সাক্ষাতের এবং বিশ্রম্ভালাপের একটি মনোরম স্থান তো আছে—

ওঃ, ফিক্ করে হেসে উঠল ব্রহ্মদত্তকুমারের চোখদুটো সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে। তার হাসির প্রচণ্ড শব্দ প্রাসাদের দিকে দিকে বয়ে গেল লহরে লহরে। কিন্তু কেন যেন ক্ষণকাল পরেই তার মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া নামল। কেমন নিস্পৃহ আর শীতল কণ্ঠে বলল,. বন্ধু, তার কথা বিস্মৃত হওয়ার চেষ্টা করো—

কেন?

সে পরমাসুন্দরী। তাই সে বড় উদ্ধত আর গর্বিতা, একটু থামল ব্রহ্মদত্তকুমার। কিসের যেন দুশ্চিন্তার কালো ছায়া ভেসে উঠল তার মুখে। আবার বলল, শুধু উন্নাসিক নয়, আরও গুরুতর সংবাদ আছে তার সম্বন্ধে—

কি সেটা জানতে পারি কি?

শুনছি কোশল, কৌশাম্বী মগধ ইত্যাদি প্রতিবেশী রাজ্য থেকে গুপ্তচররা নাকি তার কাছে আনাগোনা করছে—

রাজদণ্ড হাতে নিয়ে তোমার মনটাও দেখছি জটিল হয়ে উঠেছে, বলল মহাধনকুমার, গুপ্তচররাও তো মানুষ। অপরূপ রূপসী বারাঙ্গনার সঙ্গসুখের জন্যও তো তারা আসতে পারে—বলতে বলতে হঠাৎ কেন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল সে। তার মনের ভিতরে জ্যোৎস্নার রূপালী রেখার মত ক্ষীণতনু সুরম্যা এক নারীর অনির্বচনীয় রূপ ভেসে ওঠে। যেন সুখস্বপ্নের ঘোরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, আর তুমি তো জানো, সে সুরসিকা—সে নৃত্যপটিয়সী—

এসব—এসব আমার অবিদিত নেই বন্ধু, বারাণসীর তরুণ নৃপতির কণ্ঠে এইবার উত্তাপ ফুটে ওঠে, শুনেছি, তোমার ওই নৃত্যগীত নিপুনা বারনারীটি নাকি বিশেষ বিশেষ নাগরকে অশ্লীল নৃত্যকলা প্রদর্শন করে প্রভূত অর্থ উপার্জনও করছে—

সে কী! অশ্লীল নৃত্যকলা? শ্রেষ্ঠীকুমারের চোখদুটোতে লোভের আভা জাগল। বন্ধুর কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে এসে বলল, ব্যাপারটা একটু বিশদ বলবে?

ব্রহ্মদত্তকুমার তার সখার কানে কানে বলল কতগুলো ভয়ঙ্কর আর রোমাঞ্চকর কথা।

আরক্ত হয়ে উঠল মহাধনকুমারের মুখখানা। বুকের ভেতরে কলধ্বনি

বাজতে লাগল। আর কেন যেন আগ্নেয় একটা অনুভূতি তরঙ্গায়িত হয়ে গেল শিরায় শিরায়। কিন্তু মনের ভেতরের উত্তাল আবেগকে সংযত করে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—আমি সেই পাপিষ্ঠার কাছে যাবো না—এই কথা বলে প্রিয় বন্ধুকে আলিঙ্গন করে শ্রেষ্ঠীপুত্র বিদায় গ্রহণ করল। ব্রহ্মদত্তকুমারের মুখে সাফল্যের হাসি।

সখাকে সে নিবিড়ভাবে ভালবাসে। সে রূপবান। সুপুরুষ। দেবদারুর মত দীর্ঘ তনু। তার তীক্ষ্ণ নাসায়, প্রদীপ্ত দুটো চক্ষুতে বুদ্ধির দীপ্তি। ইতিমধ্যেই সে সুবর্ণ বাণিজ্যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। এক বারনারীর প্রণয়াসক্ত হয়ে একটি প্রতিভার অপচয় সে কিছুতেই হতে দেবে না—কিছুতেই না।

সন্ধ্যাসমাগমে বারাণসীর পশ্চিম আকাশে অস্তরাগের বর্ণাঢ্য সমারোহকে অবলুপ্ত করে দিয়ে আসন্ন রাত্রির রঙে মলিন হয়ে আসে দিকদিগন্ত। মহানগরী থেকে এক যোজন দূরবর্তী এক সুরম্য প্রাসাদ আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়ে ওঠে। হঠাৎ দূর থেকে অবলোকন করলে মনে হয়, মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের সমুদ্রে যেন আলোকোজ্জ্বল একটা বিশাল অর্ণবযান ভেসে চলেছে। এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে বহুমূল্য আর দুষ্প্রাপ্য সব প্রসাধন সামগ্রীতে সুসজ্জিত একটা সুরম্য কক্ষ রূপ-পরিচর্যা নিপুণা পরিচারিকাদের কলকণ্ঠে মুখরিত হয়ে ওঠে। সুবৃহৎ একটা মুকুরের সম্মুখে একটা ঈষৎ উচ্চ স্বর্ণখচিত আসনে সম্রাজ্ঞীর মত সমাসীন হয়ে আছে নগরসুন্দরী গণিকা—

বর্ণদাসী।

সম্পূর্ণ নগ্ন সে। তার সেই নিরাবরণ দেহের অবারিত অপরিসীম সৌন্দর্যে সেই প্রকোষ্ঠের হাজার ঝাড়বাতির আলোও যেন ম্লান হয়ে গিয়েছে। চার পাঁচজন পরিচারিকা তার দেহগাত্রে ঝামকের (ঝামা) সাহায্যে মৃদু ঘর্ষণ করে চলেছে। আর বর্ণদাসী মাঝে মাঝে তীব্র যন্ত্রনায় কাতর হয়ে অস্ফুটস্বরে বলছে—আঃ কি করছিস তোরা—একটু আস্তে—

ও মাঃ এর চেয়ে আস্তে করা যায় না কি? বলতে বলতে জলতরঙ্গের মত মিষ্টি কণ্ঠের হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে তারা। আবার একজন মন্তব্য করে, যা মাখনের মত মসৃন আর লঘু তোমার দেহত্বক, মনে হয় বুঝি এখুনি কেটে গিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুবে—

আবার হাসির দমকা উঠল। একসময়ে দেহগাত্র ঘর্ষণ সমাপ্ত হলো। এইবার—

এইবার দুইজন পরিচারিকা লঘু পায়ে এগিয়ে এল। তাদের হাতে কাঁচের পাত্রে সুগন্ধী আর রঙীন একটা তরল পদার্থ শোভা পাচ্ছে। তারা তুলির সাহায্যে হেনার রং দিয়ে রঞ্জিত করল বর্ণদাসীর পেলব হাতের মসৃন করতল, এবং কোমল দুটো পায়ের পদতল। তারা প্রতিটি নখও চিত্রিত করল নিপুণ হাতে। অনন্তর গর্দভের পায়ের খুব আর খর্জুর (খেজুর) ফলের চূর্ণের মিশ্রনে প্রস্তুত লাক্ষাসারের সাহায্যে তার অপর্যাপ্ত কেশদামেরও পরিচর্যা করল। এইবার একজন তাব ঘনপক্ষ্ম ভ্রূজোড়ায়, আয়ত দুটোচোখে ললিত অঙ্গুলি বিন্যাসে কাজল পরিয়ে দিল। আবার একজন সুরসিকা অস্ফুটকণ্ঠে বলল, তোমাকে সাজাতে বসলে কি মনে হয় জানো ?

কি ?

মনে হয়, কোন দেবীপ্রতিমার সোনার অঙ্গে রং মাখিয়ে তাকে কলুষিত আর বিকৃত করছি—

আর বাচালতা করিস না সুরঙ্গমা। দ্রুত প্রসাধন পর্ব শেষ কর—সেই সুবৃহৎ মুকুরে প্রতিবিম্বিত নিরাবরণ দেহ থেকে বিচ্ছুরিত স্বর্ণের অত্যুজ্জ্বল দীপ্তির দিকে তাকিয়ে বর্ণদাসীর চোখে গর্বের দৃষ্টি পরিস্ফুট হয়ে উঠল। অস্ফুট-কণ্ঠে বলল ওদিকে আমার কোষাধ্যক্ষের কাছে কে সর্বাগ্রে আমার প্রতি রজনীর দক্ষিণা এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দেবে নাগরদের মধ্যে তাই নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গিয়েছে—তা হোক ভদ্রে, রূপের পসারিণী তুমি, রূপ পরিচর্যা তোমার সর্বাগ্রে প্রয়োজন, প্রসাধননিপুণা পরিচারিকারা তাকে অব্যাহতি দেয় না।

তারা ঝামব ঘর্ষণে মসৃন সেই দেহগাত্রকে আরও মসৃনতর করার অভিপ্রায়ে বন্য রেড়ির তৈল মর্দণ করল উত্তমরূপে। অনন্তর তারা একটা সুগন্ধী ভস্মচূর্ণ পরমযত্নে তার সারা অঙ্গে মাখিয়ে দিল। বর্ণদাসী অসহিষ্ণু হয়ে বলল, নিত্যি দিন এসব ছাইভস্ম দিস যে কেন তোরা ?

নবীনাদাসীরা স্তব্ধ হয়ে থাকে।

কিন্তু বহুদর্শী প্রবীনা সুরঙ্গমা কেন যেন গম্ভীর হয়ে যায়। বিষণ্নকণ্ঠে বলে, তুমি বলছো কি ভদ্রে, এই সুগন্ধী চূর্ণের ভেতরে কি আছে জানো ?

কি আছে তোরাই জানিস ?

আছে বার্লি আর হাড়ের গুঁড়ো। বার্লিতে দেহত্বক বহুদিন মসৃন থাকে। কখনো ভাঁজ পড়ে না। আর নিয়মিত হাড়ের গুঁড়ো মাখলে কপালে বলিরেখা—

বাব্বাঃ তুই জানিসও অনেক সুরঙ্গমা, হেসে ওঠে বর্ণদাসী। তা তোরা আমাকে সাজতে রাত্রির প্রথম যাম যে উত্তীর্ণ করে দিলি—

এখন তোমার নয়ালী যৌবন ভদ্রে। বন্যার উত্তাল নদীর মত। কিন্তু একদিন ভাটার টান ধরবে। প্রাকোষ্ঠেরই এক কোণে রৌপ্যনির্মিত ফুলদানীতে শোভিত শুষ্ক নাগকেশরের বিবর্ণ স্তবকের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল সুরঙ্গমা, বয়স তার তীক্ষ্ণধার অস্ত্রশস্ত্র—ওই বলীরেখা, ওই পক্ককেশ নিয়ে তোমাকে যখন আক্রমণ করবে তখন তুমি আত্মরক্ষার জন্য আকুল হয়ে খুঁজবে—

তুই চুপ করবি কি না সুরঙ্গমা। ক্রুদ্ধা নাগিনীর মত বিষাক্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে বর্ণদাসী। সুরঙ্গমার মুখে ভয়ের ছায়া থর থর করে কাঁপে। আর একটিও কথা বলে না। তার মনে পড়ে যায়, সে বেতনভুক সেবাদাসী মাত্র। বর্ণদাসী তার সখী নয়। প্রভু। তাই তাড়াতাড়ি করজোড়ে বলে, আমার অপরাধ মার্জনা করো ভদ্রে—এখন বলো কি ছাঁদে কবরী বাঁধবে? একটু থেমে আবার বলে, চালচিত্র, না পানপাতা, না রাধাচুড়ো?

কোন কথা বলল না বর্ণদাসী।

তার আহত মনের উত্তপ্ত চিন্তার স্রোত বয়ে চলেছে, সুরঙ্গমা জানে না, সে রূপের বেসাতিনী। সে ঐশ্বর্যশালী শত শত পুরুষের সুখসহচরী। ঐহিক বিলাস, ব্যসনে আর ভোগসুখের ভেতরে সে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে চায়। না—না, কখনো সে—এক মুহূর্তের জন্যেও সর্বনাশা ভয়াল সেই অনিবার্য পরিণতির অশুভচিন্তা মনের কোন কোণে ঠাঁই দিতে চায় না! বলো, তুমি আমাকে ক্ষমা করেছো—বলেই তার উরুদুটো এমন নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল সুরঙ্গমা যে বর্ণদাসী হেসে ফেলল।

বলল, শোন সুরঙ্গমা, আজ কোন ছাঁদেই কবরী বাঁধতে হবে না, তুই শুধু তোর নিজের হাতে দীর্ঘ পুষ্ট একটা বেনী রচনা করে দিবি—

কেন বলো তো ভদ্রে? গতকাল করেছিলাম রাধাচুড়ো কবরী—ভেবেছিলাম আজ পানপাতা—

না রে, মগধের এক বিশিষ্ট আমাত্য আসবেন। একটি রজনীর জন্য তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে গিয়েছেন অগ্রিম—

কেন?

তিনি নাকি আমার দেবারতি নৃত্য দেখতে অভিলাষী। সেই নাচে বিনুনীই সুবিধা!

অনন্তর সুরঙ্গমা দ্রুত হাতে অতিকায় কৃষ্ণসর্পের মত একটা বেনী রচনা করল। তাতে জড়িয়ে দিল সুপুষ্ট আর সুগন্ধী বেলীফুলের মালা। সযত্নে পরিয়ে দিল শ্বেতশুভ্র মসৃন বস্ত্রনির্মিত অন্তর্বাস; তার উদ্ধত দুটি স্তনভাণ্ডকে স্বর্ণখচিত পীতবর্ণের কাঁচুলীর দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করল। আর অঙ্গে জড়িয়ে দিল, মেঘডম্বুর নীলাভবস্ত্রাবরণ। অসম্বৃতা এক রঙীন মরীচিকার মূর্তির মত জলতে লাগল বারাণসীর মক্ষিরাণী বর্ণদাসীর বরতনু!

যখন নগরশোভনা সেই গণিকা পরিচারিকা সমভিব্যাহারে তার প্রমোদকক্ষের নৃত্যস্থলীর দিকে অগ্রসর হলো ঠিক সেইসময় রাজপ্রাসাদের একটি প্রকোষ্ঠে বসে রাজসখা শ্রেষ্ঠীপুত্র মহাধনকুমার কেমন অস্থির ও উন্মনা হয়ে উঠল। বারংবার সন্ধ্যাবায়ুতে আন্দোলিত প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানের জাতিপুষ্পের বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল।

কি বন্ধু অক্ষ (পাশা) ক্রীড়ায় তোমার মন নেই?

না, মনসংযোগ করতে পারছি না বন্ধু। তুমিই বলো। সন্ধ্যাসমাগমে যখন সমগ্র বারাণসীর রাজপথের দুপাশে বিপনীতে বিপনীতে আলো জলছে; পথে পথে সুবেশা রমনীদের ভীড় জমে উঠেছে। আলোকোজ্জল পানশালায় নরনারীর মত্ত উল্লাসের ফোয়ারা চলেছে। সে সময় চার দেওয়ালে আবদ্ধ এই ঘরে বসে কি পাশা খেলতে—

কিন্তু তুমি বিস্মৃত হয়ে যেও না সখা আমি সম্রাট। তুমি শ্রেষ্ঠী। শুধু তাই নয়, তুমি সবাপেক্ষা ধনাঢ্য স্বর্বর্ণশ্রেষ্ঠী। আমরা সাধারণ নগণ্য নাগরিকদের মত—

কী আশ্চয, ওই নগরবাসীদের মত আমাদেরও জীবনে আমোদ প্রমোদের প্রয়োজন যে আছে—তা কি তুমি স্বীকার করো না?

ব্রহ্মদত্তকুমার স্তব্ধ হয়ে যায়।

সখার মুখাবয়বে অপ্রসন্নতার কালো ছায়া লক্ষ্য করে। মহাধনকুমার অধোমুখে বসে থাকে। আর ভেতরে ভেতরে নিঃশব্দ দাবদাহে জলে যায়। যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে অথচ এমন সময়ও ছিল যখন প্রতিটি দিন সায়ংকালে আমাকে নিয়ে বর্ণদাসীর কাছে—

বেশ্যালয়ে গমন এবং বারনারীর সঙ্গে প্রমত্ত নিশিযাপন ব্যতীত কি অন্য কোন আনন্দের উপকরণ নেই সখা? এইবার নিশ্চুপ হয়ে যায় স্বর্বর্ণ শ্রেষ্ঠীপুত্র। তার ভোগবাসনাতুর দুটো চোখে লজ্জার ছায়া পড়ে। তরুণ

নৃপতি তার মনের ভেতরে ডুব দিযে যেন বলে, তাছাডা দেখ আমি রাজা—আমি নাগরিকদের সম্মুখে একটা সুস্থ ও বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ—

তুমি আমার অপরাধ মার্জনা করো বন্ধু, মহাধনকুমার নিজের ওপরেই আক্রোশে জ্বলতে জ্বলতে মর্মান্তিক খেদোক্তি করে, তুমি রাজ্যশাসনের ভিতরে, নানাবিধ রাজকীয কাযের ভেতরেই অব্যপরতন সেই আনন্দের সন্ধান পেযেছো আমি যে কেন—

অনাবিল হাসি হেসে প্রিযবন্ধুকে নিবিড আলিঙ্গনে বদ্ধ করে ব্রহ্মদত্ত-কুমার বলে, পাবে—পাবে, তুমিও পাবে সখা—তুমি বণিক। তুমি শুধু সোনা নয, মুক্তা, প্রবাল, ইন্দ্রনীল, মরকত, পদ্মরাগ ইত্যাদি রত্ন বিশেষজ্ঞ, কযেক মুহূর্ত দূরে গবাক্ষের বাইরে মহানগরীর বর্ণময আলোর ছটায উদ্ভাসিত আকাশের দিকে তাকিযে সে আবার বলল, তুমি তোমার রত্নসম্ভার নিযে দূরদেশে বাণিজ্যে যাও বন্ধু—

কোন দেশে যাবো ?

কেন, পশ্চিমের দেশে তক্ষশিলা (পাঞ্জাব), কান্দাহার পেরিযে গান্ধারে কপিশায (আফগানিস্থান) যাও—বহ্লীক (ব্যাকট্রিযা) প্রদেশে যাও, একটু থেমে আদর্শবাদী সেই যুবা নৃপতি আবার বলে, বারাণসীস্থ মগধ এবং কোশলের রাজদূতদের কাছে শুনেছি, সে সব দেশে নাকি পার্থিযা (পারশ্য) *তুখারা (তোখারিস্থান) এবং সুগ্দীযানার (মধ্যএশিযার আমুদরিযা-শিরদরিযা উপত্যকা আধুনিক কালের উজবেকিস্থান) প্রভৃতি মধ্যএশিযার বিভিন্ন উন্নত দেশের সওদাগবরা অযুত বলশালী অশ্ব, কৌষেয (রেশম), উর্ণা (পশম) উনা (লিনেন), কপিশাযন (কপিশার পশমজাত কম্বল) এবং চীনাংশুক (চীনা রেশম) বিবিধ পণ্যসম্ভার নিযে আসে। তাদের কাছে নাকি ভারতীয রত্নের খুব আদর—

তাই নাকি—বলছো কি তুমি ? তীব্র উত্তেজনায আনন্দের অতিশয্যে শ্রেষ্ঠীপুত্র ধনকুমার বন্ধুর হাতটা ধরে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকুনি দিযে বলল—শোন, শরৎকালই বাণিজ্য যাত্রার সর্বোৎকৃষ্ট সময—আগামী শরতের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে আমি পশ্চিমের দেশে যাত্রা করবো।

---

*স্মরণাতীত কাল থেকেই ভারতের সঙ্গে মধ্যএশিযার বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল—এই প্রসঙ্গে লেখকের “গঙ্গা থেকে কাস্পিযান” এবং “বাণিজ্যে বাঙালী : একাল ও সেকাল” দ্রষ্টব্য।

ঘুমন্ত বারাণসী। স্তব্ধ জনহীন রাজপথ। বৃক্ষশোভিত সেই পথের মোড়ে মোড়ে বাতিগুলো মৃতের মত নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। নিস্তব্ধ সেই পথকে প্রকম্পিত করে একটি সুদৃশ্য রথ দ্রুতবেগে চলেছে। খট্—খট্—খট্—চারিদিকের প্রেতায়িত স্তব্ধতাকে সচকিত করে সেই রথচক্র এবং দুইটি বলশালী অশ্বখুরের প্রবল শব্দ শাঁ শাঁ বাতাসের সওয়ার হয়ে দূরদূরান্তরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এই—ও—পাপিষ্ঠ—নরাধম, কোথায় যাচ্ছিস—রথারূঢ় যুবক জড়িতস্বরে গোঙানির মত আর্তনাদ করে বলছে, তুই কি আমাকে কপিশায়, কি গান্ধার বহ্লীকের সেই নরকের দেশে নিয়ে যাচ্ছিস ?

প্রভু—একটু সংযত করুন নিজেকে, সারথি করজোড়ে বলে, না হলে মাটিতে পড়ে যাবেন যে—

কিন্তু কাকে বলছে—কে শুনছে। সুগন্ধী তীব্র উত্তেজক সুরাপানে গভীর নেশাচ্ছন্ন সেই যুবকের মনে হল, বারাণসীর আকাশের রাশি রাশি তারার ফাঁকে ফাঁকে দূরপ্রসারিত ধূসর ছায়াপথ ধরে তার শকট চলেছে তার সেই দুঃস্বপ্নের—তার নির্বাসনের সেই কাপিশা—তক্ষশীলার দেশে। আর সেই গমনপথের দুইপাশে নীহারিকাপুঞ্জ, অযুত কোটি উজ্জ্বল এক একটা গ্রহ নক্ষত্রের পাশে পাশে অনিন্দ্যসুন্দর এক রমণীর প্রতিমার মত সুডোল মুখ, মহারাজ ব্রহ্মদত্তকুমারের গম্ভীর কঠোর মুখাবয়ব এক একবার উঁকি দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে—

এই—ও—কার রথ ? নগর প্রতিরক্ষাব্রত নিশাচর প্রহরী হাঁকে।

সুবর্ণ-শ্রেষ্ঠী—মহারাজ বান্ধব—মহাধনকুমারের—শ—ক—ট—ও—উচ্চস্বরে প্রত্যুত্তর দেয় সারথি।

স্বকর্ণে তার নাম শুনে মহাধনকুমারের নেশার আচ্ছন্নতা কেটে যায়। আর সেই সন্ধ্যাসমাগম থেকে রাত্রির মধ্যযাম ভেতরে যতগুলো—যতগুলো রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছে তার সব যেন তার চোখের সামনে রঙীন মিছিল করে হাঁটতে থাকে—

বন্ধুর কবল থেকে মুক্ত হয়েই সে সোজা চলে গিয়েছিল বর্ণদাসীর প্রমোদ-গৃহে। তার সান্নিধ্যে উপনীত হওয়া মাত্র তার মনে হয়েছিল—মনে হয়েছিল স্বচ্ছসলিলা এই ভোগবতী ধারার জন্যেই সে দীর্ঘক্ষণ পিপাসাতুর হয়েছিল। তাই সেই জলের ঐশ্বর্যেভরা, খরস্রোতা নদীতে নেমে স্নান করে পরিতৃপ্ত

হতে খুব বিলম্বও করে নি! অনন্তর তার সুনিপুণ রমনক্রীড়ায় পরমতৃপ্ত, আশ্লেষকান্ত সেই সুন্দরী শ্রেষ্ঠা বারাঙ্গনাকে বলেছিল, তুমি নাকি তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে নগ্নদেহে নৃত্যপ্রদর্শন করো?

কোন কথা বলে না বর্ণদাসী। সেই সুরম্য শয়নপ্রকোষ্ঠের স্বপ্নের মত মৃদুনীলাভ আলোর তরল ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারে তাকে কোন সুদূর অপার্থিব লোকের দেবীমূর্তির মত মনে হয় তার। প্রেয়সীর প্রায় অবারিত সেই স্বল্পবাস দেহলতাকে নিবিড় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করে সে আবার ব্যাকুল কণ্ঠে বলেছিল, বলো না বয়স্যা—কবে—কবে দেখাবে আমাকে তোমার সেই নৃত্য—

কত শত বারই তো তুমি আমার দেহের নিরাবরণ রূপ দেখেছো সখা, এখনও দেখছ—তাও তোমার তৃষ্ণা মিটছে না?

বলো কি বর্ণদাসী, তুমি না নৃত্যশিল্পী, নৃত্যের তালে তালে তোমার প্রতিটি অঙ্গের ছন্দ, লীলায়িত পেশীপুঞ্জের বিক্ষেপ, বিভ্রম রচনাকারী বিভিন্ন মুদ্রাকে আরও অপরূপ—আরও মায়াময় করে তুলবে তোমার অনাবৃত দেহের আদিম আর অপরিসীম সেই সৌন্দর্য—

দেখাবো—দেখাবো গো, স্তাবকতায় বারনারী খুশি হয়। কিন্তু কেন যেন আশঙ্কিত হয়ে বলে, কিছু অসুবিধাও আছে—

কি?

তোমার প্রাণের সখা, রঞ্জিত ওষ্ঠদুটো দৃঢ় সংবদ্ধ করে বর্ণদাসী বলল, অর্বাচীনটা সিংহাসনে বসেই নীতিবাদী হয়ে উঠেছে! অথচ তুমি তো সবই জানো, একসময়ে সে আমার সামান্য অনুগ্রহের জন্য—

কেন সে কী সেই নাচ আইনানুযায়ী দণ্ডনীয় ঘোষণা করেছে?

প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করছে। গুপ্তচর লাগিয়েছে—বলেই উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙ্গে পড়েছিল বর্ণদাসী। হাসির দমককে সংযত করেছিল। তাচ্ছিল্যের বাঁকা হাসি হেসে আবার বলেছিল, সাধুপুরুষের সেই অনুচরগুলো খোঁজখবর করবে কি—সেই মুখপোড়া মিন্সেরা পোষা কুকুরের মত আমার—

কোনদিনই কি সে নাচের কথা কেউ জানতে পারে নি, তাহলে রাজার কানে গেল কি করে?

তার কর্ণগোচর হয়েছে বাতাসে ভেসে আসা উড়ো খবরের মত—

কেন যে সৌভাগ্যবানেরা প্রত্যক্ষ করেছে, তারাও তো বলতে পারে?

অসম্ভব! তারা গোপন রাখবে—সে সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ থাকে। আর

বেশ্যাশক্ত কোন লোকের কথা কেউ বিশ্বাসযোগ্য মনে করে না—

রাখো ওসব কথা। তুমি কবে আমার অনুরোধ রাখছো ?—

বাধা আছে সখা—

কী বাধা ? সেই প্রতিবন্ধক অপসারনের জন্য আমি সপ্তসাগর মন্থন করতে পারি বর্ণদাসী, সে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। প্রচণ্ড আবেগে অস্থির হয়ে বলেছিল, আমিও অঙ্গীকার করছি রাজাকে—

না সে জন্য নয়। চারদেওয়াল ঘেরা এই শয়নকক্ষে কি নৃত্যস্থলীতে সেই নাচ হয় না—

বলো কোথায় যেতে হবে—কতদূরে যেতে হবে—

এইবার স্তব্ধ হয়ে যায় প্রগলভা সেই নগরশোভনা বর্ণদাসী। স্বল্পালোকিত ঘরের সেই আলোআঁধারীতেও শ্রেষ্ঠীনন্দনের চোখ এড়ায় না, সেই সুন্দরী রূপজীবিনীর চোখদুটো কেমন মেদুর আর স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। বলে,যেতে হবে অনেক—অনেক দূরে—সেই গঙ্গার ধারে সেই ধু ধু বালুচরে। আবারনিশুতি রাত হওয়া চাই। আবার যে কোন রাত্রে গেলেই হবে না। রাতটা মাঘীপূর্ণিমার রাত হওয়া চাই। আকাশে থাকবে চাঁদ। শীতের কুয়াশা জড়ানো ঘোলাটে জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে থাকবে বালুচরে। দূরে নদীর জলের অস্ফুট কলোল্লাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমি সেই জনমানবহীন নির্জন বালুচরে বিভোর হয়ে নেচে যাবো। তুমি দেখবে—

বাঃ—মাঘীপূর্ণিমার আর তো বেশি বাকী নেই—

তবে আমার শরীরটাও আবার সুস্থ থাকা চাই। মনের ভেতর থেকে প্রেরণাও আসা চাই। আর—

আর কি ?—তোমার দক্ষিণার কথা বলছো তো ?

হ্যাঁ। সেটা অগ্রিম দেবে। একটু বেশি দেবে—

প্রতি রাত্রেই তো আমি আগাম দেই। এই আজকের দক্ষিণা এক সহস্র মুদ্রা তোমার কোষাধক্ষ্যের কাছে জমা দিয়ে তবে এসেছি, একটু থেমে শ্রেষ্ঠীপুত্র বলল, তবে এই নাচের জন্য কত বেশি দিতে হবে ?

পাঁচ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা—

বেশ তাই দেব—

আর তুমি তো সুবর্ণশ্রেষ্ঠী। আমাকে একটা উপহার দেবে ?

কি ?

রক্তপ্রবালের কঙ্কন—

দেব—

সেই মাঘীপূর্ণিমার রাত্রিটার প্রতীক্ষায় তার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। তার প্রাণের চাইতেও প্রিয়, তার নয়নের মণি, যার শ্রীঅঙ্গের সৌরভ 'এখনও—এখনও তার সর্বাঙ্গে পাকে পাকে জড়িয়ে রয়েছে—সেই বর্ণ-দাসীকে ছেড়ে, তার আবাল্যের স্মৃতিবিজড়িত বারাণসী, তার হাজারো প্রলোভন ত্যাগ করে কোথাও সে যেতে পারবে না—

অসম্ভব! এই বিলাসব্যসন ছেড়ে কোথায় কতদূরে সেই পাহাড় আর মরুভূমির দেশের পথে পথে তাকে ঘুরতে বলছে তার ওই নীতিবাগীশ বন্ধু—বদ্ধ উন্মাদ যাকে বলে—

প্রভু—আমার গৃহদ্বারে উপনীত হয়েছি—

সারথির কথায় ছিন্ন হয়ে গেল তার চিন্তাসূত্র।

দিন কাটে। মাস যায়। বারাণসীর এক যোজন দূরে আলোকোজ্জ্বল সেই প্রমোদভবনের বাসরে এক একটি প্রমত্ত নিশিযাপন করে সুবর্ণশ্রেষ্ঠী মহাধনকুমার। কিন্তু প্রতি দিনই তার সেই সুরম্য শয়নকক্ষে এসেই বর্ণদাসী তাকে প্রশ্ন করে, তুমি আজকের দক্ষিণাটা জমা দিয়েছো তো?

নিশ্চয়ই, মহাধনকুমার বলে, আমি ব্যবসায়ীর ছেলে। দেনা-পাওনার ব্যাপারে আমার ভুল হয় না—

হ্যাঁ। আমারও তো এটা ব্যবসা—

মহাধনকুমার কোন কথা বলে না। সুযৌবনা, স্বনামধন্য নৃত্যপটিয়সী নগরশোভনাকে তার মনে হয় যেন শাপভ্রষ্টা কোন অপ্সরী। ওর অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ, খরযৌবন, শিল্পীমন—সব—সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে একটি অতিকায় লোভের দৈত্য! সেই দৈত্যটা ওকে অঙ্কুশের খোঁচা—

কি ভাবছো—

ভাবছি, এই বিপুল ঐশ্বর্য দিয়ে তুমি কি করো?

কি করি? মোহমাখা হাসি ফুটে ওঠে বারাঙ্গনার মুখে। ক্ষণকাল কি ভেবে বলে, আচ্ছা, একদিন দ্বিপ্রহরে এস—দেখবে কি করি—

শ্রেষ্ঠীপুত্র একদিন সত্যি সত্যিই কৌতূহলী হয়ে এল বর্ণদাসীর গৃহে। বারাণসীর আকাশে তখন মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত সূর্য জ্বলছে। তার খরদাহ

ছড়িয়ে পড়ছে দিকদিগন্তে। প্রধান তোরণে দাঁড়িয়ে সঙ্কেতধ্বনি করতেই এল সুরঙ্গমা—তার চোখে বিস্ময় আর কৌতূহল ঘনিয়েছে লক্ষ্য করে মহাধনকুমার বলল, তোমার প্রভু, আমাকে এই অসময়ে এখানে আগমনের সম্মতি দিয়েছেন—

ও—আমার অপরাধ মার্জনা করবেন ভদ্র—একটু থেমে বলল,আপনার তো সুপরিচিত এই গৃহ, সোজা চলে যান—তার শয়নকক্ষে—কেন যেন শিষ্টাচার অনুসারে অতিথিকে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিল না।

সুরঙ্গমার মনে হল, রূপসী অর্থপিশাচী এতদিনে বুঝি এই যুবক বণিকের প্রণয়াসক্ত হযে পড়েছে। তা নাহলে এই নির্জন মধ্যাহ্নে ওই বিচিত্র স্বভাবের গণিকা খুব সঙ্গোপনে যে অদ্ভুত কার্যে মত্ত হযে পড়ে, সেটা প্রত্যক্ষ করার জন্য এই শ্রেষ্ঠীপুত্রকে সাদর আহ্বান করতো না।

ব—র্ণ—ও—ও—বারাঙ্গনার সেই বৃহৎ প্রাসাদের দিকে দিকে মহাধন-কুমারের ব্যাকুল কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়। কোথায় বর্ণদাসী! তার শযনকক্ষে নেই, মাদিরাগৃহে নেই, নৃত্যস্থলীতে নেই। তার কোন পরিচারিকাকেও দেখা যাচ্ছে না!

আসুন—এই পথে, ভদ্র, সুঠামদেহী সুদর্শনা এক দাসী এগিয়ে এল। কিন্তু আশ্চর্য! কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে তার চোখদুটো আবদ্ধ।

তোমার চক্ষুতে কি কোন ব্যাধি?

নিঃশব্দে আমায় অনুগমন করুন ভদ্র—

মহাধনকুমারের মনে হল, একটা রহস্যাচ্ছন্ন অন্ধকার অজানা রাজ্যের ভিতর দিযে সে চলেছে। বহুমূল্য আসবাবে সুসজ্জিত এক একটা প্রোকোষ্ঠ অতিক্রম করে তারা এসে পৌঁছল বৃহৎ সেই অট্টালিকার ত্রিতলের একপ্রান্তে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কক্ষের সম্মুখে। পরিচারিকা তিনবার মৃদু করাঘাত করতেই উন্মুক্ত হয়ে গেল তার লৌহদ্বার! আর তৎক্ষণাৎ শ্রেষ্ঠীপুত্রের চোখ দুটোর দৃষ্টি যেন কিসের অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। গবাক্ষহীন, আলোবাতাসশূন্য সেই লৌহনির্মিত প্রোকোষ্ঠের শ্বেতপাথরের মেঝেতে অন্তত দুইহস্ত পরিমান পুরু করে রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা ছড়িয়ে রয়েছে। মুদ্রার সেই পুরু আস্তরনের ওপরে এখানে সেখানে নানাবিধ রাশীকৃত বহুমূল্য অলঙ্কারের স্তূপ! বারাঙ্গনার সেই রত্নাগারের দেওয়ালে দেওয়ালে এক একটা গুপ্তকুঠরিতেও শোভা পাচ্ছে নানারকমের মুক্তা, প্রবাল, পুষ্পরাগ ইত্যাদি বিবিধ রত্ন।

দেখেছো প্রিয়তম, স্বর্ণাভরণের একটা স্তূপের ওপরে।

সম্রাজ্ঞীর মত সমাসীন বর্ণদাসী বলল, আমার রূপ যৌবনের কারবারের লাভের অঙ্কের পরিমাণ! একটু স্তব্ধ হয়ে মহাধনকুমারের বিস্ময়াপ্লুত মুখাবয়বের দিকে তাকিয়ে আবার বলল সে, জানো, প্রতিদিন মধ্যাহ্নের এই অবসরে আমি আমার এই অপরিমিত ঐশ্বর্য,—এই বহুমূল্য স্বর্ণাভরণগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করি। সুবর্ণমুদ্রাগুলো গুনি আর আমার এই উদগ্র যৌবনপণ্যের কী সর্বগ্রাসী শক্তি—তা উপলব্ধি করে বিপুল আনন্দ অনুভব করি—বলতে বলতে যৌবন-মদমত্ত সেই বারাঙ্গনা কেমন প্রগলভা হয়ে ওঠে, দেখেছো, এই মুক্তাযুক্ত কেশরটা দিয়েছে শ্রাবস্তীর রাজপুত্র, রঙীন একটা প্রজাপতির মত যেন হাওয়ার ওপর পা ফেলে ফেলে তার ধনাগারের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে আর এক একটা অলঙ্কার টেনে টেনে নিয়ে বলে যায়,—নাকের এই মুক্তাবলীটা দিয়েছে 'পুষ্করণ' নামে মরুরাজ্যের নৃপতি ; এই দেখ পুণ্ড্রবর্দ্ধনের এক রেশমশ্রেষ্ঠী দিয়েছে স্বর্ণের এই কডিবউলী, জানো—শুধু বারাণসী কেন, আমার অঙ্গুলিহেলনে আমার এই চক্ষুর একটি মদির কটাক্ষে আসমুদ্র হিমাচলের যাবতীয় ঐশ্বর্য এসে পড়তে পারে আমার পায়ের কাছে—

ইস কী অপার তোমার ঐশ্বর্য—

বলছো কি তুমি এ তো কিছুই না,—আরও—আরও চাই, বলতে বলতে তীব্র উত্তেজনায় চঞ্চল ও অস্থির হয়ে উঠল বর্ণদাসী। বহুমূল্য দুটো অলঙ্কার মুঠো করে ধরে হাতদুটো উর্দ্ধে দ্রুত আন্দোলিত করে বদ্ধউন্মাদিনীর মত বলতে লাগল, আমি বেশ্যা, আমি ঘৃণ্য, আমি নগণ্য আর অবহেলিত বলেই ধনে ঐশ্বর্যে আমি সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে চাই—আবদ্ধ কক্ষে গমগম করে বাজতে লাগল তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

মহাধনকুমার স্তব্ধ হয়ে গেল। এই পরমাসুন্দরী বারাঙ্গনার সুখী জীবনের আড়ালে যে নিদারুণ একটা হীনমন্যতার জ্বালা আছে, সেটা উপলব্ধি করে ব্যথিত হলো। আর অস্বস্তিকর সেই পরিবেশকে দূরীভূত করার অভিপ্রায়ে প্রসঙ্গান্তরে গেল। মৃদু, শান্ত কণ্ঠে বলল, শান্ত হও প্রিয়ে, মঙ্গলময় বিধাতার কাছে প্রার্থনা করি, তুমি ধনদৌলতে অগ্রগণ্য—

বিধাতা কি? আমি ঈশ্বর মানি না, পাপ-পুণ্য মানি না—আমি নিজের এই দেহকে—এই যৌবনকেই ঈশ্বর বলে মনে করি—

আচ্ছা—ভগবানের কথা বলবো না প্রিয়ে, ক্রুদ্ধা, গর্বোদ্ধতা সেই

বারনারীকে কি ভাবে সংযত করবে ভেবে না পেয়ে শ্রেষ্ঠীপুত্র বলল, যদিও মধ্যাহ্নে এসেছি, তবুও এখনকার এবং অন্য রজনীর সব মিলিয়ে দুই সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা দক্ষিণা নিয়ে এসেছি।

উত্তম—তোমার মত সুশীল এবং রুচিবান প্রণয়ী আর নেই আমার—

সখী, মাঘীপূর্ণিমার আর তো মাত্র সপ্তাহকাল অবশিষ্ট আছে—

হ্যাঁ আমার স্মরণ আছে। তুমি সেদিন রাত্রির মধ্যযাম অতিক্রান্ত হলে রথ নিয়ে আসবে আমার গৃহে—

নিশ্চয়ই,—বলেই দ্রুত পায়ে কক্ষ থেকে অতিক্রান্ত হবে এমন সময় বর্ণদাসী আবার ডাকল, শোন—দাঁড়াও—

বলো—

রক্তপ্রবালের কঙ্কনের জন্য তোমার কারিগরদের বলেছো ?

তোমার সেই প্রবাল আভরণ প্রস্তুত প্রিয়ে—বর্ণদাসীকে নিবিড় আলিঙ্গন... করে তার গণ্ডদেশে তপ্তচুম্বন এঁকে দিল শ্রেষ্ঠীকুমার।

প্রভাতে, অপরাহ্নে, সায়ংকালে, এই তিনক্ষণেই রাজসন্দর্শনে যায় মহাধন-কুমার। শুধু নৃপতি বলে নয়, বন্ধুকে নিবিড়ভাবে ভালবাসে। তাই উপেক্ষাও করতে পারে না। কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পরই যেন কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে বলপ্রয়োগ করে সেই মোহময়ী বারাঙ্গনার গৃহাভিমুখে নিয়ে যায়। যাবো না—যাবো না করেও যায়। তার সম্ভোগলিপ্সা ভয়াবহ একটি ব্যাধির জীবাণুর মত যেন তাকে গ্রাস করে ফেলছে। তার তনুমন উৎসুক হয়ে থাকে মাঘীপূর্ণিমার সেই আসন্ন রাত্রিটির প্রতীক্ষায়। তার মনের ভিতরে—জ্যোৎস্নালোকিত বালুচরে, প্রকৃতির সেই নির্জন আর অবারিত পরিবেশে নৃত্যরতা বর্ণদাসীর অনাবৃত দেহের যৌবনশ্রীর একটা অনির্বচনীয় রূপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কবে—কবে আসবে সেই মাঘীপূর্ণিমা—কিন্তু—

কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল অঘটন। সেদিন অপরাহ্নকাল থেকেই আকাশ ঘনকৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হবে উঠেছিল। শ্রেষ্ঠীকুমার তার মধ্যাকালীন সখাসান্নিধ্য সাঙ্গ করে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তনের পথেই মুষলধারে বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে গেল। তাই মহাধনকুমারের মনে চিন্তার উদয় হলো, সায়ংকালে রাজপ্রাসাদ হয়ে আর বর্ণদাসীর গৃহে যাওয়া সম্ভব হবে না। শীতঋতুর বৃষ্টি-দুর্যোগ সহজে ক্ষান্ত হয় না। তাই সে এল বারাঙ্গনার আলয়ে। শ্বেতপাথরের সিঁড়িগুলো দ্রুত পায়ে অতিক্রম করে এল তার রুদ্ধদ্বার প্রসাধন কক্ষে। সংকেত ধ্বনি করতেই

বেরিয়ে এল সুরঙ্গমা ! বৃষ্টিস্নাত শ্রেষ্ঠীপুত্র ব্যাকুল হয়ে বলল, বর্ণদাসীকে আমার কুশল জ্ঞাপন করে বলো, আসন্ন রজনীর দুর্যোগে আসতে সক্ষম হবো না বলেই এখন এসেছি—

ক্ষণকাল পরে নগরশোভনা গণিকার কাছে তার বার্তা নিবেদন করে ফিরে এসে সুরঙ্গমা বলল, আপনি শয়নকক্ষে প্রতীক্ষা করুন—

কয়েকটি দণ্ড উত্তীর্ণ হয়ে গেল। প্রসাধনরতা সেই সুযৌবনা বারাঙ্গনা মরালীর মত ধীর পায়ে এল তার শয়নকক্ষে। নিরাবরণ দেহের ওপরে হাল্কা সবুজ রঙের রেশমী বস্ত্রাবরণ শিথিলভাবে জড়ানো। প্রায় স্বচ্ছ সেই শাড়ির আড়ালে তার সুপুষ্ট দুটো জঙ্ঘার ছায়াময় লোভানি। আর সেই সবুজ অগ্নিশিখার ঊর্দ্ধলোকে কাঁচুলীর বন্ধনহীন বলিষ্ঠ দুটো গতিহারা দুরন্ত গ্রহের বিভ্রম। মহাধনকুমারের স্নায়ুতে স্নায়ুতে তীব্র উত্তেজনা তরঙ্গায়িত হয়ে গেল। গণিকা মোহভরা হাসি হেসে বলল, কী সখা, এই অসময়ে যে—

মহাধনকুমারের তখন আছন্ন হয়ে গিয়েছে সমস্ত চেতনা। লোপ পেয়েছে বাক্‌শক্তি। সে কামনান্মোত্ত হস্তীর মত যেই তার নরম দেহটাকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলো অমনি বর্ণদাসী কঠোরকণ্ঠে বলল, দাঁড়াও এক সহস্র সুবর্ণমুদ্রা আমার কোষাধক্ষ্যের কাছে জমা করে এসেছো।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো শ্রেষ্ঠীপুত্র। নিমেষে তার প্রচণ্ড উত্তেজনা দূরীভূত হয়ে হিমশীতল জলের স্রোত যেন বয়ে গেল তার মেরুদণ্ড বেয়ে। করুণ কণ্ঠে বলল, আমি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছি প্রিয়া, আগামীকল্য রজনীতে আমি দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা—

তুমি না শ্রেষ্ঠীর সন্তান—তুমি জানো না, বেশ্যালয় আর মদিরাবিপনীতে ঋনে কারবার হয় না—

আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—

না। একদিন নিয়মভঙ্গ করলে তোমার লোভ বেড়ে যাবে এবং তার পুনরাবৃত্তি করবে—

তুমি—তুমি আমাকে বিশ্বাস করো প্রিয়ে, আকুল হয়ে বলতে বলতে ব্যাকুল হয়ে কামনান্মোত্ত ধনকুমার উন্মাদের মত গণিকার উরুদেশ দুটো জড়িয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ণদাসী পদাঘাত করে তাকে দূরে সরিয়ে দিল আর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে বলল, তুমি বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও তুমি এই মুহূর্তে !—উচ্চৈস্বরে হাঁকল, প্রতি—হা—রী—

এল কৃষ্ণকায়, বলিষ্ঠ যমদূতের মত দুইজন প্রহরী। তারা তার গলদেশে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে তাকে প্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রান্ত করে দিল।

অপমানিত লাঞ্ছিত শ্রেষ্ঠীকুমার সেই দুর্যোগ মাথায় করে এসে দাঁড়ালো রাজপথে। মর্মান্তিক ক্ষোভে, আকস্মিক সেই রূঢ় নিষ্ঠুর আঘাতে বিশৃঙ্খল হয়ে গেল তার চেতনা। তাই অপেক্ষমান সারথির ব্যাকুল আহ্বানও তার কর্ণগোচর হলো না। •

সে আচ্ছন্নের মত কম্পিত পদক্ষেপে এল গঙ্গাতীরে। তার উত্তপ্ত চেতনার ভেতরে তার বন্ধু ব্রহ্মদত্তকুমারের মুখাবয়ব ভেসে ভেসে উঠতে লাগল। আর তার কর্ণকুহরে যেন ঝঙ্কৃত হতে লাগল ব্রহ্মদত্তকুমারের সেই কথাগুলো—বেশ্যালয়ে গমন এবং বারনারীর সঙ্গে প্রমত্ত নিশিযাপন ব্যতীত কি অন্য কোন আনন্দের উপকরণ নেই সখা ?

ঘন মেঘভারে আচ্ছন্ন বিপুলব্যপ্ত আকাশ, অশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় ঝাপসা কুয়াশার ঘের। নদীর বিশাল জলরাশি, দূরদিগন্তে প্রবল বাতাসে আন্দোলিত তরুশ্রেণী সমগ্র বিশ্বচরাচরই যেন এক সর্বনাশা প্রলয়ের স্রোতে লুপ্ত হতে চলেছে। দুর্যোগপূর্ণ সেই প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনন্ত মহিমায় হঠাৎ তার নিজেকে বড় দীন—বড় ক্ষুদ্রাপিক্ষুদ্র বলে মনে হলো—মনে হলো ভোগবাসনার দুর্গন্ধময় পাঁকের ভেতরে দুষিত কীটের মত কালাতিপাত করছে সে। আর সেই মুহূর্তে তার আবাল্য বিলাসব্যাসনে আসক্ত জড়গ্রস্ত সেই মনটা ভেঙ্গেচুরে দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে গেল। আর কে যেন ভেতর থেকে উদাত্ত কণ্ঠে বলল—চেয়ে দেখ এই অনন্ত উদার প্রকৃতির ভিতরে ভূমার ভিতরে অপার আনন্দ আছে……

পরদিবস মহাধনকুমার রাজপ্রাসাদে এল না।

এল না প্রভাতে, অপরাহ্নে, সায়ংকালে। ব্রহ্মদত্তকুমার সখার জন্য উদ্বিগ্ন হলো। হয়তো তার ব্যবসাকার্যে অবসরের অভাবে মহাধনকুমার আসতে সক্ষম হচ্ছে না। কিন্তু—

শ্রেষ্ঠীপুত্র এল না তার পরের দিনও। রাজদূত বার্তা নিয়ে এল, গত দুই দিবস আগে দ্বিপ্রহরে নগরশোভনা বারাঙ্গনা বর্ণদাসীর কাছে রূঢ়ভাবে অপমানিত হয়ে তার গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে সে! প্রহরীরা বর্ণদাসীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এল রাজসমীপে।

বারাণসীরাজ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, পাপিষ্ঠে, তুই আমার বন্ধুকে লাঞ্ছিত করেছিস কেন ?

মহারাজ আমার দক্ষিণা না নিয়ে সে প্রমোদ করতে—

কামাসক্ত পশুগুলো বারাণসীর সমগ্র ঐশ্বর্য তোর পায়ে ঢেলে দিচ্ছে তাও তোর তৃষ্ণা মিটছে না ? একটু থেমে কঠোরকণ্ঠে বলল, অবিমৃষ্যকারিণী, যেখান থেকে পারিস শীঘ্র তুই আমার বন্ধুকে নিয়ে আয়—নচেৎ তোর প্রাণদণ্ড দেবো—

রাজাজ্ঞায় ভীত হয়ে বর্ণদাসী তাকে অন্বেষণ করতে করতে এল বারাণসীর বত্রিশ যোজন দূরে। গঙ্গাতীরে শান্তরসাস্পদ এক তপোবনের সমীপে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। তরুণ দিব্যকান্তি এক ঋষির তপস্যানিমগ্ন প্রদীপ্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে শিহরিত হয়ে উঠল। দ্রুত তার পদতলে ভূলুণ্ঠিতা হয়ে বলল, আর্য আমি না বুঝে দোষ করেছি—আমাকে ক্ষমা করুন—

তপস্বীর অপলকনয়নে প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠল। স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল, তোমার ওপর আমার ক্রোধ নেই বর্ণদাসী—

তাহলে আমার রথে আরোহন করুন আর্য—আমার প্রমোদভবনে চলুন—প্রতিটি রজনীতে আমি—

শ্রেষ্ঠীপুত্র মহাধনকুমাররূপী বোধিসত্ত্ব সেই বারাঙ্গনার প্রস্তাবে একটি গাথা বলেছিল—

স্রোতহীন গঙ্গাজলে কুমুদ ফুটিবে ধবল শঙ্খের বর্ণ কোকিল পাইবে।
জম্বুবৃক্ষে তাল ফলিবে যখন হতে পারে আমাদের মিলন তখন ।।
কচ্ছপের লোমে লোকে শীত নিবারণ যখন ত্রিবিধ বস্ত্র* করিবে বয়ন।
হলেও হইতে পারে তোমার আমার মিলন তখন, নাহি সম্ভাবনা আর ॥

বর্ণদাসী তবুও নিরস্ত না হয়ে ব্যাকুলকণ্ঠে বলল, আর্য, আমার প্রস্তাবে সম্মত হন—আপনাকে আমার সমস্ত ঐশ্বর্য—

কোন ঐশ্বর্যের কথা বলছো ভদ্রে, তোমার টাকাপয়সা হীরা জহরৎ—

বোধিসত্ত্ব বলল, ওগুলো তো শূকরী বিষ্ঠাতুল্য—সেসবে আমার বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই, ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে সে দূরে—বহুদূরে গঙ্গার পরপারে দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে থেমে থেমে বলল, বর্ণদাসী আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, তুমিই আমাকে অতীন্দ্রিয় এক জগতের অপার ঐশ্বর্যের সন্ধান দিয়েছো—

ব্যর্থ হয়ে গৃহে প্রত্যাগমণ করল বর্ণদাসী। যৌবনমদমত্ত রূপসী সেই

---

* রেশম, পশম ও কার্পাসজাত বস্ত্র

বারাঙ্গনা নিজেকে কেমন নিঃস্ব আর রিক্ত বলে মনে হলো। নিদারুণ একটা গ্লানির অপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে তার সমস্ত চেতনা। আর একটা সুতীব্র যন্ত্রণা যেন শতমুখ দিয়ে তাকে বিদীর্ণ করছে। কোন—কোন মন্ত্রে বলীয়ান হয়ে শ্রেষ্ঠীপুত্র বোধিসত্ব হয়ে গেল? কেমন করে মোহময়ী নারী এবং ধনরত্নকে তুচ্ছ করতে পারল! কিসের ঐশ্বর্যের কথা বলছে সে? অতীন্দ্রিয় শব্দটার অর্থ কি—

কিছুকাল পরেই বারাণসীবাসী সবিস্ময়ে দেখল, নগরশোভনা পরমাসুন্দরী সৌভাগ্যশালিনী বর্ণদাসী তার প্রমোদগৃহের অনতিদূরে এক বিশাল প্রান্তরে একটি দীঘিকার খননকায নিবিষ্টচিত্তে পরিদর্শন করছে। তার সম্পূর্ণ নিরাভরণ দেহ থেকে যেন রিক্ততার সৌন্দর্যের এক প্রদীপ্ত জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে।

কয়েকমাস পরে সুস্বাদু আর কাকচক্ষু জলের ঐশ্বর্যে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল সেই সুবিপুল জলাধার। আর গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে এই অঞ্চলে পানীয় জলের নিদারুণ সেই কষ্ট দূরীভূত হলো। আর—

আর তার সেই আলোকোজ্জ্বল প্রমোদগৃহ রূপান্তরিত হলো দানগৃহে। কালক্রমে তার বিপুল ঐশ্বর্য দীনদরিদ্রদের বিলিযে এবং জনকল্যানের কাজে প্রতিটি মুদ্রা ব্যযিত করে সম্পূর্ণ রিক্ত আর নিঃস্ব হযে গিযেছিল অস্থানজাতকের নাযিকা সেই—

বর্ণদাসী।

চতুর্থ স্তবক

মগধের কামকলানিপুণা রূপসী স্বৈরিনী মৌর্যযুগের রাজনীতিতে এক বিস্ময়কর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

গণিকাবৃত্তি।

মানবসভ্যতার ইতিহাসের প্রাচীনতম এই বৃত্তি ঠিক যেন আদিকালের একটি খরস্রোতা দূরবিসর্পিল নদীর মত। কত যুগযুগান্তরব্যাপী, কত সহস্র বৎসর ধরে কত দেশ দেশান্তরের ওপর দিযে আজও নিরবধি উদ্দাম গতিতে বযে চলেছে তার অফুরান স্রোত।

বৌদ্ধযুগের মতই মৌর্যযুগেও বারাঙ্গনারা সমাজে সম্রাজ্ঞীর মহিমায যে বিরাজ করতো তার সুস্পষ্ট প্রমাণ কামসূত্রের রচয়িতা বাৎসায়নের সেই সগৌরব—ঘোষণা পাটলিপুত্রিকানাং গণিকানাং নিযোগেন দত্তকপৃথক চকার![১] পাটলিপুত্রবাসিনী গণিকাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন যে সম্মানজনক কাজ বলে পরিগণিত হতো তার আভাস পাওয়া যায এই শ্লোকে। প্রায তিন হাজার বছর আগের ভারতীয় সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বারাঙ্গনাদের প্রয়োজন যে অপরিহার্য ছিল তা পরিস্ফুট হযে ওঠে রূপজীবিনীদের এই বিচিত্র শ্রেণী-বিন্যাসের ভেতরে[২] কুম্ভদাসী, কুলটা, স্বৈরিণী, নটি, শিল্পকারিকা, প্রকাশবিনষ্টা, রূপজীবা, গণিকা ও বেশ্যা। পুরুষের যৌনকামনা চবিতার্থ করা ছাডাও সেবাযত্নের কাজে কুম্ভদাসী, দূতীর কাজে কুলটা ও স্বৈরিণী, রাষ্ট্রনাযক এবং গণ্যমান্যদের মনোরঞ্জন, নৃত্যগীতের মাধ্যমে তাঁদের অভ্যর্থনায় নটি ও শিল্পকারিকা, গোপনমন্ত্রণায় প্রকাশবিনষ্টা (অভিজাত বারবনিতা), গুপ্তচর এবং গুপ্তঘাতকের দুরূহ, জটিল আর দুঃসাহসিক কাজে রূপজীবিনী, গণিকা এবং বেশ্যার যে বিস্ময়কর ও গৌরবোজ্জল ভূমিকা ছিল তা প্রতীযমান হযে ওঠে মৌর্যযুগের সমাজের চিত্রসম্বলিত দুইটি মূল্যবান গ্রন্থে—"কামসূত্র" ও বাৎসাযনেরই আর এক নাম কৌটিল্যরচিত 'অর্থশাস্ত্র'। মৌর্যশাসনকালে সমগ্র গণিকাসমাজ যে রাষ্ট্রাযত্ত ছিল তার প্রমাণ অর্থশাস্ত্রের এই শ্লোক[৩]— "তেষা রূপজীবা ভোগাদ্বয়গুণং মাসং দদ্যুঃ।" অর্থাৎ রূপজীবা বা রূপদ্বারা জীবিকাকারিণী গণিকাকে প্রতিমাসে দুই দিবসের লব্ধ ভাটি বা পণ

(১) কামসূত্র: বাৎসাযন, অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ বসু পৃঃ ১৯

(২) কামসূত্র: বাৎসাযন, বারাঙ্গনা অধ্যায দ্রষ্টব্য

(৩) মৌর্যযুগ (৩২১-২৭২ খ্রীষ্টপূর্ব)

রাজসরকারকে কর দিতে হবে। রাষ্ট্র যেমন কর গ্রহণ করবে, তেমনি গণিকাদের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিয়মিত বেশ্যালয় পরিদর্শন করবে; দেহপোজীবিনী-দের স্বাস্থ্যের খবরাখবর নেবে; খোঁজ নেবে তারা নাচগানের অনুশীলন করছে কিনা! ভারতের নাট্যশাস্ত্রে, নৃত্যগীতে নিপুণা শিল্পীদের শিল্পপ্রতিভার বিকাশে সতত যত্নবান ছিল রাষ্ট্র।(৪) বর্তমানের নগণ্য অবহেলিত পণ্যবধূদের ভিতরে রাজসম্মানে ভূষিতা, নৃত্যগীত পটিয়সী সেই অভিজাত বারাঙ্গনাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। থাক সেসব কথা—

সেকালে যে কোন উৎসবের সমারোহে, আমোদপ্রমোদে, দীর্ঘমেয়াদী রাষ্ট্রবিপ্লবে, রক্তাক্ত যুদ্ধে এই বহুভোগ্যা নগরসুন্দরীদের যে কী সক্রিয় ভূমিকা ছিল তারই রোমাঞ্চকর ও বিচিত্র ইতিবৃত্ত পরিস্ফুট হয়ে উঠবে এই কাহিনীর ভেতরে—

আজ থেকে তেইশ শতাব্দী আগেকার কথা।

মহাভারতখ্যাত জরাসন্ধ এবং কৌরবনৃপতিদের অধ্যুষিত উত্তরভারতের ধনেজনেসমৃদ্ধ জনপদ মগধের বায়ুমণ্ডলে তখন ঘনীভূত হয়েছে দুঃখদুর্যোগের ঘোর অমানিশা। মহাজ্ঞানী, কূটনীতিজ্ঞ কৌটিল্য অর্থাৎ চাণক্যের কূটকৌশলে সপুত্র নিহত হয়েছে মগধের স্বনামধন্য নৃপতি মহানন্দ। মগধেশ্বরের প্রভুভক্ত মহামাত্য রাক্ষস রাজভ্রাতা সর্বার্থসিদ্ধিকে সিংহাসনে সমাসীন করে মৌর্য যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত এবং তার সহায়ক সেই ধূর্ত ব্রাহ্মণ চাণক্যের প্রাণবিনাশের প্রচেষ্টায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু—

কোথায় সেই কূটকুটিল ব্রাহ্মণ—কোথায় চন্দ্রগুপ্ত? রাক্ষস এবং তার অনুচরেরা হিংস্র নরখাদক ব্যাঘ্রের মত তাদের অন্বেষণ করছে মগধের সীমানার বাইরে চারিদিকের অরণ্যসমাকীর্ণ প্রদেশে।

না। কোথাও নেই নীতিসার প্রণেতা, পণ্ডিত মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় সেই ব্রাহ্মণ চাণক্য! কিন্তু বিবদমান দুইপক্ষই তাদের স্ব স্ব গুপ্তচরদের মাধ্যমে জ্ঞাত হচ্ছে, যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। প্রলয়ঝড়ের মত যখন মহাযুদ্ধের চক্রান্ত ঘনীভূত হচ্ছে আকাশে বাতাসে, মগধের ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে লাস্যময়ী এক নগরসুন্দরীর একটা বিচিত্র ভূমিকা ছিল। কোষমুক্ত তরবারির মত যেমন তীক্ষ্ণধার তার বরতনু তেমনি ক্ষুরধার তার বুদ্ধি। শুধু তাই নয়, সে ছিল চতুঃ-

---

(৩) কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত: পৃষ্ঠা-৮৩

(৪) কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, সপ্তবিংশ অধ্যায়, ৪৪ প্রকরণ দ্রষ্টব্য

মণ্ডী কামকলার লীলাময়ী নায়িকা, জটিল কূটনীতিতে নিপুণা ছলনাময়ী এক আশ্চর্য রমণী।

কিন্তু প্রস্ফুটিত পদ্মকোরকের ভেতরে যেমন বিষাক্ত কীট অবস্থান করে তেমনি তার ভেতরেও দুঃসহ একটা অভিশাপের বিষ ছিল বলেই হয়তো সে ঘটনা জটিল মৌর্য ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। বৃত্তান্তটি একেবারে প্রারম্ভ থেকে ব্যক্ত করি—

গহন অরণ্য।

ঘনসন্নিবদ্ধ শাল্মলী তরুশ্রেণীতে আচ্ছন্ন দিগন্তবিসারী এক অরণ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে দুইটি মৃন্ময় কুটির। আসন্ন তামসী রাত্রির অন্ধকার যেন তার কৃষ্ণবর্ণ পক্ষ বিস্তার করে অবতরণ করছিল হিংস্রশ্বাপদ সমাকীর্ণ সেই বনে। দূর থেকে শ্রুতিগোচর হচ্ছে বনময়ূরীর কর্কশ কণ্ঠস্বর! গভীর জঙ্গলাকীর্ণ সেই অরণ্যের অভ্যন্তরে তখন প্রেতপুরীর জমাট অন্ধকার। কণ্টকতরুর মধ্যস্থিত কোন গুল্মের ভিতরে হয়তো কোন অজগর প্রতীক্ষা করে আছে অসতর্ক শিকারের আশায়, হয়তো কোন অতল খাদের ভিতরে জ্বল জ্বল করছে ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের কপিশ চক্ষু। কৃষ্ণারাত্রির সমাগমে কৃষ্ণবর্ণ সেই অরণ্যের নিভৃতে যেমন ক্রুর আদিমহিংসা প্রকটিত হয়ে উঠেছে তেমনি একটি কুটিরাভ্যন্তরের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্রকায় দুইটি চক্ষুতেও আদিম প্রতিহিংসার লেলিহান অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। গব্যঘৃতে জ্বলন্ত স্বর্ণপ্রদীপের স্থির নিষ্কম্প শিখায় দৃশ্যমান হয় দৃঢ়সংবদ্ধ তার গণ্ডদেশ, ক্রোধে স্ফীত নাসারন্ধ্র। সুতীক্ষ্ণ দন্তদ্বারা অধর দংশন করে সে বলল, বৎস চন্দ্রগুপ্ত, কূটনীতির ভিত্তি কি তুমি জ্ঞাত আছো—

নিরুত্তর মৌর্যযুবরাজের চক্ষুতে কৌতূহল ঘনীভূত হলো। চাণক্য বর্ত্তিকার আলোকশিখার দিকে নিরীক্ষণ করে বলল—

বন্ধকাপোষকাঃ পরম-রূপ-যৌভনাভিঃ স্ত্রীভিঃ সেনামুখ্যান্ উন্মাদয়েষুঃ।

বহুনাম একস্যাংদ্বয়োঃ বা মুখ্যয়োঃ কামে জাতে তীক্ষ্ণাঃ কলহান্॥

অর্থাৎ বন্ধকী বা কুলটার পোষণকারী গুপ্তচরেরা পরমরূপযৌবনবতী স্ত্রীদের দ্বারা সেনামুখ্যদের উন্মাদিত করবে। সেইরকম একটি স্ত্রীতে যদি বহুসেনামুখ্যের অথবা দুইটি মুখ্যের কাম উপজাত হয় তখন তারা পরস্পরের ভিতরে কলহে প্রবৃত্ত হবে, বলেই উচ্চকণ্ঠে অট্টহাস্য করে উঠল চাণক্য। তার প্রবল হাসির প্রচণ্ড শব্দতরঙ্গ সান্ধ্যবায়ুতে ভর করে প্রবাহিত হয়ে গেল দূর দূরান্তরে।

'অনন্তর উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, আমারই রচিত এই শ্লোকের অর্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছো যুবরাজ? যে প্রকারে হোক চাই একটি পরমরূপা যৌবনবতী স্বৈরিণী—

স্বৈরিণী! চন্দ্রগুপ্তের মনে হলো, ক্রোধান্ধ ব্রাহ্মণ বুঝি দিবাস্বপ্ন দেখছে। অস্ফুটকণ্ঠে বলল, কিন্তু গুরুদেব আমি তো প্রত্যক্ষ করছি এই বিজন অরণ্যে আমরা দুটো মাত্র প্রাণী—

তুমি একটি মহামূর্খ, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন সহস্রশিখায় প্রজ্জলিত হয় তেমনি জ্বলে উঠে কঠোরকণ্ঠে বলল বিষ্ণুগুপ্ত অর্থাৎ মহাপণ্ডিত চাণক্য, যুবরাজ তুমি কি মনে করো, আমি পরম নিশ্চিন্তে এই অজ্ঞাতবাস করছি, ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে মৃদু অথচ গম্ভীরকণ্ঠে আবার বলল, শ্রবণ করো অর্বাচীন যুবক আমার সহাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ইন্দুশর্মাকে সন্ন্যাসীর, বিশ্বস্ত অনুচর রোহিতাক্ষকে বিটের* এবং বিকরালা নাম্নী বৃদ্ধা বারাঙ্গনাকে কুঞ্চকীর* ছদ্মবেশে রাজধানী কুসুমপুর পরিভ্রমণ করতে পাঠিয়েছি। তারা দুরাচারী, সেই রাক্ষসের রণ-অভিযানের সংবাদ জ্ঞাপন করছে নিযমিত—

আমাকে মার্জনা করবেন গুরুদেব—

স্তব্ধ হও যুবক, আরও শ্রবণ করো--আমাদের সেনানায়ক ভাগুরুযান বহ্লীক, পারস্য, সুগদ ইত্যাদি হিন্দুকুশের পরপারবর্ত্তী তাতার, যবন ও কিরাতদের দেশে পরিক্রমা করে বলশালী অযুত গান্ধর্বসেনা সংগ্রহ করছে। আর তুমি তো অবগত আছো, এই দণ্ডকবনের উপকণ্ঠের সহস্র আদিবাসী সৈন্য আমাদের অনুগামী হবে—

হ্যাঁ গুরুদেব, তাদের অনার্য নৃপতি পর্বতক ও তার পুত্র মলয়কেতুর সঙ্গে আমরা মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছি, ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে ভীত দৃষ্টিতে চাণক্যের গম্ভীর ও কঠোর মুখাবযবের দিকে নিরীক্ষণ করে বলল চন্দ্রগুপ্ত, মগধের সিংহাসনে আরোহনের পর পবতককে অর্দ্ধেক রাজত্ব দিতে হবে—এই প্রতিশ্রুতির কথাও আমার স্মরণ আছে—

স্তব্ধ হয়ে রইল চাণক্য।

শুধু তার কূটকুটিল মুখমণ্ডলে ধূর্ত একটা অভিসন্ধির হাসি পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

কিন্তু প্রভু, স্বৈরিণী সেই রমণী—

---

* বিট—বারাঙ্গনার সহায়তাকারী। কুঞ্চকী—রাজ-অন্তপুরের রক্ষক।

তোমার সন্নিকটেই সে—

কুটিলচূড়ামণির কথা সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন অরণ্যের শুষ্কপত্রের ওপর যেন কার পদশব্দ মড় মড করে বেজে উঠল। দক্ষিণবাহী উতলা সান্ধ্যপবনে কুটিরসংলগ্ন শাল্মলীতরুর শীর্ষদেশ মর্মরিত হয়ে উঠল। আর সেই বৃক্ষতলে যেন একটা অতিলৌকিক প্রেতচ্ছায়া নৃত্য করতে লাগল।

কয়েক দিবস পর।

একদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে গণ্ডকী নদীর শীতল জলে স্নান সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেই চন্দ্রগুপ্ত সবিস্ময়ে দেখল, গুরুদেবের কুটিরের দ্বার রুদ্ধ।

তাহলে প্রভু কী কোন গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করেছে, না, আসন্ন যুদ্ধের রণনীতি নিয়ে কোন অনুচরের সঙ্গে গূঢ় মন্ত্রণায় রত?

দুর্নিবার কৌতূহলের অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে কুটিরের গবাক্ষে দৃষ্টিপাত করতেই শিহরিত হয়ে উঠল তার চক্ষু দুইটি।

অসামান্যা রূপসী ষোড়শী কন্যা।

নীবার ধান্যমঞ্জরীর মত দীর্ঘ আর ক্ষীণ তনু। কঠিন স্তনী। নয়নদ্বয়ের কৃষ্ণতারকায় চঞ্চল দৃষ্টি। তার ঘন উদ্দাম কেশরাশি তরঙ্গায়িত হয়ে বিস্তৃত হয়েছে তার পুষ্ট নিতম্বপ্রদেশে। আর মুখলাবণ্য?

মৌর্যযুবরাজের মনে হল, চন্দ্রসংযুক্ত জ্যোৎস্না, কুসুমসুবাসিত পবন, পিকের কূজন, ভৃঙ্গশ্রেণীর গুঞ্জন ইত্যাদি বিশ্বসংসারের মনোহর দ্রব্য সামগ্রী সহযোগে বিধাতা যেন তাকে তিলে তিলে তিলোত্তমা করে রচিত করেছে। মধুভাণ্ডের কাছে ষটপদের মত দণ্ডায়মান হয়ে রইল চন্দ্রগুপ্ত। আর—

তার অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবৃত চেতনার ভিতরে ঘন কুয়াশাময় দূরান্তবর্তী দিগন্তের আবছায়া ছবির মত পরিস্ফুট হয়ে উঠল এক নবযৌবনবতীর অনিন্দ্য সুন্দর মুখাবয়ব! তার বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে, আগন্তুক এই রমণীর অপ্সরীর মত সুডৌল মুখমণ্ডলের সঙ্গে। তাহলে কি সুদূর অতীতে নিহত পিতৃদেব মহারাজ নন্দের রাজপ্রাসাদে খরযৌবনা রাজবয়স্যাদের রঙীন সমারোহের ভিতরে এই সুন্দরী ষোড়শীকে প্রত্যক্ষ করেছে? কিন্তু—এই গহন অরণ্যে গোপন অজ্ঞাতবাসে কেমন করে এল—কেন এল। তাহলে কি মনসিজের রহস্যময় এই শরীরিনীই সেই স্বৈরিণী?

অসহ্য উত্তেজনায়, দুর্বার কৌতূহলের অপরিসীম যন্ত্রণায় যুবরাজ তার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে সূচীতীক্ষ্ণ বেদনা অনুভব করতে লাগল—

কে ওখানে? ক্ষিপ্রপদে বাইরে এল চাণক্য। দ্রুত উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, ও কী। অর্বাচীনের মত গবাক্ষপথে দৃষ্টিপাত করে তুমি কি দেখছো?

কে এই রমণী গুরুদেব—

ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে যুবরাজের বিস্ময়বিহ্বল মুখাবয়বের দিকে নিরীক্ষণ করে কঠোরকণ্ঠে বলল, ওর পরিচয় জানতে চেও না, বলেই তার কাষ্ঠপাদুকায় খট্-খট্ শব্দ সৃষ্টি করে চলে যেতে যেতে হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ঘুরে দাঁড়িয়ে আদেশের সুরে বলল, এই ষোড়শী কন্যাটি কতিপয় দিবস কি মাসাধিক কাল আমার কুটিরে অবস্থান করবে। যতকাল থাকবে ততদিন তুমি আমার কক্ষে প্রবেশ করবে না! আর ওর সঙ্গে বাক্যালাপের প্রচেষ্টা তো দূরের কথা—ওর মুখদর্শন পর্যন্ত করবে না—

দিবসের পর দিবস, মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়। মগধের রাজধানী কুসুমপুরে যুদ্ধ হবে কি, দণ্ডকবনের নিভৃতে সেই তিনটি প্রাণীর মানসলোকেই বিচিত্র এক অদৃশ্য সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। শরতের শিশিরস্নাত স্থলপদ্মের শোভা খর্বকারী সেই উদ্ভিন্নযৌবনাকে সদা সতর্ক প্রহরায় বন্দিনী করে রাখে চাণক্য। কখনো কোথাও নিষ্ক্রমণ করলে দ্বারে স্বহস্তে ইন্দ্রকীলক আবদ্ধ করে যায়। রজনী সমাপনান্তে ব্রাহ্মমুহূর্তে, নির্জন দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যাসমাগমে ধূর্ত কুটিল ব্রাহ্মণ নিম্নকণ্ঠে সেই রমণীর সঙ্গে কিসের যেন গূঢ় মন্ত্রণা করে।

ঘনকৃষ্ণবর্ণ মেঘের অভ্যন্তরে শ্বেতশুভ্র বিদ্যুতের সর্পিল রেখা যেমন চকিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেই মিলিয়ে যায়, তেমনি আবছায়া অন্ধকারাচ্ছন্ন গবাক্ষপথে অনিন্দ্যসুন্দর সেই আগন্তুক রমণীর মুখচন্দ্রিমা মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে যায়। যুবরাজ উপলব্ধি করে, রূপরম্যা সেই নারী তার সঙ্গেই নিভৃতে বাক্যালাপ করার নিমিত্তে তার মতই তৃষিত হয়ে আছে। কিন্তু সক্ষম হয় না। হতে পারে না বজ্রকঠোর ওই ব্রাহ্মণের কঠোর শাসনে।

অসহ্য একটা যন্ত্রণার পীড়নে দাবদাহের মত নিঃশব্দে জ্বলিত হতে থাকে রূপাতিশালী যুবরাজ। কেন—কি হেতু তার সঙ্গে মুনিচিত্তচঞ্চলকারিণী ওই সুযৌবনার দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করে রেখেছে ধূর্ত কুটিল চূড়ামণি? কে, জানে বহুদর্শী ব্রাহ্মণের অন্তরের গোপনপ্রদেশে লালিত কোন অভিসন্ধি চরিতার্থের উপকরণ রূপে প্রয়োগ করবে এই রূপধন্যা নারীকে!

আরও বিস্ময়ের বিষয়, দিবালোকে যে দুই একবার কুটির প্রাঙ্গনে রূপযৌবন লাবণ্য মাধুরীর ওই প্রতীককে প্রত্যক্ষ করার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছে, তখুনি লক্ষ্য করেছে, তার সুন্দর দুটো নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূলতার নীচে দুটো নম্র আঁখিতে গভীর বিষণ্ণতার কালো ছায়া।

এক দিবস বিনিদ্র রজনী যাপনে ক্লান্ত, অবসন্ন যুবরাজ তার কুটির থেকে নিষ্ক্রমণ করে বাইরে এল।

কৃষ্ণা দ্বাদশীর চন্দ্রমা পাণ্ডুর হয়ে এসেছে। ম্লান জ্যোৎস্নালোকে চতুঃপার্শ্বের ঘন সবুজ বনদেহ মায়াময় হয়ে উঠেছে। হঠাৎ তার চোখদুটোর দৃষ্টি শিহরিত হয়ে উঠল।

এ কী! গুরুদেবের পর্ণকুটিরে এখনও বর্তিকা জ্বলছে। শ্রুতিগোচরও হলো চাণক্যের গম্ভীর কণ্ঠস্বর—

বলো, সক্ষম হবে তো পণ্যাঙ্গনা?

হ্যাঁ, পারবো—সক্ষম হবো গুরুদেব, বহু বহুদূরাগত মঞ্জীর ধ্বনির মত রূপোত্তমার সুধারসস্রাবিত কণ্ঠস্বরও শোনা যায়, তার নবারুণোপম সুন্দরপ্রভ মুখমণ্ডলের লাবণ্যমহিমা যে আমার অন্তরে অঙ্কিত হয়ে আছে গুরুদেব—

উত্তম—অতি উত্তম, শ্রবণ করো বৎসে, তীক্ষ্ণধার খড়্গকেও যেমন প্রস্তরখণ্ডে ঘর্ষণ করে আরও ক্ষুরধার করতে হয় তেমনি চতুঃষষ্ঠী কামকলার শিক্ষা দিয়ে তোমাকে—তোমাকে আমি কোষমুক্ত একটা তরবারির মত—তীব্র উত্তেজনায় গুরুদেবের বাকরুদ্ধ হয়ে যায়।

পশ্চিমাচলমুখী কৃষ্ণা দ্বাদশীর অস্তমান ম্লান চন্দ্রমার দিকে তাকিয়ে অস্থির-চিত্ত মৌর্যকুমারের মনে হয়, যৌবন রুচির এই চারুদেশ শোভাধারিণী যদি কামকলানিপুণা স্বৈরিণীই হয় তাহলে চতুঃষষ্ঠী কামলীলায় উদ্দীপ্ত করে কোন কামী পুরুষের কামানল ভস্মীভূত করতে চায় বৃদ্ধ। আর কোন সৌভাগ্য-বানের নবারুনোপম মুখাবয়ব ওই আয়তাক্ষীর অন্তরে অনির্বান নক্ষত্রের মত জ্বলছে?

কিছুই হৃদয়ঙ্গম হয় না তার। তার মনে হয়, বুদ্ধিবিবেক—বিবেচনা সর্বস্ব হারিয়ে সে যেন বধির, অন্ধ, রুদ্ধবাক এক জড় পাষাণ খণ্ডের মত অনন্তকাল ব্যাপী গভীর রহস্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন এক জগতে পরিক্রমা করছে!

পরদিবসেই নির্জন দ্বিপ্রহরের পরিণত আদিত্যের তীব্র উজ্জ্বল কিরণে সেই

নিবিড় সবুজ অরণ্যের যেন দিকে দিকে একটা সবুজ অগ্নিকাণ্ড নিঃশব্দে সংঘটিত হয়ে চলেছিল আর সেই অনমনীয় বজ্রসম কঠোর ও নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ স্নানের উদ্দেশ্যে দণ্ডকী নদীতে গমন করেছিল ঠিক তখন বাতায়ন পথে অতি সন্তর্পনে এসে দণ্ডায়মান হলো মদনবনিতাসমা রূপরম্যা সেই নারী ! কিন্তু কিসের যেন বেদনায় সে অবনতমুখী। অযত্ন চিকুরভার জটাভারের মত দেখায়।

চন্দ্রগুপ্তের মনে হলো, তার আয়ত নয়নের বেদনাবিনম্র দৃষ্টি যেন নিঃশব্দে বলছে, হে করঞ্জক কান্তিকুমার, তোমার প্রণয়দানে কৃতার্থ করো আমার যৌবন-বাসনা। ব্যাধতাড়িত বনহরিণীর মত ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে দূরে গণ্ডকী নদীঅভিমুখী বনপথের দিকে তাকিয়ে বলল, যুবরাজ, তুমি কি আমাকে স্মরণ করতে পারছো—

কে তুমি ? চমকিত চিত্তের বিপুল আগ্রহ নিয়ে ব্যাকুল প্রশ্ন করে চন্দ্রগুপ্ত।

যৌবনধন্যার রক্তপ্রবাল সদৃশ অধরে মৃদু হাসি স্ফুরিত হয়। বলে, তোমারই মত আমারও শৈশব অতিবাহিত হয়েছে মগধের রাজপুরীতে। কতদিন বাতায়নপথে দেখেছি, তোমার অশ্বারূঢ় বীরমূর্ত্তি। আবার—অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় সেই প্রগলভানারী। মৌর্যকুমারের বিহ্বল মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করে আবার বলে, মুরা নাম্নী অন্ত্যজ এক দাসীর গর্ভজাত বলে তোমার ওই দুটো চোখে বেদনার ছায়াভাসও প্রত্যক্ষ করেছি—

বাক্‌শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছে চন্দ্রগুপ্ত।

অন্তহীন সমুদ্রের অতল জলরাশির ভিতরে মুক্তা অন্বেষণের মত তার মনের গভীরে মগ্ন হয়ে বিগত কালের ধূসর স্মৃতির ভিতরে ব্যাকুল হয়ে খুঁজতে থাকে এই মুখচ্ছবি !

নাঃ কোথাও কখনো দেখেছে বলে স্মরণ হয় না। বিস্ময়ে, কৌতূহলে দগ্ধ হয়ে যন্ত্রণাবিকৃত কণ্ঠে যুবরাজ বলে, কে তুমি—কী তোমার পরিচয়—

আমি জঘনচপলা নাম্নী রাজবয়স্যার গর্ভে মহারাজ নন্দের মন্ত্রী শকটারের ঔরসজাত কন্যা—আর আমার পরিচয়—

কয়েকমুহূর্ত স্তব্ধ থেকে নতমুখী হয়ে বলে, আমি কুসুমপুরের নগরসুন্দরী মন্দার—

কী ! তুমি শত্রুর দেশের লাস্যজীবিনী নারী ? কী সর্বনাশা দুরভিসন্ধি নিয়ে এসেছো পণ্যাঙ্গনা ? তীব্র ক্রোধে যুবরাজের ভ্রূবল্লরী কম্পিত হতে থাকে। দ্রুত উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, গুরুদেব কি জ্ঞাত আছেন, তুমি শত্রুর দেশের বারবিলাসিনী ?

বারাঙ্গনার কজ্জলিত দুই চক্ষুতে স্মিত হাস্যের আভাস পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মৌর্যকুমারের তরুণ দেবদারুর মত যৌবনাঢ্য মূর্তির দিকে চাতকীর মত তৃষিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে নম্রকণ্ঠে বলে, হ্যাঁ যুবরাজ, বহুদর্শী তীক্ষ্ণধী সেই ব্রাহ্মণ হৃদয়ঙ্গম করেছেন, আমি তোমারই প্রণয়াকাঙ্খিনী এক সামান্যা নারী—ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে আবার বলে কুসুমপুরের নগরশোভনা, আর তোমার গুরুদেব, নারীপুরুষ পরস্পরের ভিতর সহজাত আকর্ষণ, স্নেহ-প্রেম-প্রণয়-কামনা বিষয়ে বিশারদ বাৎস্যায়ন। তাই বিনা আয়াসেই উপলব্ধিও করেছেন, তোমাদের শত্রুপরিবেষ্টিত দেশ থেকে সহস্র বিপদ তুচ্ছ করে আমি এসেছি এই অজ্ঞাতবাসে অরণ্যপরিকীর্ণ নিভৃত পরিবেশে তোমার কবোষ্ণ সান্নিধ্য পাবো বলে, বলতে বলতে তার নিরুদ্ধ আবেগই অশ্রুকণায় পরিবর্ত্তিত হয়ে তার লোধ্ররেণুরঞ্জিত গণ্ডদেশ প্লাবিত করে দেয়। তার মনের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রত্যন্ত প্রদেশে অতিকায় ঘাতকের হিংস্র মুখাবয়বের মত একটা বীভৎস ও ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডলের চিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধি চাণক্য-চন্দ্রগুপ্তের প্রতি ক্রোধান্ধ মহামাত্য রাক্ষস—

বিচলিত চিত্তে কি চিন্তা করছো শোভাঙ্গিনী ?

বৃশ্চিক দংশনের মত তীব্র জ্বালাময়ী চিন্তাপ্রবাহকে সংযত করে কুসুমপুরের বেশ্যাকুলের ভূষণস্বরূপা মন্দার বলল, রণবিশারদ কূটনীতিপ্রবর ব্রাহ্মণ আমার ভিতরে নিপুণা দূতীর লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছেন ! দৌত্যকার্যে আমাকে কুসুমপুরে প্রেরণ করবেন বলেই চতুঃষষ্ঠী কামকলা বিদ্যায় পারদর্শিনী করে তুলছেন ! বলতে বলতে অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় সেই সুযৌবনা বারাঙ্গনা। আর তার বেদনাভিষিক্ত দুটো আয়তনয়নের দৃষ্টি যেন কোন সুখস্মৃতির আবেশে মুগ্ধ হয়ে ওঠে। ক্ষীণ সুমিষ্টস্বরে বলে, জানো তোমার প্রতি প্রণয়রসে উতলা হয়ে অসামান্য দুঃখবরণ করে এখানে এসেছি জেনে গুরুদেব উল্লসিত হয়ে আমাকে আশীর্বাদান্তে বলেছিলেন, বৎসে প্রকৃতই যদি মৌর্যকুমারের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে থাকো তাহলে তোমার প্রেমাস্পদের মগধের সিংহাসনে আরোহণের পথকে নিষ্কণ্টক করতে সহায় হও—দুরাচার নরাধম ওই রাক্ষস ও তার অনুচর গজাধ্যক্ষ্য চন্দ্রভানু এবং গন্ধর্বাধ্যক্ষ্য মেঘনাদকে বিনাশ করতে সচেষ্ট হও—

ছন্দোসুরভিত কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

কু-উ—কু-উ দ্বিপ্রহরের উদাস বাতাসে আন্দোলিত শাল্মলী বীথি থেকে

কোন বিরহিনী পিকবধুর আকুল কূজন শ্রুতিগোচর হয়। বাতায়নপথে দণ্ডায়মান রঙীন মরীচিকার মূর্তির মত পরমরূপযৌবনবতী পনাঙ্গনার দিকে পিপাসাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিপুল এক হর্ষে পুলকিত হয়ে ওঠে মৌর্যকুমারের মন। পৃথিবীর কোন এক নারী যেন দূরান্তের এক নিভৃত হতে তার যৌবনধন্য জীবনের সকল বাসনাকে একমাত্র তাকে লক্ষ্য করেই কেন্দ্রীভূত করেছে।

তোমাকে কি অন্তরালবর্তিনী করেই রেখে দেবেন গুরুদেব? আকুলিত কণ্ঠে বলে চন্দ্রগুপ্ত, জ্যোৎস্নার রেখার মত তোমার ওই বরতনুটিকে আমি কি নিবিড় বাহুবেষ্টনে—

অধীর হবেন না যুবরাজ, বর্ষার কদম্বপুষ্পের মত রোমাঞ্চিত হয়ে বারাঙ্গনা বলে, আসন্ন শরত সমাগমে কৌমুদী মহোৎসবের প্রারম্ভে কুসুমপুর যাত্রার পূর্বে তোমার কুটিরে একটি রজনীযাপন করতে দেবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন গুরুদেব—কয়েকটি মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে আবার বলে, আমি সেই রজনীতে তোমার উদগ্র যৌবন নিদাঘ তাপে মেরু মরালীর মত দগ্ধ হয়ে যাবো কুমার—

শরতের তো বহু বিলম্ব আছে বারবিলাসিনী, আমি যে তার—বলেই তার অসিকঠি বাহুদুটো দিয়ে লোলুপউল্লাসে যেন সেই শোভাঙ্গিনীর মৃণাল বাহু যুগলকে বেষ্টন করতে উদ্যত হলো অমনি কেন যেন ত্রাসবিকৃত কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল মন্দার—আমাকে স্পর্শ করো না—স্পর্শ করো না কুমার—কুটিরাভ্যন্তরের তরল অন্ধকারে অন্তর্হিত হয়ে গেল। আর তার রুদ্ধদুয়ার সেই পর্ণকুটিরের ভিতর থেকে তীব্র ক্রন্দনে অস্পষ্ট কণ্ঠ শ্রুতিগোচর হলো, আমার রক্তে অভিশাপ আছে—নিদারুণ অভিশাপ আছে প্রিয়তম—

সেই সুবিস্তীর্ণ অরণ্যের ঘনসন্নিবদ্ধ শাল্মলী দেবদারু, অর্জুনবৃক্ষের পত্রমর্মরে বেদনা করুণ রাগিনীর মত ঝঙ্কৃত হতে লাগল তার সেই সকরুণ আর্তনাদ।

সে কী! তুমি কুটির প্রাঙ্গনে উদ্‌ভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে আছো কেন? চাণক্যের তীক্ষ্ণ চোখে আবিল সন্দেহের ছায়া ঘনীভূত হয়। আবার কঠোর কণ্ঠে বলে, তুমি ওর সঙ্গে বাক্যালাপের প্রচেষ্টা করেছিলে না কি, প্রবল বাতাসে কম্পিত তরুশাখার মত সেই বৃদ্ধ তীব্র উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, শ্রবণ করো যুবক কুসুমপুরের গণিকাকুল ধন্যা এই লাস্যজীবিনী দুর্লক্ষণযুক্ত এক নারী। আমি স্বয়ং ওর আয়ত নয়নে, মুখমণ্ডলে সর্বনাশের ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করেছি—

রহস্যময়ী সেই যৌবনবতীর ভেতরে কোন সর্বনাশের ইঙ্গিত দেখেছিল।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলল তার বিচিত্র ইতিবৃত্ত।

কুসুমপুরের বেশ্যাকুলের ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠা রূপবতী এই বারাঙ্গনা মন্দারের সঙ্গে যেদিন মহাজ্ঞানী চাণক্যের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেইদিনই বিচিত্র এক ঘটনার মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে পরম রূপযৌবনবতী এই নারী দুর্লক্ষণযুক্তা।

ঘনতরুশ্রেণী সমাচ্ছন্ন অরণ্যের ভিতর দিয়ে দ্রুতপদে তাদের পরম মিত্র অনার্য নৃপতি পর্বতকের শিবিরাভিমুখে গমন করছিলেন এমন সময় তার কর্ণগোচর হলো হৃদয়বিদারক এক আর্তনাদ! সেই তীক্ষ্ণ আর্তস্বর অনুসরণ করে অগ্রসর হতেই এমন এক রোমাঞ্চকর ও ভয়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন যে, শিহরিত হয়ে উঠল তার রক্তপ্রবাহ!

অদূরের শবরপল্লীর এক বলিষ্ঠ যুবক ময়াল সর্পের মত নিবিড় বাহুবেষ্টনে জড়িয়ে ধরেছে মন্দারের সজীব পুষ্পলতিকার মত তনুদেহটিকে। শবর তরুণটির নয়নে আদিম রক্ততরঙ্গের ভাষা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। যুবকের উন্মত্ত কামনালোলুপ দুইটি হস্তের স্পর্শে তরুণীর কঠিন কুচুলিকা আবেগে কোমল হয়ে গিয়েছে। লালসা উন্মত্ত সেই আদিবাসী তরুণটি যেন তার মুখচুম্বন করল। অমনি—

অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ চাণক্য।

তারপর—তারপর কি হলো গুরুদেব?

কৌতূহল নিবৃত্তি করো বৎস। শুধু স্মরণ রেখো, তোমার সম্মুখে এখন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত বিপদসঙ্কুল ভবিষ্যত! ছলে বলে কৌশলে পরাস্ত করতে হবে নরাধম রাক্ষসকে। অধিকার করতে হবে মগধের সিংহাসনকে। এই দুঃসময়ে মন্দারের মত মদামোদমধুরা নারী ঈশ্বরপ্রেরিতা যুবরাজ—

—ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে মনের ভিতরে মগ্ন হয়ে অস্ফুটকণ্ঠে স্বগতোক্তি করে বলল; রমণীকুল যতই ছলনানিপুণা হোক, আন্তরিক প্রেমের অভিব্যক্তি তারা গোপন করতে পারে না। তোমার প্রতি ওর আসক্তিই হবে আমাদের মস্ত সহায়! কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে উদীপ্তকণ্ঠে বলল, চতুঃষষ্ঠী কামকলার পাঠ দিয়ে তীক্ষ্ণধার শানিত একটা খড়্গের মত করে প্রেরণ করবো ওই কুসুমপুরেই—

আরণ্যক রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত হয়। চাণক্যের পর্ণকুটিরে বন্য রেড়ীর তৈলের মৃতপ্রদীপ জ্বলে। শ্রবণ করো বৎসে, বৃত্তিমনোরথানাম্ আখ্যানাং

গুহ্যানং বৈকৃতপ্রচ্ছাদনং শয়নে পরাবৃত্তস্য—মহাজ্ঞানী কামকলা বিশারদ বাৎসায়ন মন্দারকে বলে, তোমার নায়কের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্খা গোপনে ব্যক্ত করবে—আর ?

অনুক্ষেপনম্ অনুলোমং গুহ্যস্পর্শনে স্বপ্তস্য চুম্বনম্ আলিঙ্গনঞ্চ*—কিন্তু মিলনের প্রারম্ভে তোমার স্ত্রী গোপন অঙ্গের বিকৃতি আবৃত রাখবে। শয়নকালে নায়কের দিকে মুখ করে শয়ন করবে। অনন্তর নায়কের মনে মিলনের বাঞ্ছাকে উদীপ্ত করার জন্য কামানলের উৎস তোমার গোপনাঙ্গকে অবারিত করে স্পর্শ করাবে—

ছিঃ ছিঃ এসব কিসের পাঠ দিচ্ছেন ঠাকুরমশাই, বাতায়ণপথে দণ্ডায়মান হয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল অনার্যনৃপতি পর্বতক—

এসো, পর্বতক—স্মিত হাস্যে চাণক্য উচ্ছ্বাসিত অভ্যর্থনা জানালো।

পর্বতক কুটিরে প্রবেশ করেই স্তব্ধ হয়ে গেল। এই গহন দণ্ডকবনে কোথায় থেকে এল এই যুবতী! তার মনে হল, স্থলকমালিনীর সৌন্দর্যকেও পরাস্ত করতে পারে এই রমনীর অপরিসীম রূপরাশি। এই দণ্ডকবনের প্রান্তে তমালবীথিতে যেমন ইতস্তত তমাল পড়ে থাকে তেমনি তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখাবয়বে শোভা পাচ্ছে তিলকরঞ্জিত তমালপত্র। কজ্জলায়িত দুটো আয়ত চোখ। ক্ষীন কটি। গুরুনিতম্ব। ভোগীদের ভোগনিকেতনস্বরূপ বিশাল কুচযুগল—পর্বতকের মনের ভিতরে ভেসে উঠল তাদের স্বজাতীয় তরুণীদের কালো পাথর কেটে কুঁদে কুঁদে গড়া সেই পাথুরে মূর্তিগুলো। তাদের সর্বাঙ্গে কী রূঢ় পরিপুষ্টি। ঠিক যেন ঘনকৃষ্ণবর্ণ এক একটা হিংস্র বাঘিনী। হঠাৎ দেখলে ভয়ের শিহরণ সঞ্চারিত হযে যায় দেহে—

কি হে পর্বতক, চাণক্য তার মুগ্ধ আর অভিভূত আচ্ছন্নতা লক্ষ্য করে হেসে বলল, সমুদ্রমন্থনের সময় মন্থনরজ্জু শেষনাগ নেত্র দিয়ে যেমন মন্দার পর্বত আবদ্ধ হয়েছিল তুমি কি তেমনি সংসক্ত হয়ে গেলে নাকি আমাদের মন্দারে—

পর্বতকের যেন বাক্‌শক্তি লুপ্ত হযে গিয়েছে। অমরাবতীর সেই অপ্সরীর মত মন্দারের দিকে তার মুগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই অস্ফুট স্বরে বলল, কে এই রমণী গুরুদেব—

তুমি ওর পরিচয় জানতে চেয়ো না পর্বতক। তুমি বলো, রাক্ষসের সঙ্গে আমাদের আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি কতদূর অগ্রসর হয়েছে—

* কামসূত্র : বাৎসায়ন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু অনুবাদিত ১৫২-৫৩ পৃঃ

মন্দার, তুমি এইবার ক্ষণকালের জন্য বাইরে যাও—

প্রদীপের স্বল্প আলোয় তরল ছায়াচ্ছন্ন সেই কুটিরে একরাশ সৌরভ ছড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল মন্দার। পর্বতকের মনে হলো, একটা উগ্র আর ভাস্বর বিদ্যুতলেখা যেন গভীর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ভেতরে মিলিয়ে গেল।

পর্বতক নিজেকে সযত্নে সংযত করে বলল গুরুদেব আমার আদিবাসী সৈন্যেরা যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তারা অধীর হয়ে উঠেছে কবে—কখন আপনি রণঅভিযানের আদেশ দেবেন—

তোমাদের অন্ত্যজরক্তে যুদ্ধোন্মাদনা খুব স্বাভাবিক পর্বতক। কুটিলপতি কৌটিল্য বলল, কিন্তু তুমি তো জানো তোমরা ব্যতীত আমার আর কোন সহায় নেই। রাক্ষসের আছে বিপুল সেনাদল তাই—হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল ব্রাহ্মণ। কঠোর একটা সঙ্কল্পের আভাস ঘনীভূত হয়ে উঠল তার ধারালো ছুটো চোখেঁ। বলল, আমার কূটনীতি দিয়েই তাকে পরাস্ত করতে হবে—

আপনি তো দীর্ঘকাল থেকে এই একটি কথারই পুনরাবৃত্তি করছেন, দাবানলের মত ক্রোধী স্বভাবের সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে হলে যে সংযমের আবশ্যক তা বিস্মৃত হয়ে আদিবাসী নৃপতি বলে ফেলল, আপনার কূটনীতির জাল বিস্তার আর কতকাল—

কেন পর্বতক, তুমি কি আমার প্রতিশ্রুতি মত অর্ধেক রাজত্বের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছো, ভিতরে ভিতরে তার কোপানল জলছে দাউ দাউ করে। তবুও নিজেকে সংযত করে নিপুণ অভিনেতার মত হেসে বলল, তুমি বোধ হয় জ্ঞাত আছো আমার সহাধ্যায়ী ইন্দুশর্মাকে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে কুসুমপুরে পাঠিয়েছি। সে যে খবরাখবর সরবরাহ করেছে তা শুনেছো—

আদিবাসী নৃপতি কথা বলল না। শুধু মাথা নাড়ল। আর গবাক্ষের বাইরে ঘন অন্ধকারে সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল মনসিজের শরীরিণী সেই বিলাসবতীকে যদি একবার দেখা যায়।

শোন পর্বতক, কুলত দেশের রাজা চিত্রবর্মা, মলয়দেশের রাজা সিংহের মত বীর সিংহনাদ, কাশ্মীরের পুষ্করাক্ষ, সিন্ধু দেশের রাজা শত্রুর দর্পহারী সিন্ধুসেন আর পারসিক নৃপতি যিনি বহু গন্ধর্ব অর্থাৎ সুবিপুল অশ্বারোহী সৈন্যের অধিকারী রাক্ষসের পক্ষে যোগ দিয়েছে—

তাই নাকি! এবারে অনার্যরাজের চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া ঘনীভূত হল। স্তিমিতকণ্ঠে বলল, তাহলে এখন আমাদের কর্তব্য—প্রচণ্ড অট্টহাসিতে ভেঙে

পড়ল চাণক্য। হাসতে হাসতেই বলল, তবে যে রণঅভিযানের জন্য উতলা হয়েছিলে পর্বতক। ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে আবার বলল, শোনো, প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানের পূর্বাহ্নে রণনীতি ঠিক করতে হয় সুস্থ মস্তিষ্কে।

আপনি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

আমি আসন্ন শরৎ সমাগমের জন্য প্রতীক্ষা করছি—

শরৎকালের সঙ্গে যুদ্ধের কি যোগ ?

আহা! পর্বতক তুমি নেহাতই ব্রাত্য—শোন—ধ্যানসহকারে শোন, শরতের আগমনে কুসুমপুরের বেশ্যাসক্ত বিলাসী অধিবাসীরা কৌমুদী মহোৎসবে মত্ত হয়ে উঠবে। আর যেহেতু সর্বার্থসিদ্ধি এবং রাক্ষসদের পক্ষে বিভিন্ন দেশের শক্তিশালী নৃপতিরা যোগদান করেছে আর রাজধানী কুসুমপুর তরুসমাচ্ছন্ন বনপংক্তির মতই প্রাকারবেষ্টিত সুরক্ষিত। তাই উৎসবের সমারোহ আরও দশগুণ বর্ধিত হবে—

কৌমুদীমহোৎসব তো শুনেছি বাররামা (বারনারী)দেরই উৎসব। তাই তার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধের—

পর্বতক, তুমি নিতান্তই স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন অনার্য। অর্দ্ধ রাজত্ব নিয়েই বা তুমি কি করে তার প্রতিরক্ষা করবে—

পর্বতকের সরল চোখে সঙ্কোচের ছায়া পড়ে। হীনমন্যতার একটা গ্লানির অপচ্ছায়ায় তার মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বলে, দেখুন আমি আদিবাসী—আপনাদের সভ্য সমাজের ওসব উৎসবের ভিতরে কোথায় কোন ন্যক্কারজনক কাণ্ডকারখানা চলে তা—

ও, আবার অভিমানও আছে দেখছি। উত্তম, অভিমান উচ্চাকাঙ্খীর অলঙ্কার স্বরূপ। এখন শোনো আমার পরিকল্পনা।—তুমি জানো, দীর্ঘ একমাস ব্যাপী এই কৌমুদীমহোৎসব উপলক্ষে কুসুমপুরে আনন্দের উত্তাল স্রোত প্রবাহিত হয়ে যায়। সে সময় স্বভাবতই সতর্ক প্রহরারত রক্ষী থেকে শুরু করে তাদের নৃপতি সর্বার্থসিদ্ধি এবং দুরাচার রাক্ষস পর্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়ে ওঠে। কর্তব্যে আসে শিথিলতা—

কি রকম ? বুঝতে পারছি না। একটু বিশদ ব্যাখ্যা করে বলুন—

আমি কখনো প্রত্যক্ষ করি নি, তবে আমি যখন দুরাচারী মহারাজ নন্দ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে উত্তরভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশে পরিক্রমা করছিলাম তখুনি আমার কর্ণগোচর হয়েছিল, কৌমুদীমহোৎসবের এক মাস কুসুমপুরের

রাজানুশাসনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। উৎসবের সমারোহ ও আনন্দ দুর্নীতি এবং উশৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হয়। বিলাসবতী বারাঙ্গনারা তাদের নির্দ্ধারিত 'ভাটি' অর্থাৎ পণ গ্রহণ করে না। তাদের দ্বার অবারিত থাকে শশ, বৃষ ও অশ্ব যে কোন জাতীয় পুরুষের কাছে। রাজপথের সংযোগ স্থলগুলিতে মদিরাগৃহ স্থাপিত হয়। তরুণযুবারা তাদের কামনাকে অগ্নির মত প্রজ্জ্বলিত করার জন্যেই আকণ্ঠ সেই সুবাসিত উত্তেজক আসব পাণ করে—বলতে বলতে তীব্র ঘৃণায় কুৎসিত দর্শন সেই ব্রাহ্মণের মুখাবয়ব কুঞ্চিত হয়ে আরও কুৎসিত হয়ে ওঠে। আবার ঘৃণাবিকৃত কণ্ঠে বলে, অনন্তর সেই মত্তপ, নেশাচ্ছন্ন ও কামী যুবকরা কোথায় যায় জানো?

বেশ্যালয়ে—

না। অনন্তর তারা যায় কুসুমপুরের সেই সুপ্রাচীন ন্যগ্রোধ বৃক্ষতলে। সেখানে চিত্রবিচিত্র চন্দ্রাতপের নীচে গণিকাদের প্রধান সহায় বিটদের (যারা নাগর জুটিয়ে আনে) সঙ্গীতের আসর বসে—

তারা আবার কিসের গান গায়?

স্তব্ধ হয়ে রইল চাণক্য। শুধু দুর্গন্ধযুক্ত একতাল কাদার মত তীব্র একটা ধিক্কার ঘণীভূত হয়ে উঠল। বলল, তোমাকে আর কি বলবো পর্বতক, কিসের গান জানো, কুসুমপুরের যুবাপুরুষদের বেশ্যাবিদ্যায় পারদর্শী করার নিমিত্ত তারা সুরতক্রিয়ার বিভিন্ন প্রণালীকে ভিত্তি করে এক অশ্রাব্য গান গায়—

বলেন কি, তাহলে তো এই সময় একবার—

তার কথা যেন শুনতেই পেল না রাক্ষসের প্রতি ক্রোধান্ধ চাণক্য। কঠোর স্বরে বলল, আর স্বয়ং রাক্ষসরাজ কি করে জানো, ইন্দ্রিয়াসক্ত সেই নরাধম না কি বারবিলাসিনী রাজবয়স্যা পরিবৃত্ত হয়ে এমন কুৎসিত রসালপে মত্ত হয়ে ওঠে যে তার বর্ষীয়ান আমাত্যরা পর্যন্ত লজ্জা পায়—

আপনি বোধ করি রাক্ষসের ওপর প্রতিহিংসাপরায়ণ বলেই একটু অতিরঞ্জিত—

স্তব্ধ হও অনার্য সন্তান, তুমি মহামুর্খ বলেই তোমার এই দুঃসাহস খুব স্বাভাবিক, চাণক্যের চোখদুটো অগ্নিশলাকার মত দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। চোয়ালদুটোকে দৃঢ় করে বলল, শোনো পর্বতক, নীতিশাস্ত্রপ্রনেতা কৌটিল্য কখনও মিথ্যা কথা বলতে পারে না। এতক্ষণ কৌমুদীমহোৎসব উপলক্ষে উদ্বেলিত কুসুমপুরের যে বর্ণনা দিলাম তার কিছু জেনেছি ইন্দুশর্মার

মারফৎ আর কিছু জ্ঞাত হয়েছি আমাদের আর এক গুপ্তচর রোহিতাক্ষের কাছ থেকে—কিন্তু বলো তো, এই দীর্ঘ কালব্যয় করে তোমাকে এই উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ কেন দিলাম ?

পর্বতকের চোখে দিশেহারা দৃষ্টি ফুটে উঠল।

একটা কথা বলতে পারল না। শুধু ম্লান অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই কুটিরের এক কোণে বন্য রেড়ীর তেলের প্রদীপটির সলতে পুড়ে তার বুক জ্বলে যেতে লাগল নিঃশব্দে। ঠিক এমনি করেই অনার্যরাজের মনের কন্দরে উদগ্র রতি লালসার আগুন জ্বলছে। কোথায়—কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল স্তনভারলসা, গুরু-নিতম্বিনী সেই বিলাসবতী যার দেহকান্তি শরদিন্দু জ্যোৎস্নার শোভাকেও ম্লান করে দেয়। তাকে এই কুটিলমতি ব্রাহ্মণ কামকলায় উদ্দীপ্ত করছে কোন সৌভাগ্যবানের মদনজ্বর প্রশমিত করার জন্য—

অধোমুখে কি ভাবছো বৎস, শোনো, কৌমুদীমহোৎসবের কালে কুসুমপুরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় যখন শিথিলতা দেখা দেবে আমরা তখুনি রণঅভিযান করবো—

উত্তম পরিকল্পনা, প্রশান্ত হয়ে বলল অনার্যরাজ, কিন্তু আপনারা যখন বহু কৃচ্ছ্রসাধন করে অজ্ঞাত বাসে থেকে শত্রুদমনের চিন্তায় আকুল হয়ে আছেন তখন ওই রূপসী যুবতীকে কামকলার পাঠ দিয়ে কালব্যয় করছেন কেন—

হা—হা—হা—চাণক্যের অট্টহাসির বিকট শব্দে কুটির সংলগ্ন শালবৃক্ষ থেকে একটা রাত্রিচর পক্ষী ভীত হয়ে ডানা ছটফট করে উড়ে গেল। হাসি প্রশমিত করে কামকলাবিশারদ অংশুল* তার সুপুষ্ট শিখাটিকে দৃঢ় মুষ্টিতে পাক দিতে দিতে বলল, ক্ষণকাল পূর্বে তোমাকে কুসুমপুরের বেশ্যাশক্তির কথা বললাম না ? ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে বলল, শ্রবণ করো বৎস, দুরাচারী রাক্ষসের গজাধ্যক্ষ চন্দ্রভানু অশ্বাধ্যক্ষ মেঘনাদ ইত্যাদি সুগাত্রী রূপজীবিনীদের সঙ্গে প্রমত্ত নিশিযাপনের জন্য তাদের সীমান্ত শিবির থেকে রাজধানীতে আসবে। সেই সময়—হা—হা—হা—অট্টহাসির রেশ প্রশমিত করে আবার বলল, আমি কণ্টক দিয়ে কণ্টক অপসারিত করব বৎস। তুমি শুধু প্রতীক্ষা করো—

সে কী ! এই অসামান্য রূপসী রমণী তাহলে বহুভোগ্যা বাররামা, সুতীব্র কামাবেগে কম্পিত হয়ে চাণক্যের পা দুটো জড়িয়ে ধরে বদ্ধ উন্মাদের মত বলল

---

*চাণক্যের আর এক নাম।

পর্বতক, তাহলে আমার শিবিরে ওকে একটি—একটিমাত্র রজনীযাপনের জন্য অনুমতি করুণ ব্রাহ্মণ। আমি—আমি অর্দ্ধ রাজত্ব চাই না, ঐশ্বর্য বৈভব কিছুই চাই না—শুধু—

শান্ত হও—শান্ত হও দয়িতিক, ভুমি থেকে সেই কামোন্মত্ত অনার্যনৃপতিকে পরমস্নেহে তুলে নিয়ে নিবিড় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করে বলল, শোন বৎস, আগে কৃচ্ছ্রসাধন, আগে ব্রত উদযাপন তারপরে উপভোগ—এই হলো শাস্ত্রের নিয়ম। তুমি অর্ধেক রাজত্ব যেমন পাবে তেমনি যথাসময়ে মন্দার তোমার অঙ্কশায়িনীও হবে—

হবে—! কবে—কবে? বেগবতী নির্ঝরিণীর মত তার উচ্ছ্বাস উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পর্বতকের নেশাচ্ছন্ন রক্তিম চোখদুটো কেমন স্বপ্নাচ্ছন্ন ও মেদুর হয়ে ওঠে। আর চাণক্য গবাক্ষের মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে চন্দ্রগুপ্তের কুটিরের ভেতরের জ্বলন্ত প্রদীপশিখার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল, শোনো মিত্র, আমার দয়িতিকা কি বলছে জানো?

কে আপনার দয়িতিকা?

আমার বিবেক। যাবতীয় জটিল সমস্যাসঙ্কুল বিষয়ে সে আমাকে পূর্বাহ্নে নির্ভুল নির্দেশ দেয়। সে বলছে, আসন্ন শরতের প্রথম পূর্ণিমা রজনীতে যেদিন কুসুমপুরে কৌমুদীমহোৎসব শুরু হবে আমরা সেইদিন রণঅভিযান করবো। ঠিক যুদ্ধযাত্রার প্রারম্ভেই তোমার অভীলিপ্সা পূর্ণ হবে। অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল চাণক্য। কয়েকমুহূর্ত কি ভেবে বলল, চন্দ্রগুপ্ত তোমার সুযোগ্য পুত্র রণনিপুণ মলয়কেতুকে নিয়ে প্রথমে যাত্রা করবে। তুমি—

আমি—আমি যাবো না?

কোন কথা বলল না চাণক্য। প্রায় নির্বাপিত প্রদীপের স্তিমিত আলোয় পর্বতক দেখতে পেল না, ধূর্ত একটা অভিসন্ধির কুটিল হাসি ফুটে উঠল কৌটিল্যের মুখে। আমি তাহলে মন্দারের সঙ্গে নিশিযাপন করে পরদিন প্রভাতে যুদ্ধযাত্রা করবো?—

হ্যাঁ। আমার বিবেক তাই বলে—

তীব্র আনন্দে বাতাসে কম্পিত বেতসপত্রের মত প্রস্থান করল অনার্যরাজ পর্বতক। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন কুটিরপ্রাঙ্গনে নেমে ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। যদি আর একবার—একবার চন্দ্রহীন জ্যোৎস্নার মত কুসুম-কোমলা সেই কামিনীকে দেখা যায়।

না। কোথাও কেউ নেই। শুধু চারিদিকে কৃষ্ণারাত্রির স্রোত আবর্তিত হয়ে চলেছে —

কুসুমপুর।

আসমুদ্র হিমাচল ভারত ভূখণ্ডের সেই ভূষণস্বরূপা ঐশ্বর্য এবং সৌন্দর্য-শালিনী মগধের রাজধানী কুসুমপুর। অমরাবতীর মত সুদৃশ্য সেই মহানগরীর দিকে দিকে কৌমুদীমহোৎসবের প্রস্তুতি চলেছে।

বিপুলব্যপ্ত আকাশ জুড়ে ঘনকৃষ্ণবর্ণ মেঘে মেঘে বর্ষার অভিসারের কাল শেষ হয়েছে। বায়ুভরে আন্দোলিত কাশফুলের শুভ্রতায়, উদার, অনন্ত আকাশের নীলিমায় শরত সমাগমের শুভবার্তা দিকে দিকে ঘোষিত হয়ে গেল। কুসুমপুরের বিলাসী নাগরিকদের বুকের রক্তে উল্লাসের কলধ্বনি বাজতে লাগল।

মহানগরীর অত্যুচ্চ দেবায়তনগুলোর শিখরে শিখরে বাতাসে উড্ডীয়মান নানা বর্ণের পতাকায় বিশাল আকাশ মঞ্জরিত উদ্যানের শোভা ধারন করল। রাজপথের দুই পাশে সুদৃশ্য প্রাসাদের স্তম্ভগুলো গন্ধধূপের সুবাসিত ধূমে সুরভিত করা হলো। দৌরাধক্ষ্যের নির্দেশে নিপুণ কারুশিল্পীরা রাজপথের সংযোগ স্থলগুলোতে আম্রপল্লবের বলয় ও বিভিন্ন বর্ণের পুষ্পমাল্য দিয়ে এক একটা সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করল। রাষ্ট্রায়ত্ত মদিরা গৃহগুলোতে বিপুল পরিমানে সুগন্ধী উত্তেজক আসরের প্রস্তুতির কাজ চলতে লাগল অহর্নিশি। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নৃত্যোপদেশকের সুনিপুণ পরিচালন নৃত্যগীত পটিয়সী বিলাসবতী বারাঙ্গনাদের গৃহে গৃহে কোহল ও ভরতাদি কথিত ক্রিয়ার নৃত্য এবং সিঙ্গট গানের নিয়মিত অনুশীলন শুরু হলো। তাদের চরণযুগলের নূপুর-নিক্কনের ধ্বনিতে আর সিঙ্গট গান অর্থাৎ একপ্রকার গেয়কাব্যের সমধুর সুরে কুসুমপুরের বায়ুমণ্ডল এমন মুখরিত হয়ে উঠল যে অদূরবর্তী বিদ্যায়তনগুলো অধ্যয়নরত ছাত্রদের পাঠস্খলন আচার্যদের কর্ণগোচর হলো না।

ওদিকে আসন্ন কৌমুদীমহোৎসব উপলক্ষে রাজপ্রাসাদাধ্যক্ষের নির্দেশে রাজ-পুরীতেও দিকে দিকে বিচিত্র সজ্জার সমারোহে জেগে উঠল বিচিত্র কর্মচাঞ্চল্য। নগরের কেন্দ্রস্থলে প্রায় পাদক্রোশ ভূমির ওপরে সুউচ্চ পাষান প্রাচীর বেষ্টিত মগধেশ্বরের সেই সুপ্রাচীনকালের রাজপুরীর ভেতরে মহলের পর মহল। কারুকার্যশোভিত প্রাসাদের পর প্রাসাদ। কোনটি মন্ত্রণাগৃহ, কোনটি দেবগৃহ,

কোনটি অলঙ্কারগৃহ, আবার কোনটি ক্রোধাগার (রাজঅন্তঃপুরের রমণীদের ক্রোধের উদ্রেক হলে যেখানে অবস্থান করতো) রাজপ্রাসাদাক্ষ্যের সুনিপুণ পরিকল্পনায় আলোকশিল্পীরা প্রতিটি প্রাসাদের অলিন্দে, কার্নিশে নিপুণ বিন্যাসে এমন আলোকবর্তিক প্রজ্জ্বলিত করল যে, সেই বিচিত্র আলোকসজ্জা কৃষ্ণপক্ষের রজনীর উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত আকাশের সৌন্দর্যও ম্লান হয়ে গেল।

প্রাসাদপুরীর অভ্যন্তরে জনাকীর্ণ মন্ত্রণাগৃহ। সচিব, সভাসদ, শ্রেষ্ঠী, বয়স্য, বিদূষক বেষ্টিত হয়ে রত্নসিংহাসনে সমাসীন হয়ে আছে নিহত মহারাজ নন্দের ভ্রাতা সর্বার্থসিদ্ধি। তার অদূরে গজদন্ত নির্মিত আর একটি আসনে বসে আছে মহামাত্য রাক্ষস। আকণ্ঠ সুরাপানে আরক্ত ও নিমীলিত দুটো চোখ বহু আয়াসে মেলে ধরে সর্বার্থসিদ্ধি বলল, প্রধান সেনাধ্যক্ষ করভক, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞাপন করো, ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দূরে অত্যুজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত কুসুমপুরের আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করে বলল, দুরাচারী সেই শয়তান ব্রাহ্মণ চাণক্যের আক্রমণ সম্ভাবনা যদি বিন্দুমাত্র থাকে—তাহলে বন্ধ করে দেব এই মহোৎসব—

মহারাজ, মগধের উত্তর সীমায় গণ্ডকী নদীর তীরে নীলমেঘের মত অযুত রণহস্তী নিয়ে সতর্ক প্রহরায় আছে গজাধ্যক্ষ চন্দ্রভানু, পশ্চিমে ভোজ দেশের সমীপবর্তী জনপদ, ফুল্লরা, চারল প্রভৃতি পল্লীতে পল্লীতে টহল দিচ্ছে আমাদের পদাতিকবাহিনীর সশস্ত্র সীমান্ত রক্ষীরা—

করভককে বাধা প্রদান করে সুরারুণ নেত্রে মহারাজের দিকে তাকিয়ে উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠল রাক্ষস, মহারাজ, সেই নরপিশাচ ব্রাহ্মণটার কোন অনুচর কুসুমপুরের ত্রিসীমানায় আসতে পারবে না—আপনি নিশ্চিন্তে মহাসমারোহে নাগরিকদের কৌমুদীমহোৎসব পালনের আদেশ দিন—

উত্তম!—সাধু-সাধু—স্ফটিক নির্মিত পাত্র থেকে সুগন্ধী আসব পান করে সর্বার্থসিদ্ধি বলল, পৌরপাল, তুমি পুরোবাসীদের নিরুদ্বেগ চিত্তে উৎসবের সমারোহে মত্ত হতে আদেশ দাও—

সঙ্গে সঙ্গে কুসুমপুরের দশদ্বারের প্রহরীরা দুন্দুভি বাজিয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করল, কৌমুদীমহোৎসব যথাসময়ে আরম্ভ হবে—শত্রু ভয়ে ভীত না হয়ে আরও বিপুল জাঁকজমক করে এই উৎসব পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন ম—হা—রা—জ—অ—অ—

রাজপুরীর নহবতে জয়জয়ন্তী রাগে উৎসবের সূচনা বিজ্ঞাপিত হয়ে গেল।

"কিন্তু—

সেই জনাকীর্ণ মন্ত্রনাগৃহের প্রান্ত থেকে একটা করুণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল—কিন্তু মহারাজ, এই আনন্দোৎসবের যে অঙ্গহানি হতে চলেছে—বিদূষক বয়স্য সভাসদ শ্রেষ্ঠী, কিঙ্করী তাম্বুলিবদের সেই জমজমাট জনসমাবেশের ভেতর থেকে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এল মহানগরীর বারাঙ্গনাদের তত্ত্বাবধায়ক প্রমোদ সচিব স্তনকলস। তার পরণে রক্তবর্ণ পট্টবাস। কণ্ঠে স্বর্ণসূত্র। তার মাথায় পঞ্চাংগুলী পরিমাণ কেশরাশির মাঝখানে স্বর্ণকঙ্কতিকা শোভা পাচ্ছে। সে করজোড়ে কিছু একটা সমস্যার কথা নিবেদন করতে যেতেই কেন যেন মহামাত্য রাক্ষসের দুটো রক্তচোখে একটা কুটিল সন্দেহের ছায়া আন্দোলিত হয়ে উঠল। দ্রুত উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, কেন— কেন অঙ্গহানি হবে কেন, ভরতের নাট্যশাস্ত্র বিশেষজ্ঞা গণিকা চারুহাসিনী রাজধানীতে অনুপস্থিত?

না আর্য। বেশ্যাকুলের ভূষণ স্বরূপা —

কে, বিশাখিলের কলাশাস্ত্র নিপুণা জঘনচপলা নাম্নী বারবধূ?

না আর্য—হিমালয়-দুহিতা পার্বতী যেমন ঈশ্বরের হৃদয় আকর্ষণ করেছিলেন সেই বারবিলাসিনী তেমনি কুসুমপুরের তাবৎ ধনেশ্বরদের হৃদয় আকর্ষণ করে—

কার কথা বলছো স্তনকলস? দত্তিলের সঙ্গীতশাস্ত্রে নিপুণা বারাঙ্গনা মদনিকা?

এইবার—এইবার স্তনকলস স্তব্ধ হয়ে গেল। আর তীব্র কোন মর্মযাতনা-তেই তার মাথার কেশরাশি সেই কঙ্কতিকা দিয়ে ঘন ঘন ঘর্ষণ করতে লাগল।

কী স্তনকলস নিরুত্তর হয়ে রইলে কেন? কিসের এক" জটিল অভিসন্ধির চাপা হাসি স্ফুরিত হয়ে উঠল মহামাত্যের মুখাবয়বে। দুশ্চিন্তার ভান করে বলল, ও বুঝেছি, তুমি বোধ হয় আতোদ্য ১ বাদ্যে পারদর্শী সেই স্বনামধন্য শিল্পকারিকা ২ লীলাবতীর কথা বলছো?

আজ্ঞে না আর্য, আমি বলছি সেই বিলাসবতীর কথা যার বিদ্যুৎকান্তি নিতান্ত বৃদ্ধ রতিক্রিয়ায় অক্ষম পুরুষের মনেও মদন-দাহ-বেদনা উৎপাদন করে।

---

(১) বীণা, মুরজ, বংশী ও কাংস্য—এই চার যন্ত্রের বাজনা সহযোগে ঐক্যতান।

(২) নৃত্যগীত ও বাদ্যযন্ত্রে নিপুণা গণিকা।

(৩) বর্শা জাতীয় তীক্ষ্ণধার লৌহশলাকাযুক্ত অস্ত্র।

(৪) অশ্ব।

মেরুপর্বতের মত যার বিপুলায়তন নিতম্ব তপস্বীর সমাধি-বর্ম-ভেদিকা ভল্লীর ৩ মত।

স্তনকলস—এইবার আমাত্য রাক্ষসের কণ্ঠস্বরে উত্তাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, আমরা জানি, তুমি বেশ্যাবিশেষজ্ঞা—কিন্তু রমণীর দেহাবয়বের এই বিস্তারিত আলঙ্কারিক বিবরণ শ্রবণ করার সময় নেই—

কিন্তু আর্য, কুটিল সেই ব্রাহ্মণের অনুচররা যখন বিট, গণিকা, কুট্টনী, সাধু তপস্বীর ছদ্মবেশে কুসুমপুর ছেয়ে ফেলছে, যখন দেশের এই সঙ্কটজনক অবস্থা তখন আপনার গজাধক্ষ্য চন্দ্রভানু এবং আপনার বহুলগন্ধর্ব ৪ বাহিনীর সর্বাধক্ষ্য মেঘনাদের মানসিক চাঞ্চল্য নিশ্চয়ই গুরুতর আশঙ্কার উদ্রেক করে মনে—

কেন? রাক্ষসের নেশাচ্ছন্ন চোখদুটোর দৃষ্টি শিহরিত হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, ক্ষণকাল পূর্বেই যে সন্ধিবিগ্রহিকসচিব করভক জানালো, চন্দ্রভানু এবং মেঘনাদ দুইজনেই স্ব স্ব কর্তব্যে রত—

হ্যাঁ আমার গুপ্তচররা তো তাই বলে, করভক সমবেত জনতার ভেতর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

না আর্য, নিশীথ রাত্রে তারা সীমান্ত শিবির থেকে রাজধানীতে এসে বেশ্যাপল্লীতে সেই বারবিলাসিনীর খোঁজ—করছে—

ক্ষপণক—উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল মহামাত্য রাক্ষস।

গুপ্তচরবিভাগের অধিকর্তা ক্ষপণক ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এল। তার দুটো চোখে ভীতদৃষ্টি। রাক্ষস কর্কশকণ্ঠে বলল, তুমি কি নাসিকায় তৈল প্রদান করে সুখনিদ্রায় মগ্ন হয়ে আছো?

চন্দ্রভানুর প্রসঙ্গে আমার কোন অপরাধ নেই প্রভু। সে সঙ্গোপনে কোন ছদ্মবেশ ধরে আসছে—ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে সে আবার বলল, হয় ভাটের, না বিটের বেশ নিয়ে গজাধক্ষ্য বাররামাদের পল্লীতে আসছেন নিশ্চয়ই! আপনি তো জানেন আর্য, বিট-ভাট-কুট্টনী, বেশ্যাদের সঙ্গে সম্পর্কিত নাগরিকদের ছদ্মবেশে চাণক্যের গুপ্তচররা ছেয়ে ফেলেছে রাজধানী—বহু প্রচেষ্টা করেও বুঝতে পারছি না আর্য গজাধক্ষ্য কোন ছদ্মবেশ—

জ্যামুক্ত ধনুর মত অকস্মাৎ রাক্ষস আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। আর সেই মন্ত্রণাগৃহের সমবেত জনতাকে বিস্মিত করে ঝড়ের বেগে বাইরে যেতে যেতে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে ক্ষপণককে বলল, তুমি আমার গোপন মন্ত্রণা কক্ষে এস—

রাক্ষস বলল, তুমি বলতে পারো ক্ষপণক চন্দ্রভানুর এত প্রবল আসক্তি কেন রূপজীবিনী মন্দারের ওপরে—

শুনেছি গজাধক্ষ্যের সঙ্গে তার বহুকালের সম্প্রীতি—

কিন্তু তুমি তো অবগত আছো মন্দারকে দণ্ডকবনে কি উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছি—

হ্যাঁ। তা আমি জানি আর্য! কেন যেন স্তব্ধ হয়ে যায় ক্ষপণক। তার রেখাজটিল মুখাবয়বে দুশ্চিন্তার ছায়া ঘনিয়ে আসে। বহুদর্শী প্রৌঢ় গুপ্তচর-প্রধান অস্ফুটকণ্ঠে বলে, আমার এক অনুচর দারুবর্মাকে মধু ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে দণ্ডকবনে প্রেরণ করেছিলাম—

কি বলেছে—কি বলেছে দারুবর্মা? তীব্র আবেগে কম্পিত হয় মহামাত্যের পৃথুল দেহ।

নিস্তব্ধ হয়ে থাকে ক্ষপণক। পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত গর্জন করে ওঠে বৃদ্ধ মন্ত্রী, কি নিরুত্তর হয়ে আছো কেন? ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে স্তিমিত কণ্ঠে বলল ক্ষপণক দণ্ডকবনের সমাচারও শুভ নয় আর্য—

কেন—কেন?

মন্দার নাকি মৌর্য যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রতি আসক্ত হয়ে উঠেছে। দুরাচারী কুটিল সেই ব্রাহ্মণ তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যুবরাজকে কেন্দ্র করে তার স্বপ্নকে সে সত্যে রূপায়িত করবে। তাই মন্দার হয়ে উঠেছে শয়তানদের হাতের ক্রীড়নক—

হো-হো-হো প্রচণ্ড অট্টহাসিতে রাক্ষসের বিপুলায়তন উদরের বলি রেখাগুলো থর থর করে কাঁপতে লাগল। অদূরে গজদন্ত নির্মিত জলচৌকিতে সযত্নে রক্ষিত সুগন্ধী উত্তেজক আসব পরিপূর্ণ এক রৌপ্যপাত্র তুলে নিয়ে মুখগহ্বরে কিছুটা নিক্ষেপ করে বলল, অতীব—অতীব উত্তম সংবাদ—অতীব উত্তম সমাচার ক্ষপনক—যাও কোন জঘনচপলা পীনোন্নত পয়োধরার সান্নিধ্যে মহাসুখে কৌমুদীমহোৎসব যাপন করো, বলেই ও হঠাৎ তাম্বুলরঞ্জিত দীর্ঘ জিহ্বাকে দংশন করে ঈষৎ হেসে বলল আবার, তুমি অপরাধ নিও না ক্ষপণক। তা শুনেছি তোমার সীমাস্বর্গের ইন্দ্রানীটি নাকি পরমাসুন্দরী—আমি বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলাম—

শরতের প্রথম পূর্ণিমা রজনীতে যখন নক্ষত্রখচিত আকাশ উদ্ভাসিত করে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হলো তখুনি কৌমুদীমহোৎসবের সূচনা হলো বৈতালিকদের

শরৎবন্দনা সঙ্গীতে—

হে শরৎ, করি তব বন্দনাস্তব
আহা, তুমি যেন মহাদেবতনু উদ্ধত তাণ্ডব।
তাণ্ডবকালে শিবদেহ হতে ভস্ম উড়ায় বায়ে
দিঙমণ্ডল ভরেছে তেমনি শুভ্রকাশের ছায়ে।

স্তব্ধ হয়ে গেল প্রধান বৈতালিক। নীরব হলো আতোদ্য বাদ্যের সুমধুর ঐকতান। অনন্তর বৈতালিক নায়ক তার কুরবক পুষ্পরঞ্জিত নখ এবং শঙ্খবলয় শোভিত হস্ত উত্তোলন করে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলে—

শ্রবণ করুন পুরোবাসীগণ, শরৎকাল যেন দেবাদিদেবের বরতনু। শরতে চন্দ্রের কিরণে নীল মেঘ শুভ্র হয়ে যায়, ঠিক তেমনি প্রভুর মেঘের ন্যায় মলিন গজচর্মের উত্তরীয় ধবল হয়ে ওঠে তার মস্তকের চন্দ্রকলায়। শরতের দেহে শুভ্রজ্যোৎস্না, প্রভুর দেহেও শ্বেত নরকপালমালা। ভোলানাথের অট্টহাসির শ্রী যেন শরতের রাজহংসের শ্রীর মত শোভা পায়—

আসছে—আসছে শোভাযাত্রা—উপস্থিত শ্রোতাদের ভেতর থেকে হঠাৎ একজন উল্লসিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। আর চক্ষুর নিমেষে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তারা দ্রুতগতিতে অদম্য উৎসাহে ছুটল কৌমুদী-মহোৎসবের অন্যতম আকর্ষণ—স্তনজঘনভারালসা বারবিলাসিনীদের ভ্রাম্যমান নৃত্যনাট্য সহযোগে বিচিত্র সেই রঙীন শোভাযাত্রার অভিমুখে।

দূরাগত মেঘগর্জনের মত ভেসে আসছে পাখোয়াজের গম্ভীর ধ্বনি—বাজছে মৃদঙ্গ, বাজছে মুরজ, বাজছে বংশী আর কাংস্য। সেই মনোহর ঐকতানের সুমধুর স্বর কুসুমপুরের বায়ুমণ্ডলকে কেমন আচ্ছন্ন—আর বিবশ করে দেয়। সেই আতোদ্য বাদ্যের মধুর ধ্বনিকেও ছাপিয়ে শ্রুতিগোচর হলো পরিহাসরসিকা বিলাসবতীদের জলতরঙ্গের মত মিষ্টি আর তীক্ষ্ণকণ্ঠের হাসির ক্ষীণ আওয়াজ। ক্রমশ, নিকটবর্তী হলো দীপোজ্জ্বল কুসুম ও ধূপাবাসে সুবাসিত সেই বর্ণাঢ্য বিচিত্র শোভাযাত্রা। তার পুরোভাগে মগধেশ্বর স্বয়ং সর্বার্থসিদ্ধি। তার পরিধানে পীতবর্ণের স্বর্ণখচিত চীনাংশুক। তার দুইদিকে হরিবক্ষচ্যুতা লক্ষ্মীর-মত অপরূপ রূপসী দুই পণ্যবধূ। তাদের সুডৌল দুটো হাতে শোভা পাচ্ছে সুগন্ধী তাম্বুলে পরিপূর্ণ ধাতব নির্মিত তাম্বূলকরংক ১। মধুর স্মিত হাস্যসহকারে ভ্রূভঙ্গে এক অসামান্য বিভ্রমের সৃষ্টি করে তারা মাঝে মাঝে মহারাজকে তাম্বূল ও সুগন্ধী পুষ্প প্রদান

করছে। সেই তাম্বুলে গণ্ডদেশ পরিপূর্ণ করে মহারাজা উল্লাসিত কণ্ঠে বলছে সাধু—সাধু—

অনন্তর, শৃঙ্গাররসে সন্তরনরতা কলহংসীর মত হাস্যোচ্ছল কয়েকটি গণিকা পরিবৃত হয়ে আসছে মহামাত্য রাক্ষস। তারপরেই ভ্রাম্যমান নৃত্যনাট্যের কুশীলব বারঙ্গনা বিট-কুট্টনীবৃন্দ। তাদের পশ্চাতেই মন্থরগতিতে আসছে শ্রেষ্ঠী-বণিক বিদূষক-কিতব ২—সাধু তপস্বী গৃহী তথা কুসুমপুরের বিলাসী অধিবাসীরা।

বিদূষকশ্রেষ্ঠ চিন্তামণির পরণে কুংকুমবৎ পীতবর্ণের বস্ত্র। কণ্ঠে রঙীন কাচবর্তকের ৩ মালা। সে ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে তার সহযোগী সঙ্গিনী ভরতের কথিত ক্রিয়ায় নৃত্যনিপুণা সেই চারুহাসিনীর অলকাবলী রঞ্জিত চিবুকে লঘু স্পর্শ করে গেয়ে উঠল—

দাও ফেলে দূরে হে বারবনিতা
যৌবন আর রূপের মদ
শেখ সযতনে, চতুঃষষ্ঠী কামকলা
কামিগণ হয় যাহাতে বধ

অবিরাম চলেছে আতোদ্যবাদ্যের মধুর সুরের অনুরনণ। তার সঙ্গে তাল বা প্রেংখনাদি মিলিয়ে কখনো হস্তসঞ্চালন, কখনো উদ্বহন (১) কখনো পার্শ্ববলিত (২) ললিত ভঙ্গীতে নেচে নেচে চারু হাসিনী গেয়ে উঠল—

আরে মূঢ় শ্রবণ কর—
যারে তুই বলিস কামকলা
জানিস তার আর এক নাম 'নন্দিনী।'

সাধু—সাধু! শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনে মুখরিত হয়েওঠে চারিদিক। নৃত্যগীতের মাধ্যমে চতুঃষষ্ঠী কামকলার ব্যাখ্যা করতে করতে এগিয়ে চলে কুশীলবরা সেই সঙ্গে শোভাযাত্রাও অগ্রসর হয়।

দীর্ঘ সেই আলোকোজ্জ্বল মিছিলের মাঝখানে তীব্র উত্তেজক মদিরার প্রভাবে মত্ত কয়েকজন যুবক সুবেশা বারাঙ্গনাদের যৌবনপুষ্ট দেহের ওপরে ঢলে ঢলে পড়ছে। আর কপট ক্রোধে নাগিনীর মত ফুঁসে উঠছে গণিকারা।

(১) পানের বাটা (২) দ্যূত ক্রীড়াসক্ত (৩) পুঁথির মালা।
(৪) ঊর্দ্ধবাহু হয়ে নৃত্য (৫) side movement

তাদের ভেতরে প্রগলভা, পরিহাসরসিকা এক বারাঙ্গনা বলে উঠল, ওলো মালতী, দেখেছিস আসবপানে কেমন মত্ত হয়েছে—এখন তোর চরণযুগল জড়িয়ে ধরে উন্মত্তের মত ক্রন্দন করবে শুধু—কজ্জলায়িত দুটো আয়ত চোখে অর্থপূর্ণ হাসি ফুটিয়ে চাপা অস্ফুট কণ্ঠে বলল, আর কিছু আশা করিস না—

শ্রবণ করো গুরুজঘনে, রাহুগ্রস্ত চাঁদের শোভার মত তোমার অলকাবলী-রঞ্জিত বদন-চন্দ্রিমার শোভা, মত্ত স্খলিতপদ ওই তরুণদের ভেতরে এক শ্রেষ্ঠীপুত্র তার উরুদেশের ওপরে এক বেশ্যাকে বসিয়ে পরমপ্রীতি ভরে আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলছে, বাঁধুলি ফুলের রক্তবর্ণকে পরাজিত করে তোমার অধরের সহজাত অরুণিমা। মদনের আবাসস্থলস্বরূপ তোমার বিশাল নিতম্ব রম্ভাকাণ্ডের মত তোমার উরুযুগল—

বাপু হে, সরল ভাষায় ব্যক্ত করো, এক ভাঁড় ঘুরপাক খেয়ে নেচে বলল মদন-বেদনা-দাহে তুমি কাতর হয়ে পড়েছো—

সঙ্গে সঙ্গে বেগবতী ঝর্ণার মত হাসির লহর পড়ে গেল জনতার ভেতরে।

দণ্ডে দণ্ডে, প্রহরে প্রহরে রজনী গভীর হয়। সেই সঙ্গে উৎসবের মত্ততা পানাসক্ত যুবকদের অসংযত অশালীন ব্যবহারে, বারাঙ্গনাদের কামোদ্দীপক চাটুবাক্যে উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হয়।

নগর পরিক্রমা করে শোভাযাত্রা ন্যগ্রোধ বৃক্ষতলে চতুঃষষ্ঠী কামকলার আলোকোজ্জ্বল আলোচনা সভায় এসে সমাপ্ত হয়ে যায়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্না রতিবিলাসিনীরা সুরত ক্রিয়া প্রসঙ্গের সেই ভাষণ শোনার প্রয়োজন উপলব্ধি করে না। আর তারা দীর্ঘ পদযাত্রায় ক্লান্ত বলেই যে যার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

বেশ্যাপল্লীর প্রতিটি গৃহের সম্মুখে আমিষলোলুপ বীভৎস পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। গণিকারা ভাটি গ্রহণ করে না বলে কামানলে দগ্ধ হতে পতঙ্গের মত এসেছে দেশদেশান্তরের মানুষ। শ্রেষ্ঠী এসেছে তার বিপণী বন্ধ করে, সেনানী এসেছে তার অতন্দ্র প্রহরার গুরুভার দায়িত্ব পরিত্যাগ করে। সেই রতিঅভিলাষী আগন্তুকদের মুখের দিকে তীক্ষ্নচোখে কি যেন নিরীক্ষণ করে বিকরালা নাম্নী এক বৃদ্ধা ভগ্নকণ্ঠে বলে উঠল, হে তপোধনবৃন্দ আমার হিতবাক্য শ্রবণ করো। যত শীঘ্র সম্ভব বারবধূ অধ্যুষিত এই স্থান পরিত্যাগ করে চলে যাও—ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে নিজের শিথিল চর্মের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে আবার বলল, তোমরা কি জান

আছো যৌবনবতীদের স্তনযুগল যেন রাজকর্মচারী ? কোন রাজকর্মচারী যেমন দিন দিন উন্নতি লাভ করে কার্যে প্রতিবন্ধকহীন হয়ে প্রজাপীড়ন করে। কিন্তু কোন কারণে যদি তার পতন হয় তখন আর কেউ তাকে সামান্য সম্মান প্রদর্শনও করে না। সেই রকম কুচযুগল অপ্রতিহতভাবে পীনোন্নত হয়ে পুরুষের মনে সর্বনাশা কামপীড়ার সৃষ্টি করে, কিন্তু যেই তার পতন হয়, বলেই তার নিজের শুষ্ক আম্রফলের মত কুঞ্চিত চুচুক দুটোর দিকে ইঙ্গিত করে অস্ফুটস্বরে বলে, কেউ আর স্পর্শ করতে চায় না—

স্তব্ধ হও নির্লজ্জা বৃদ্ধা বারাঙ্গনা, কৌমুদীমহোৎসবের রাত্রে জরা-মৃত্যুর কথা নিষিদ্ধ,তা তুমি জ্ঞাত নও, বলেই মৃদু একটা আঘাত দিয়ে কূটকুটিলচূড়ামণি সেই ব্রাহ্মণের হাতের পাঞ্জা প্রদর্শন করে এক বিট চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, গজাধ্যক্ষ্য—ভাটের বেশ ধরে মন্দারকে খুঁজছে ওইদিকে—চন্দ্রভানুর বামগণ্ডে কৃষ্ণবর্ণ জড়ুলচিহ্ন আছে আর বিদূষকের ছদ্মবেশ ধরে আসছে অশ্বাধ্যক্ষ মেঘনাদ। তার দ... হস্তে কাটা দাগ আছে—এই কথাগুলো বলেই তড়িৎগতিতে বিটের ছদ্মবেশধারী চাণক্যের গুপ্তচর রোহিতাক্ষ অন্ধকারে সরীসৃপের মত অদৃশ্য হয়ে গেল।

বারবিলাসিনীদের পল্লীর শেষপ্রান্তে কদম্ববৃক্ষের নীচে এক বাররামার গৃহের সম্মুখেই লালসাতুর্বল পুরুষদের অধিক সমাবেশ। আলোকোজ্জ্বল দ্বারপ্রান্তে একটা স্থির অকম্পিত প্রদীপশিখার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই গণিকা। কোন বিশেষ বিলাসী পুরুষের জন্যে করছে উদগ্র প্রতীক্ষা। কিন্তু আশ্চর্য—সেই বারাঙ্গনার মুখাবয়ব কেন যেন নীলাভ পট্টবস্ত্রের উড়ানি দিয়ে আবৃত। তার অনুপম দেহলাবণ্য দেবভোগ্য অপ্সরার মত।

আমাদের প্রবেশ নিষেধ কেন ?

কৌমুদীমহোৎসবের রাত্রে কুসুমপুরের কোন গণিকা কোন পুরুষকে—হতাশ করে ফিরিয়ে দিতে পারে না—

কামানলে দগ্ধ পুরুষদের ভেতরে গুঞ্জন ওঠে। সেই রহস্যময়ী স্বৈরিণীর অদূরে দণ্ডায়মান তার সহায়তাকারী বিট করজোড়ে বলল, ভদ্র, কোশল থেকে আগত এক ভাট এবং বিদূষকের সঙ্গে এই বারাঙ্গনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে—দূরে তরল অন্ধকারে কি যে নিরীক্ষণ করে বলল, ভাট ও বিদূষক মহোদয় বিদায় গ্রহণ করলে আপনাদের সাদরে আহ্বান করবে—

কামুক পশুগুলো কি বলছে—কি বলছে তার বিট, কিছুই যেন সেই

গণিকার কর্ণগোচর হচ্ছে না। তার মনের দর্পণে শুধু একটা—একটা মাত্র মুখচ্ছবি পুনঃপুন প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। আর তার চেতনা কেমন বিহ্বল হয়ে আসছে। দূরাগত মন্ত্রোচ্চারণের ধ্বনির মত বাজছে সেই বৃদ্ধের কথাগুলো—সত্যিই যদি বৎসে মৌর্য যুবরাজকে ভালোবেসে থাকো, তাহলে তাকে সহায়তা করো···হ্যাঁ সে করবে—মৃত্যুকে তুচ্ছ করে সে যে কোন দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হবে, হবে শুধু তার স্বপ্নের রাজপুত্রকে, গৌরবের আর মহত্বের—

আসুন—আপনাদের শুভাগমনের জন্য প্রতীক্ষার যাতনায় কাতর হয়ে পড়েছে আপনার দয়িতিকা—রৌপ্যখচিত পীতবর্ণের পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ পরিহিত ভাটকে এবং আর এক বিদূষককে বিকরালা পথ প্রদর্শন করে নিয়ে এল। উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনা করল সেই বিট। বৃদ্ধা কুট্টনী বিকরালা অদূরে ঘন অন্ধকারে একটা প্রেতিনীর মত দণ্ডায়মান থেকে আসন্ন কোন ভয়াবহ ঘটনার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

অপরূপ রূপসী সেই গণিকার গৃহের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল।

নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে একটা উল্কা ঝরে পড়ল নিশীথ দিগন্তের দিকে। রাত্রির নিথর স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে একটা পেচক কর্কশস্বরে ডেকে উঠল।

শেষপ্রহরের চন্দ্রহীন রাত্রি। শরতের শোভা শ্বেতশুভ্র শেফালি চারিদিকে তীব্র বাস বিকীর্ণ করছিল।

নগরপ্রাকারের বাইরে কৃষ্ণদর্পনের মত পরিখার জলে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতিবিম্ব মৃদুমন্দ বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। আর দূর—দূরান্তবর্ত্তী সৈন্য-শিবিরগুলো মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছে। সমরনায়ক এবং তাদের অনুচররা দূরে রাজধানীতে বারাঙ্গনাদের গৃহে প্রমত্ত নিশিযাপনান্তে গভীর সুখনিদ্রায় মগ্ন হয়ে রয়েছে।

মহানগরীর গৃহে গৃহে দ্বার রুদ্ধ। নির্বাপিত দীপ। আলোকহীন রাজপথ। তামসী রাত্রির গহণ অন্ধকার যেন বিরাট পক্ষ দিয়ে সমগ্র বিশ্বচরাচর আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ঠিক এই সময় দুইটি লুব্ধ শৃগাল কোন নধর ছাগ শিশুর সুস্বাদু মাংস পরম তৃপ্তিভরে আকণ্ঠ আহার সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের মুহূর্তে গৃহস্থের নিক্ষেপিত তীক্ষ্ণধার ভল্ল বিদ্ধ হয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করল।

কুসুমপুরের উত্তরসীমান্তে গণ্ডকী নদীর তটে, দক্ষিণে শিবনদীর তীরে

প্রেতচ্ছায়ার মত অযুত লক্ষ শত্রু সৈন্য নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সমবেত হলো। লক্ষ লক্ষ অশ্বারোহীর দ্রুত ধাবমান গন্ধর্বের খুরপুটের আঘাতে ভূমি থেকে মহাপ্রমাণ ধূলিকণা ঘন কুয়াশার মত কুসুমপুরের আকাশ আবৃত করল। সেই সময় চারজন সশস্ত্রবাহকবাহীত কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে আবৃত একটা দোলিকা উল্কার গতিতে কুসুমপুরের সীমানা অতিক্রম করে দূর অন্ধকার দিকচক্রবালে উধাও হয়ে গেল।

আরোহিনীর মুখমণ্ডলে সাফল্যের হাসি। তার মাথার ভেতরে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে রক্তের উচ্ছ্বাস। এখনও—এখনও শরৎ পূর্ণিমা রজনী অতিক্রান্ত হতে আরও কয়েকটি দণ্ড অবশিষ্ট আছে! আর কয়েকমুহূর্ত পরেই তার বহু বিনিদ্র রজনীর স্বপ্ন সফল হবে। কিন্তু বড—বড় মন্দগতিতে যেন চলেছে দোলিকা! কতদূর—দণ্ডকবন আর কতদূর—

শত্রু—শত্রু সৈন্য রাজধানীতে প্র—বে—শ করেছে—পালাও—পালাও—সহসা সম্মিলিত সহস্রকণ্ঠে সকরুণ আর্তনাদ মহানগরীর নিস্তব্ধতা শতখণ্ডে বিদীর্ণ হয়ে গেল। চালকবিহীন মহাপ্রমাণ রণহস্তীগুলো দণ্ডক নদীবক্ষে অবরোহণ করে জলকেলীতে মত্ত হয়ে উঠল। আরোহীবিহীন তেজোদৃপ্ত বলশালী অশ্বগুলো অগনিত শত্রুসৈন্যের ভযে ভীত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। নগর মধ্যে উত্তেজিত বিহ্বল নরনারীর ক্রন্দনে, হাহাকারে যেন মহাপ্রলয় নেমে এল।

দণ্ডকবনের প্রান্তে যখন সেই দোলিকা পৌঁচালো তখন আকাশে থরে থরে জমেছে ঘনকৃষ্ণবর্ণ মেঘ। অসময়ের মেঘ। ঝড়ের আশঙ্কায় সমগ্র বিশ্বচরাচর স্তব্ধ। রাত্রির শেষযামে আসন্ন সেই ঘনীভূত দুর্যোগকে অগ্রাহ্য করে দ্রুত—অতি দ্রুত পদক্ষেপে চলেছে মন্দার। নিবিড় অন্ধকারে জলজল করছে তড়িৎ রেখার মত তার অত্যুজ্জ্বল শুভ্র দেহলতা। পরমারাধ্য গুরুদেবের কামসূত্রে আছে নায়কের সমীপে গমনকালে নায়িকা তার অনিন্দ্যসুন্দর যৌবনশ্রীকে প্রায় অনাবৃত করে যাবে। অধিক পরিমানে বস্ত্রাভরণ আর বহুমূল্য অলঙ্কার যৌবন কল্পতরু সাদৃশ তনুলতার সহজাত পরম রমণীয় শোভাকে বিনষ্ট করে দেয়—তাই সে তন্বী সুঠামতনু আবৃত করেছে নীলাভ বর্ণের চীনাংশুকে। প্রায় আস্বচ্ছ সেই বস্ত্রাবরণের অধোভুবনে কনকলতার মত সুগোল জঙ্ঘাযুগল প্রদীপ্ত আভা বিকিরণ করছে। উর্দ্ধে জনক্ষয়কারী উদ্ধত কুচদ্বয় নায়কের বলিষ্ঠ স্পর্শের আকাঙ্খায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। ভেতরে ভেতরে কামনার

লেলিহান অনলে দগ্ধীভূত হয়ে যাচ্ছে তার সর্বাঙ্গ। আজ—আজ তার বহু প্রত্যাশিত সেই মিলনের শুভরাত্রি! দূর দিগন্তে বিক্ষুব্ধ মেঘ গর্জন শ্রুতি-গোচর হচ্ছে—স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে বায়ুপ্রবাহ। এখুনি—এখুনি অবিরল ধারায় বৃষ্টি নামবে। উন্মত্ত একটি ঝটিকার মত দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটছে সে। আর—আর কতদূর—কতদূর যুবরাজের কুটির।

আহ্বান করতে হলো না। গোপন অভিসারের নায়িকার মত কোন নিঃশব্দ সঙ্কেতও করতে হলো না। কুটিরের দ্বার অবারিতই ছিল। ঘরের অভ্যন্তরে মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে পা দিযেই বন্যাবিক্ষুব্ধ নদীর উত্তাল তরঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রতীক্ষারত নায়কের প্রশস্ত আর বলিষ্ঠ বক্ষদেশে। সেই মুহূর্তে লোলুপ উল্লাসে সে নায়কের দেহে নদী হয়ে বিলীন হয়ে গেল।

বাইরে রজনীর শেষযাম বিপুল সুখের অনুভবে আবিষ্ট হয়ে এল।

তুমি আমার বক্তব্যে সন্দিহান হয়েছো যুবক, কুটিল ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্বরে বিক্ষোভ পরিস্ফুট হয়ে উঠল। মৌর্য যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাংগুলি দিয়ে কুটিরের মৃত্তিকা খনন করতে করতে বলল, অপাপবিদ্ধা ওই উদ্ভিন্ন যৌবনা রমনীর ভেতরে কি এমন দুর্লক্ষণ প্রত্যক্ষ করলেন আর দীর্ঘ রজনীব্যাপী কেন ই বা আপনার কুটিরে আমাকে বন্দীর মত অবরুদ্ধ—

কি অশুভ সংকেত দেখেছি—দেখবে অর্বাচীন—এসো স্বচোক্ষে দেখবে, যুবরাজের হস্ত আকর্ষণ্ করে তাকে নিয়ে এল তীক্ষ্ণধী সেই পণ্ডিত; নিয়ে এল অদূরবর্তী শাল্মলী তরুর নিম্নে সেই কুটিরে সেখানে চন্দ্রগুপ্ত নিয়মিত নিশিযাপন করে। কিন্তু কুটিরাভ্যন্তরে পা দিয়ে তীব্র বিস্ময়ে একেবারে নিস্পন্দ হয়ে গেল!

এ কী! ভূলুণ্ঠিত একটা বৃক্ষের মত বিশাল দেহী অনার্যরাজ পর্বতক গৃহতলে শয়ন করে রয়েছে। তার মুখগহ্বরে জমাট ঈষৎ রক্তিম কৃষ্ণবর্ণ রক্ত! ইতিমধ্যে কয়েকটি পিপীলিকা পরমতৃপ্তিতে লেহন করছে সেই শুষ্ক রক্ত। সমগ্র দেহটা একখণ্ড শুষ্ককাষ্ঠে পরিণত হয়েছে! সেই কক্ষেরই কোণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে শ্বেতশুভ্র সুগন্ধী শেফালিকা পুষ্পমাল্য আরও কিছু ছিন্ন পুষ্পের বিবর্ণ পাঁপড়ি। বিদ্যুতচমকের মত মনে হল, গুরুদেবের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে শরতের প্রথম পূর্ণিমা রজনীতে রণঅভিযানের প্রারম্ভে মন্দার তার কুটিরে আসবে বলে—সে স্বয়ং ওই ফুলসজ্জা রচনা করেছিল। এখনও—এখনও ব্রাহ্মমুহূর্তের স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে পর্যুসিত সেই পুষ্প থেকে সৌরভ বিকীর্ণ হচ্ছে। কিন্তু—কোথাও—কোথাও নেই সেই অঘটন-ঘটন পটিয়সী, রহস্যময়ী—

কন্দায়!

বিস্ময়ের অভিভূত আচ্ছন্নতা বহু আয়াসে অপসারণ করে চন্দ্রগুপ্ত স্তিমিত কণ্ঠে বলল, কিন্তু গুরুদেব আমাদের মিত্র পর্বতক—এই দুঃসময়ে আমাদের পরম সহায়কের নিদারুণ করুণ—

কৌতূহল সংযত করো বৎস। শুধু অন্তরে ধ্রুবতারার মত স্থির এবং নিষ্কম্প করে রাখো একটি—একটি মাত্র—আকাঙ্খা—তোমাকে অধিকার করতে হবে মগধের সিংহাসন। তোমাকে আসমুদ্র হিমাচলের রাজন্যবর্গদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে—

মহাজ্ঞানী চাণক্যের প্রেরণাদৃপ্ত কথাগুলো মৌর্য যুবরাজের মনে বিপুল উদ্দীপনা সঞ্চারিত করল। সে দ্রুত উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, শরৎ পূর্ণিমা রজনী তো অতিক্রান্ত হয়ে গেল প্রভু—কুসুমপুরে আমাদের রণঅভিযান—

বিগত রজনীতেই আমাদের মিত্র-দেশের পারসিক, শক, যবন, কিরাত সৈন্যরা যুদ্ধযাত্রা করেছে। আমার অনুমান, হয়তো এইক্ষণে,—আকস্মিক স্তব্ধ হয়ে গেল কুটিল চূড়ামণি। ক্ষণকাল অদূরে তরল ছায়া-অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহতলে হতভাগ্য পর্বতকের মৃতদেহের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কি নিরীক্ষণ করে বলল, যুবরাজ, যাও—আমাদের অনুচর ভাগুরুয়ানকে খবর দাও—শীঘ্র পর্বতকের পুত্র মলয়কেতুকে পিতার মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করো—

শোকে বিহ্বল হয়ে এল মলয়কেতু। বলশালী, তেজস্বী সেই অনার্য সন্তান আকস্মিক পিতৃবিয়োগের ব্যথাকে সংযত করে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণের বহু রেখাঙ্কিত জটিল মুখাবয়বের দিকে তাকিয়ে বলল, আর্য পিতৃদেব তো কুসুমপুরে রণঅভিযান প্রসঙ্গে আপনার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে এসেছিল—

বৎস, তোমার পিতার অপঘাত মৃত্যুর জন্য দায়ী দুরাচার মহামাত্য সেই রাক্ষস। ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে আবার বলল, তুমি বোধ করি জ্ঞাত আছো যে নবোদ্ভিন্নযৌবনা এক রমণী এই গহণ দণ্ডকবনে এসেছিল। সে রাক্ষসপ্রেরিতা গুপ্তচর শুধু নয়, সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধির সহায়তায় রাক্ষস তাকে তার মায়াজালে বিষকন্যায় পরিণত করেছিল। তার সঙ্গে সহবাসের ফলেই তোমার পিতার মৃত্যু—

আমি রাক্ষসের মস্তক চাই, নিরুদ্ধ প্রতিহিংসায় দগ্ধ হয়ে কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল মলয়কেতু। তার মর্মতন্তু ছিন্নকারী সেই মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরে নিস্তব্ধ

আরণ্যক পরিবেশ প্রকম্পিত হয়ে উঠল। অনার্যরাজের আকস্মিক হত্যাকাণ্ডে আদিবাসী যোদ্ধাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে রণোন্মাদনা তরঙ্গিত হয়ে গেল। দিগন্তবিসারী সেই নিবিড় অরণ্যকন্দর থেকে ভানুমতীর কুহকের মত বেরিয়ে এল সহস্র সহস্র ঘোরকৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের মত বলিষ্ঠদেহী অনার্য সন্তান। তারা স্নায়ু-স্যাযুক্ত ধনুহস্তে আর তূনে বিষ-বিদূষিত শর নিয়ে মলয়কেতুর নেতৃত্বে কুসুমপুরে অভিযান করল।

-হা-হা-হা—চাণক্যের প্রবল অট্টহাস্যের আওয়াজে নির্জন বনভূমি সচকিত হয়ে উঠল। নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ পুষ্ট শিখাটিকে বিমর্দন করতে করতে হঠাৎ ব্রহ্মতালুতে সশব্দে একটা চপেটাঘাত করে বলল, আমারই কৌশলে তোমার রাজ্যের অর্দ্ধ-অংশের অংশীদার পর্বতক বিনাশপ্রাপ্ত হলো—

গুরুদেব, আমি রণক্ষেত্রে যাবো না?

রণক্ষেত্রে নয়, যাবে মগধেশ্বরের রাজপুরীতে। গুর্জর থেকে সমতট, হিমাদ্রি থেকে অনার্য পাণ্ড্য-দেশ পর্যন্ত মুখরিত করে তোমার জয়ধ্বনি উঠবে বৎস—

সে কী! যুদ্ধের প্রযোজনই হবে না। মহামাত্য রাক্ষসের অযুত হস্তীসেনা, গজাধ্যক্ষ চন্দ্রভানু, বহুল গান্ধর্ববাহিনীর অধ্যক্ষ মেঘনাদ—

শ্রবণ করো বৎস, শরৎ-পূর্ণিমার বিগত রজনীতে কৌমুদীমহোৎসবে কুসুমপুরের মক্ষিরাণী ওই মন্দারকে প্রেরণ করেছিলাম—

মন্দারকে যে অনিবার্য মৃত্যুর মত বিষকন্যায় পরিণত করেছে রাক্ষস—সেকথা একমাত্র সর্বার্থসিদ্ধি ব্যতীত কেউই জানতো না। আমার সুদক্ষ গুপ্তচর রোহিতাক্ষ এবং কুট্টনীর সহায়তায় গজাধ্যক্ষ এবং অশ্বাধ্যক্ষকে মন্দারের গৃহে নিশিযাপন করিয়েছিলাম। চন্দ্রভানু ও মেঘনাদ নিহত হওয়ার পরই মন্দারকে আবার দণ্ডকবনে এনে পর্বতককে নিহত করে তোমাকে সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক—বলেই বিপুল সাফল্যের আনন্দে অট্টহাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল কূটকুটিল চূড়ামণি চাণক্য। আবার বলল, অর্জুনকে বধ করার নিমিত্ত মহাবীর কর্ণ যেমন একঘ্নী শক্তি সযত্নে রেখেছিল, তেমনি আমাকে এবং তোমাকে নিধনের জন্য রাক্ষস একঘ্নী বিষকন্যা প্রেরণ করেছিল। কিন্তু কর্ণের সেই শক্তি যেমন তারই বধ্য ঘটোৎকচকে বিনাশ করেছিল তেমনি রাক্ষসের বিষকন্যা তার বধ্য পর্বতককে নিধন করল—সেই সঙ্গে নিধন করল চন্দ্রভানু আর মেঘনাদকে—

এই ঘটনার চতুর্থ দিবস পর রবি যখন স্থিররাশিতে অবস্থান করছিল আর

শুক্রবাসরে চন্দ্রও স্বাতীনক্ষত্রে গমন করল সেই শুভদিনে মহাসমারোহে যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক সমাধা করে তাকে মগধের সিংহাসনে সমাসীন করল কৌটিল্য। তারপর—

তারপরের বিচিত্র ঘটনাচক্র যেমন শোকাবহ তেমনি সকরুণ।

চন্দ্রগুপ্ত যখন মগধের সিংহাসনে আরোহণ করল তখন বেশ্যাসক্ত রাজভ্রাতা সর্বার্থসিদ্ধি এবং মহামাত্য রাক্ষসের শিথিল শাসনকার্যের সুযোগে দেশের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্তরাজ্যের রাজন্যবর্গরা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল। তারা চাণক্যের কঠোর শাসন এবং একনায়কত্বের ওপরে অতিশয় বিরূপ ছিল বলেই চন্দ্রগুপ্তের প্রাণনাশ তথা দেশব্যাপী বিদ্রোহের সতত নিরত ছিল। শুধু তাই নয়, রাজপুরীর অভ্যন্তরেও নন্দের প্রতি সহানুভূতিশীল কিছু গুপ্তঘাতক, হস্তীচালক, কিঙ্করী, নর্ত্তকী, সূপকার তাম্বুলিক সংবাহকের ছদ্মবেশে থেকে যুবরাজের নিধনের কুটিল চক্রান্ত করছিল।

একদিন চন্দ্রগুপ্ত দ্বিপ্রাহরিক আহারে উপবেশন করেছে। তার সম্মুখে আহার্য সামগ্রী যথা ফেণীক্ষীর, খণ্ডখই, খাসামৃত মনোহরা মতিচূর ও একদ্রোণ লোধ্ররেণু চিত্রকাদির দ্বারা সুরভিত উৎকৃষ্ট মৃগমাংস। রৌপ্যনির্মিত পাত্র থেকে মৃগমাংস নিয়ে পিষ্টক-পুরোভাস সহযোগে যে মুহূর্তে ভক্ষণ করতে যাবে এমন সময় উন্মত্ত ঝটিকার বেগে এল চাণক্য। বলল,বৎস কিঞ্চিত মৃগমাংস তোমার স্বর্ণনির্মিত থালিকায় রাখো—চন্দ্রগুপ্ত তাঁর নির্দেশ মত কার্য সমাধা করিতেই মাংসের রক্তিম রঙ নীলবর্ণ হযে গেল! চাণক্য বলল, প্রত্যক্ষ করলে বৎস মৃগমাংসের ভেতরে বিষ মিশ্রিত আছে—

প্রতিটি সূপকারকে শূলদণ্ডে দণ্ডিত করল চাণক্য। নির্দেশ দিল যুবরাজকে স্বর্ণখচিত রাজকীয় বস্ত্রাবরণের অন্তরালে লৌহজালিক বর্ম পরিধান করতে। বর্ধিত করল দ্বিগুণ তার দেহরক্ষীর সংখ্যা। কিন্তু যেমন রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে, তেমনি বহুদূর ব্যপ্ত রাজ্যের দিকে দিকে চন্দ্রগুপ্ত বিনাশের প্রচেষ্টা অব্যাহত রইল।

একদিকে কঠোর হস্তে রাজন্যবর্গদের বিদ্রোহ দমন আর একদিকে জটিল রাজকার্যের সীমাহীন কর্মমুখরতার ভেতরেও কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের মানসপটে জাগরূক হয় রহস্যময়ী নগরসুন্দরী মন্দা..রর অনিন্দ্যসুন্দর মুখাবয়ব, সেই বিদ্যুতলেখার মত ভাস্কর দেহকান্তি। সে বিষকন্যা—সে রাক্ষসপ্রেরিতা গুপ্তচর হয়েও গুরুদেবের নির্দেশে পর্বতক, চন্দ্রভানু এবং মেঘনাদকে বধ করে

কেন—কেন নিষ্কণ্টক করেছিল—মন্থন করেছিল তার উন্নতির পথ! তার প্রতি অন্তহীন প্রেমের আগ্রেয় অনুভূতিই কি তার শত্রুনিধনে অসামান্য শক্তি সঞ্চারিত করেছিল তার মনে? আর সেই নিবিড় প্রণয়রভসের নিমিত্তই কি সে আজও অন্তরালবর্তিনী হয়ে বিরাজ করছে!

যখন নিশীথ রাত্রির নীরন্ধ্র অন্ধকারে সমগ্র বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায় তখন কেন যেন চন্দ্রগুপ্তের মনে হয়, চারিদিকের সেই ঘনীভূত অন্ধকারের ভেতরে একটা অশরীরি প্রেতচ্ছায়ার মত তাকে কেন্দ্র করেই নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পরিক্রমা করে মন্দার! শত্রু পরিবেষ্টিত প্রতিকূল পরিবেশ থেকে সে যেন তাকে সযত্ন প্রহরায় সতত রক্ষা করে চলেছে। তার মনের গভীরে অদৃশ্য সেতারের করুণ রাগিনীর মত ঝঙ্কৃত হতে থাকে একটা—একটা মাত্র নাম—

মন্দার!

দীর্ঘ ত্রিযামা রজনী সে বিনিদ্র যাপন করে। কেন—কেন আসেনা মন্দার। সে বিষকন্যা বলেই কি হীনমন্যতার সেই নিদারুণ ধিক্কারে তার সম্মুখবর্তী হচ্ছে না। গুরুদেবের কামসূত্রে তো আছে দেহাতীত প্রেম স্বর্গীয়। তার দেহের প্রতিটি ধমনীতে রক্তপ্রবাহ চঞ্চল হয়ে ওঠে, প্রতিটি নগরে, জনপদে, পল্লীতে তাকে সে অন্বেষণ করবে।

একদিন একটা খণ্ডবিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করে প্রত্যাবর্তনের পথে চন্দ্রগুপ্ত জয়স্কন্ধাবার স্থাপিত করল নগরীর উপকণ্ঠে এক নির্জন প্রান্তরে। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এল। সহস্র মশালের দীপ্তিতে সেই বিজন প্রান্তর আলোকিত হয়ে উঠল। স্বর্ণখচিত চন্দ্রাতপের নীচে উপবেশন করে মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত সেনানায়কদের সঙ্গে পরবর্তী রণঅভিযান প্রসঙ্গে আলোচনায় নিমগ্ন। অদূরে চন্দ্রগুপ্তের রণক্লান্ত হস্তিনী চন্দ্রলেখা হৃষ্টচিত্তে পর্বত প্রমাণ কদলী বৃক্ষ ভক্ষণ করছে। চন্দ্রলেখার চালক দেববর্মা ও কারুশিল্পী বিরোধগুপ্ত (রাজধানী কুসুমপুর থেকে জয়স্কন্ধাবার ষোলো যোজন ব্যাপী পথে ষোলটি বিজয় তোরণ নির্মাণের দায়িত্ব যার ওপর অর্পিত ছিল) নিম্নকণ্ঠে কিসের প্রসঙ্গে যেন বাক্যালাপ করছিল। এমন সময় তারা অদূরে শাল্মলী তরুর নীচে শুষ্ক পত্ররাশির ওপরে কার পদশব্দ শুনে সচকিত হয়ে উঠল। স্তব্ধ হয়ে গেল তাদের কথা। অস্ফুটকণ্ঠে বিরোধগুপ্ত বলল, খুব সতর্ক থেকো দেববর্মা।

পলে পলে রাত্রি গভীর হলো। নির্বাপিত হলো বিভিন্ন শিবিরের

আলোকমালা! তার অরাতি সৈন্যরা সুপ্ত, সুপ্ত বিশ্বচরাচর। শুধু তরুণ নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত তার শিবিরের সম্মুখ প্রাঙ্গনে একাকী পদচারণা করছিল। তার মনে হলো, নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই জনপদেরই হয়তো কোন গৃহ কোণে কি কোন জীর্ণ দেবায়তনে নিশ্চয়ই সঙ্গোপনে অবস্থান করছে মন্দার!

মন্দারের কথা মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিকভাবে শিহরিত হয়ে উঠল মগধেশ্বরের চোখের দৃষ্টি। দূরে—বহুদূরে ঘনপল্লবিত কণ্টকতরুর মধ্যস্থিত ঝোপের ভেতরে একটা প্রদীপ জ্বলছে! সেই প্রদীপ্ত আলোকশিখা কখনো ঊর্দ্ধে উঠছে, কখনো মণ্ডলাকারে আবর্ত্তিত হচ্ছে! নিশ্চয়ই কোন গুপ্তচর! আলোক সঙ্কেতের সাহায্যে শত্রুকে সংবাদ প্রেরণ করছে। সঙ্গে সঙ্গে উল্কার গতিতে সেই আলোকশিখা লক্ষ্য করে অশ্বারোহণে ধাবমান হলো চন্দ্রগুপ্ত।

উচ্চশীর্ষ কণ্টক তরুতে আচ্ছন্ন এবং মহাকালের করালগ্রাসে বিধ্বস্ত একটি শিবমন্দিরের সমীপে অশ্বের গতিবেগ সংযত করল চন্দ্রগুপ্ত। পশ্চাৎ থেকে বিস্ময়াভিভূত হয়ে লক্ষ্য করল, আলুলায়িতকুন্তলা এক শ্বেতবসনা রমণী দূরে তারই শিবিরের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে জ্বলন্ত প্রদীপ্ত আন্দোলন করছে!

কে তুমি?

বিদ্যুৎ বেগে রমণী মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। তাই হস্তস্থিত প্রদীপের আলোয় তাকে চিনতে পেরে তীব্র উত্তেজনায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলল—মন্দার!

তুমি—তুমি এসেছো যুবরাজ—আলোকসঙ্কেতে তোমাকেই আহ্বান করছিলাম প্রিয়—

আমি তোমাকে কত দিন ধরে কত জায়গায় অন্বেষণ করেছি মন্দার, বলতে বলতেই চন্দ্রগুপ্ত উচ্ছ্বসিত আবেগে তাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বেষ্টন করে বলল, মন্দার, তোমারই জন্য আজ আমি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছি—মন্দার—তোমাকে—তোমাকে আমি পরমভট্টারিকার সম্মান দেব, এই বলেই তার মুখাবয়বে যেই চুম্বন অঙ্কিত করতে উদ্যত হলো—

না—না—যুবরাজ আমাকে স্পর্শ করোনা—বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত নিরাপদ ব্যবধানে সরে এসে তীব্র যাতনায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, তুমি—তুমি তো সব জানো প্রিয়তম—স্বচোক্ষে কি প্রত্যক্ষ করোনি পর্বতকের করুণ পরিণতি; শ্রবণ কি করোনি গজাধ্যক্ষ চন্দ্রভানু—

আমি ওসব বিশ্বাস করি না দয়িতিকা। আমি প্রত্যক্ষ করেছি—আমার

প্রতি গভীর প্রণয়বশতই তুমি গুরুদেবের সমীপে কামকলার পাঠ নিয়েছো। অনন্তর বন্ধকী হয়ে আমারই শত্রু নিপাত করেছো—

ক্ষনকাল স্তব্ধ হয়ে রইল মন্দার। অগণিত নক্ষত্রখচিত নিশীথ রাত্রির বিপুলব্যপ্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলল, কোন প্রতিবন্ধক যদি না-ই থাকবে তাহলে তোমার সান্নিধ্যে আসতে পারি না কেন—

গুরুদেবের মুখে শ্রবণ করেছি বটে, সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধি রাক্ষসের নির্দেশে তোমাকে মৃত্যুঘাতী বিষকন্যায় পরিণত করেছে—কিন্তু মন্দার মানবী কখনো বিষকন্যা—

হয়—প্রিয়তম—হয়, জীবসিদ্ধি পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক। সে মন্ত্রবলে না পারে এমন কিছু নেই—সে জীবিত থাকলে হয়তো বা এই ভয়াবহ অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হতাম। কিন্তু কুসুমপুরের সংঘর্ষে সে নিহত হয়েছে—উদ্গত ক্রন্দনের আবেগে বিকৃত কণ্ঠে বলল মন্দার, আমি—আমাকে দুরপনেয় এই মৃত্যুবিষ বহন করে বিষাক্ত সরীসৃপের মত বেঁচে থাকতে হবে—

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে চন্দ্রগুপ্ত বলল, তাহলে কেন—কেন আমার প্রতি এত অধিক প্রণয়াসক্ত হলে মন্দার—

রাজপুরীতে সেই শৈশব থেকেই তোমাকে দেখে আমার কেন যেন মনে হতো, একদিন তুমি আসমুদ্র হিমাচলের অধীশ্বর হবে, বুকের ভেতরে প্রবল রোদনোচ্ছ্বাসকে সংযত করে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, তোমার যজ্ঞীয়-অশ্ব উত্তরাপথে ও দক্ষিণাপথে সমান অপ্রতিহত থাকবে, আর—

আকস্মিক স্তব্ধ হয়ে গেল মন্দার! দূরে ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন প্রান্তরের দিকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিবিড় সুখস্বপ্নে নিমগ্ন হয়ে আবার বলল, তুমি তো জানো না প্রিয়তম, বারাঙ্গনাদের ভেতরে এমন এক শ্রেণী থাকে যারা শুধু নিষ্কাম প্রীতি ও যশের জন্যেই নায়কের প্রতি আকৃষ্ট হয়! গুরুদেবের কামসূত্রে তাই বলছে—প্রীতি যশোহর্থাস্তু গুনতোহধিগম্যা*

চন্দ্রগুপ্ত যেন বাক্‌শক্তিহীন হয়ে গিয়েছে। নিশীথ রাত্রির সেই মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে পূজার্থিনীর মত শ্বেতবসনাবৃত মন্দারের দিকে শ্রদ্ধায় অভিভূত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার মনে হল, ধূলিমলিন এই পৃথিবীর মৃত্তিকা থেকে সংসারের ক্লেদ পঙ্কিলতার গ্লানি থেকে অনেক—অনেক উর্দ্ধে উদার, মহৎ আর অবারিত এক অজানালোকে দেবীর মহিমায় বিরাজ করছে মন্দার। তবুও—তবুও

*কামসূত্র—বাৎসায়ন—ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ বসু অনূদিত পৃঃ ১৪৬

দুর্বার কামনার বশবর্ত্তী হয়েই চন্দ্রগুপ্ত নিতান্ত বালকের মত বলল, অঙ্কশায়িনী না হয়, না-ই হলে তবুও তুমি চলো মন্দার। রাজপুরীতে থাকবে আর প্রদীপ্ত আলোকবর্ত্তিকার মত আমাকে দুরুহ রাজকার্যে প্রেরণা—

তা হয় না প্রিয়তম, আমি মানবী তো সুস্বাদু পানীয় জলের ভেতরে আকণ্ঠ নিমগ্ন থেকেও তৃষ্ণা নিবারণ করতে সক্ষম হবো না—ধীর পদক্ষেপে তার কাছে এসে রুক্ষ কেশভারপূর্ণ মস্তক যুবরাজের বক্ষোদেশে ন্যস্ত করে আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে বলল, বিধ্বস্ত এই দেবায়তনের কোণে থেকে দেবাদিদেবের পূজা অর্চনা করে আর দুর থেকে তোমার কল্যাণ কামনা করে যেমন জীবন অতিবাহিত করছি তেমনি করবো প্রাণাধিক—গভীর তৃপ্তির আবেশে ক্ষণকাল নয়ন মুদিত করে থেকে হঠাৎ যেন ভাবাবেগ দ্রবীভূত করে বিচক্ষণ আমাত্যের ন্যায় গম্ভীর কণ্ঠে বলল মন্দার, প্রিয়তম, এখন শোনো প্রদীপ সঙ্কেতে তোমাকে কেন আহ্বান করেছিলাম—

কেন দয়িতিকে?

তোমার এই জয়াস্কন্ধাবারের অনুচরবর্গের ভেতরে তোমার শত্রু আছে প্রিয়তম! তারা তোমার প্রাণনাশের চক্রান্ত—

তরুলতিকার মত মন্দারের বরতনুকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে চন্দ্রগুপ্ত বলল, বিরোধীদের প্রত্যেককে শূলদণ্ড দিয়েছে গুরুদেব। আর এই যতক্ষণ আছে—বলেই কোষবদ্ধ তীক্ষ্ণধার তরবারির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, তোমার যুবরাজের কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে সক্ষম হবে না মন্দার—

তবুও তুমি সতর্ক থেকো প্রাণাধিক। দূরে-বহুদূরে কৃষ্ণবর্ণ পাথরের মত জমাট অন্ধকারের ভেতরে শ্বেত বস্ত্রাবৃত প্রেতচ্ছায়ার মত শিবিরগুলোর দিকে নিরীক্ষণ করে কেন যেন বলল, তোমার প্রধান কারুশিল্পী বিরোধগুপ্ত, না—কে—সে কোথায়?

কেন? সে ষোড়শ যোজন পথে ষোড়শ তোরণ নির্মাণের কাঁজে গিয়েছে, বিস্মিত হয়ে বলল, তুমি তার কথা কেন বলছো—

তোমার হস্তীচালক লোকটা কেমন?

কেন—কেন? কৌতূহলের যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে চন্দ্রগুপ্ত বিকৃত কণ্ঠে বলল, তুমি এদের কথা কেন বলছো—

প্রাণাধিক, ষোড়শ তোরণে সুসজ্জিত এই পথে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন না করলে হয় না?

বিদ্রোহ দমন করে বিজয়ী হয়ে মগধেশ্বর যাবে তস্করের মত সংকীর্ণ গলিপথে? তুমি বলছো কি মন্দার—

উত্তম! বীরোচিত উক্তিই করেছো, বলেই চন্দ্রগুপ্তের চরণে মস্তক রেখে প্রণাম করে বলল মন্দার, প্রিয়তম—এইবার আমাকে বিদায় দাও—নিকষ অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল মন্দার।

আর—

আর সেই নিশিবসানেই ঘটে গেল দুর্ঘটনা। ব্রাহ্মমুহূর্তে যখন বিগত রজনীর অন্ধকার বৃক্ষশ্রেণীর ডালে ডালে কৃষ্ণবর্ণ বায়সের মত আন্দোলিত হচ্ছিল তখন মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করে যে মুহূর্তে প্রথম বিজয় তোরণ অতিক্রম করতে উদ্যত হলো অমনি হস্তিনী চন্দ্রলেখার চালক দেববর্মা হস্তিচালনার স্বর্ণদণ্ড উর্দ্ধে তুলে ধরল। চন্দ্রলেখা ভীত হয়ে তীরবেগে যেই দৌড়াতে যাবে অমনি দুই হস্ত প্রসারিত করে তার গতিরোধ করে হৃদয়-বিদারক কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল এক রমণী, তোরণের নীচ দিয়ে যেও না—যেও না—হস্তীপৃষ্ঠ থেকে শীঘ্র অবত—

কিন্তু হস্তিনী উন্মত্ত বেগে তাকে পায়ের নীচে নিপিষ্ট করে চোখের নিমেষে যেই সেই বিজয়তোরণ পার হতে গেল অমনি তীক্ষ্ণধার খড়্গযুক্ত যন্ত্র তোরণ* নেমে এসে মুহূর্তে দেববর্মার শির ছিন্ন করল। তখনও তার দক্ষিণ হস্তের দৃঢ় মুষ্টিতে আবদ্ধ স্বর্ণদণ্ডের ভেতরে লুক্কায়িত ছুরিকা! আর পুষ্পরাশিতে সজ্জিত সেই তোরণের অভ্যন্তর থেকে গুপ্তঘাতক বিরোধগুপ্ত ভূতলে ঝম্ফ প্রদান করে যেই পলায়ন করতে প্রচেষ্টা করল অমনি চন্দ্রগুপ্তের দশবারো জন সশস্ত্র দেহ-রক্ষী তাকে চক্রাকার ব্যূহ রচনা করে বন্দী করল। তড়িৎগতিতে হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে দ্রুত পদবিক্ষেপে সেই রমণীর সমীপে যেয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত—একী—মন্দার—তুমি!

চোখের পলকে যেন ঘটে গেল প্রলয় কাণ্ড! বলশালী হস্তিনীর বলিষ্ঠ

---

* প্রাচীন যুগে গুপ্তহত্যার বিচিত্র এক প্রক্রিয়া। বিজয়তোরণের ভেতরে লুকিয়ে রাখা কপিকলযুক্ত খড়্গ বসানো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তোরণকে যন্ত্রতোরণ বলা হতো। এখানে পরিকল্পনা ছিল, মাহুত তার হস্তীচালনার স্বর্ণদণ্ড থেকে ছুরি চন্দ্রগুপ্তের বুকে বসিয়ে দেবে এবং ওপর থেকে সেই মুহূর্তে যন্ত্রতোরণ ছেড়ে দেবে বিরোধগুপ্ত।

অতিকায় পদসমষ্টির পেষণে নিষ্পেষিত মন্দারের বিকৃত দেহটা সযত্নে ক্রোড়ে ধারণ করে তার রক্তাক্ত ও বিধ্বস্ত মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আহ্বান করল চন্দ্রগুপ্ত মন্দার—মন্দার—

বহু-বহুদূর থেকে ক্ষীণ অস্ফুট কণ্ঠে বলল মন্দার, তোমার কোলে আমাকে মরতে দাও প্রিয়তম—জন্মান্তরে তোমার সঙ্গে আবার—

শ্বেতকমলিনীর মত মন্দারের বিগতপ্রাণ দেহটা চন্দ্রগুপ্তের ক্রোড় মধ্যেই শিথিল হয়ে গেল।

প্রস্তরমূর্তির মত বসে রইল তরুণ মগধেশ্বর।

সর্বসাক্ষী আকাশে সূর্যোদয় হলো। নিত্যদিন যেমন হয়।

পঞ্চম স্তবক

পঙ্কিল জীবনের অন্ধকারে থেকেও নগরশোভনা বিদুষী আয়ুর্বেদবিশেষজ্ঞ রূপজীবিনী একজনকে খ্যাতির আলোকোজ্জ্বল রাজ্যে পৌঁছে দিয়েছিল—

গভীর রাত্রি।

জনহীন রাজপথ।

সেই নিথর স্তব্ধ রাজপথ ধরে চলেছে এক অপূর্ব সুন্দরী নারী। তার তন্বী দেহে স্বাস্থ্য ও যৌবন জেগে আছে প্রখর হয়ে। বল্লরীর মত দীর্ঘ ছন্দিত দেহ পেঁচিয়ে পরেছে জরির চুমকি বসানো নীল মেঘডম্বুর শাড়ি। নীলাভ রঙের মাঝখানে তার শুভ্র দেহরেখা বিজুলী চমকের মত ঝকমক করছে। বিশাল কালো গম্বুজের মত খোঁপায় পরেছে শ্বেতকরবীর মালা। মনিবন্ধে, কণ্ঠে শোভা পাচ্ছে সুগন্ধী পুষ্পের অঙ্গহার। আলতারাঙা পা দুটিতে কিন্তু নুপূর নেই। নুপুর-নিক্কনের ধ্বনি নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতাকে বিঘ্নিত করবে। ব্যাঘাত করবে সুষুপ্ত মহানগরী রাজগৃহের নাগরিকদের বিশ্রামসুখকে। তাই মধ্য-রাত্রির বাতাসে মৃদু সুগন্ধ ছড়িয়ে সে মরালীর মত ধীরগতিতে চলেছে। চলেছে নগরপ্রান্তে রত্নগিরি পাহাড়ের নীচে একটি কুটিরে।

কিন্তু এখন রাত্রি মধ্যযাম। এখন রুদ্ধদ্বার গৃহে প্রিয়ার কণ্ঠলগ্ন হয়ে সুখস্বপ্ন দেখছে রাজগৃহের নাগরিকেরা। শুধু প্রজ্জ্বলন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ খচিত কৃষ্ণারাত্রির আকাশ যেন বহুকালের প্রাচীন পৃথিবীটাকে সতর্ক প্রহরীর মত অতন্দ্র প্রহরা দিয়ে চলেছে। দূরে বৈভারগিরি আর বিপুলগিরির গায়ে নিবিড় অরণ্যে হিংস্র শ্বাপদের চলাফেরার আওয়াজ স্পষ্ট শ্রুতিগোচরে যাচ্ছে। এই অসময়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে কেন যাচ্ছে রত্নগিরির নীচে সেই দীন দরিদ্র কুটিরে।

কেন যাচ্ছে—কেন যেতে হয়! সে কথা ভেবে তার কাজলপরা আয়ত চোখদুটো জলে ভরে আসে। বুকের ভেতরে নিদারুণ একটা জ্বালা পাক দিয়ে ওঠে। আর তীব্র অস্বস্তিতে কেমন অসাড় হয়ে আসে তার চেতনা। এক একবার তার মনে হয়—মনে হয়, কি হবে, কী লাভ সেই ভুল ভালবাসার অফলের কথা ভেবে? বিগত দিনের যে রঙীন স্মৃতি তার জীবনের সহস্র উচ্ছৃঙ্খল রাত্রির কালো অন্ধকারে হারিয়ে গেছে—তাকে খুঁচিয়ে বের করার কি দরকার? কিন্তু—

পারে না। যাবো না—যাবো না করেও যেতে হয়। রাত যেই গভীর হয়, সেই নিথর স্তব্ধতার ভেতরে তলিয়ে যায় চারিদিক, তখুনি—ঠিক তখুনি যে কোন অশরীরী প্রেতাত্মা তাকে ঘাড় ধরে বের করে নিয়ে আসে নিশীথ-রাত্রির বিজন আর প্রেতলোকের মত ঘন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন রাজপথে।

কিন্তু সে যখন অভিশপ্ত একটা মূর্তির মত জমাট অন্ধকারের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে, নিঃশব্দ পায়ে সেই জীর্ণ কুটিরে যায়, তখন তার সুরম্য অট্টালিকা সহস্র দীপাধারের আলোয় ঝলমল করে। অলিন্দে অলিন্দে দোলে সুগন্ধী পুষ্পবলয়। ধাতব ধূপদানী থেকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওঠে ধূপের মৃদু সুগন্ধ। আর বাইরে রাজপথে আলোয় উজ্জ্বল তার প্রাসাদের প্রধান তোরণের সামনে শত শত সুদৃশ্য পাল্কী, গোযান আর অশ্বশকটের ভীড় জমে ওঠে। দূরদূরান্তর থেকে আসে তার দর্শনার্থীরা। আসে সুবেশ সুন্দর সুবর্ণশ্রেষ্ঠীর দল, আসে উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীরা, আসে ঐশ্বর্যশালী বণিকরা—আসে আরও আমিষলোভী কামুকের দল। তাদের বীভৎস পদশব্দ বাজতে থাকে ঠিক তার গবাক্ষের নীচে। আর জনতার ভীড়ের ভেতর থেকে সমবেত ধ্বনি ওঠে—আমরা একবার—মাত্র একবার ভেতরে যেতে চাই—

বাতায়নের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

আলোকিত গবাক্ষের সেই পথে একটা মুখের রেখা উঁকি দেয়।

ওই যে দেখা দিয়েছে—দেখা দিয়েছে রে—উৎসুক জনতার ভেতরে উল্লাসের ঝড় ভেঙে পড়ে। কিন্তু ওপর থেকে তার প্রধান পরিচারিকা মদনিকার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা যায় ভদ্র, আমাকে মার্জনা করুন, আপনারা অনুগ্রহ করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করুন—

কেন—কেন ?

সে কি নেই ?

সারা সন্ধ্যে প্রতীক্ষা করে শেষ পর্যন্ত—মর্মান্তিক আর তীব্র ক্ষোভে আর কিছু বলতে পারে না। আবার হয়তো কোন ধনকুবের কামনার জ্বরে কাতর হয়ে চিৎকার করে বলে, তার এক রজনীর ভাটী এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে এসেছি—তার ওপরে আরও কত আরও কত—

না-না-ভদ্র অর্থের হেতু নয়—আমাদের পরমভট্টারিকা নগরশোভনার দেহে প্রবল জ্বর। জ্বরে একেবারে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে তার সোনার অঙ্গ—

আহা—আহা, তাই নাকি! কামী পুরুষদের চোখে ব্যথার ছায়া ফুটে

ওঠে। তাদের মনের ভেতরে ভেসে ওঠে রূপরম্যা এক নারীর অনিন্দ্যসুন্দর ছবি। তার প্রতিমার মত সুডৌল মুখে অসুস্থতার ছাপ পড়েছে! জ্বরের যন্ত্রণায় কাতর আর্তনাদ করছে"!

আমরা একবার—একবার দেখতে পারি—জনতার ভেতর থেকে অত্যন্ত উৎসাহী কেউ কেউ চিৎকার করে বলে। মদনিকা কড়জোড়ে অনুরোধ জানায় —না—না ভদ্র, বৈদ্য নিষেধ করেছেন—

জনতা বিদায় নেয়। কামনার অনলে দগ্ধ হয়ে যারা দুরদুরান্তর থেকে এসেছিল তারা রাজগৃহের সুন্দরী পণ্যাঙ্গনার জন্য ভগবানের কাছে আকুল হয়ে প্রার্থনা জানাতে জানাতে চলে যায়।

ওদিকে অসময়ে রত্নগিরি পাহাড়ের নীচে সেই জীর্ণ কুটিরের দরজায় মৃদু করাঘাত বেজে ওঠে টক্—টক্—টক্—

কে?

আমি শালবতী। দরজা খোলো—

রাজপ্রাসাদের দাসী অভ্যা বেরিয়ে আসে। তার ঘুমজড়ানো দুটো চোখের দৃষ্টি চমকে ওঠে—নিশিরাতের অন্ধকারের পটভূমিতে জ্যোৎস্নার রেখার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে সুঠাম তনু এক নারীমূর্তি।

তুমি আবার এসেছো?

কি করবো বল অভ্যা। একবার—একবার শুধু দেখতে দে। শালবতীর কথাগুলোর ভেতরে কান্নার আভাস ফুটে ওঠে।

অভ্যা কথা বলে না। কিন্তু তার খরদৃষ্টি যেন রাজগৃহের পণ্যবধূর রূপধন্যা তন্বী স্বর্ণলতার মত দেহের সর্বত্র চাবুকের মত ছুঁযে ছুঁযে যায। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে মৃদুকণ্ঠে বলে, তোমাকে কতবার বলেছি, পুরানো জীবনটাকে ভুলে যাও—তোমার ক্ষতি হবে—ক্ষতি হবে ওর—

উপদেশ দিস না অভ্যা। আমি থাকতে পারি না বলেই আসি, শালবতীর চোখদুটো ফেটে জল এসে পড়ে।

রাগে থম থম করে অভ্যা। বলে, কি জানি বাপু—তোমার এই আদিখ্যেতা আমি বুঝি না। অভিশাপ উচ্চারণ করার মত করে বলল, তুমি ওর সর্বনাশ ডেকে নিয়ে আসছো!

কী! শালবতীর রক্তের ভেতরে ভয় শিহরিত হয়ে ওঠে। হাহাকার করে ওঠে বুকের ভেতরটা! একবার—একবার দূর থেকে চোখের দেখা দেখলে ওর

সর্বনাশ হবে—ক্ষতি হবে। তাহলে থাক—

কিন্তু তার সমস্ত সত্বা আর্তনাদ করে বলে উঠল, না দেখে ফিরে গেলে তুমি একমুহূর্তের জন্যেও শান্তি পাবে না—

তুই ওকে দেখিয়ে দে অভ্যা একবার—মাত্র একবার, নীচের ঠোঁটটা শক্ত করে কামড়ে ধরে ভেতরে ভেতরে অসহ্য আর তীব্র একটা যন্ত্রণা বুকে চেপে সহ্য করে কেমন শীতল গলায় শালবতী বলল, আর কখনো আমি আসবো না—

অভ্যা ভেতরে গেল।

না। দ্বার নয়। বাতায়ন উন্মুক্ত করল আর সেই গবাক্ষ পথে নজরে পড়ল, শয্যার ওপরে রক্তপদ্মের পাঁপড়ির মত গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে দশএগারো বছরের এক কিশোর। শেষরাতের তরল অন্ধকারে তাকে একটা সুদূর স্বপ্নের মত মনে হল শালবতীর। কেন যেন দুরুদুরু কেঁপে উঠল তার বুকের ভেতরটা। গভীর একটা মমতার অনুভূতি তার অন্তরের প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে ঝরণার মত প্রসারিত হয়ে সেই কিশোরের নাক, কান,মুখ চোখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল। আর একটু একটু করে অসাড় হয়ে এল তার চেতনা। তার মনে হল, সে যেন ভারী, অনড় একটা পাথরের মত অতল শূন্যতার ভেতরে তলিয়ে যাচ্ছে!

ওাক! তোমার কি হয়েছে—তুমি ওরকম করছো কেন?

কিছু না—কিছু না অভ্যা—ডুবন্ত মানুষের মত যেন অনেক অনেক দূর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল শালবতী, তুই জানলাটা বন্ধ করে দে—আর—আর—তার বাদবাকী কথাগুলো কান্নার ভেতরে তলিয়ে গেল।

তুমি ওর সর্বনাশ করছো, শেষরাতের বাতাসে তার কানের কাছে অভ্যার সতর্কবাণী বাজতে লাগল। দুর্বল আর অসুস্থ মানুষের মত ধীর পায়ে টলতে টলতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করছে শালবতী। দূরে বিপুল গিরিশৃঙ্গের জমাট অন্ধকারে আগুনের ফুলের মত ফুটে থাকা একটা আলোর দিকে নজর পড়ল। থমকে দাঁড়ালো সে। যাবে নাকি ওখানে?

তার মনের ভেতরে ভেসে উঠল গৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন এক পুরুষের ছবি। প্রশান্ত মুখে স্মিত হাসি। টানা টানা দুটো নীলাভ চোখে কী গভীর স্নেহচ্ছায়া! মুখের দুটো কথা শুনলেও মন জুড়িয়ে যায়। তাঁর কাছে যেতে লোকের অসুবিধা হয়, তাই মহারাজ বিম্বিসার পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ি কেটে দিয়েছেন।

সিঁড়িতে কয়েক ধাপ উঠেই আবার নেমে এল শালবতী। হীনমন্যতায় ছেয়ে গেল তার মন। সে বারভোগ্যা। সে পণ্যাঙ্গনা। সে হলো জলের ঐশ্বর্যে ভরা দীর্ঘিকা। সে-জলে বিদ্বান, ব্রাহ্মণ এবং অতি নিকৃষ্ট মূর্খও স্নান করে।

সে—লতা।

নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের অধিকারী ময়ূর তাকে অবনত করে আবার একটু পরে কালো কুৎসিত কাকের দল এসে তার ওপর নৃত্য করে।

সে—নৌকা।

যে নৌকাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য পার হয় সেই নৌকাতেই অতি ইতরবর্ণও পার হয়। সে কি করে বিপুল গিরিশৃঙ্গে ভগবান বুদ্ধের কাছে যাবে?

তার গৃহের দিকে প্রত্যাবর্তন করতেও মন চাইল না। সেখানে তারই এই দেহ-পণ্য বিক্রয়ের মূল্যে থরে থরে সাজানো তার বিপুল ঐশ্বর্য, সুগন্ধী ধূপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, সহস্র স্বর্ণ প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল তার নৃত্যস্থলী, সেখানে অপেক্ষমান কামুক জনতা, প্রধানা পরিচারিকা মদনিকার বিক্ষোভ এইসব যেন তাকে বিষধর সর্পের মত পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে তার গতিকে রুদ্ধ করে দিল। সে বৈভারগিরির নীচে উষ্ণ প্রস্রবনের সামনে বসল।

আকাশে ভোরের রেখা ফুটছে। কিন্তু তখনও নাগকেশর আর শিরিষের শাখায় শাখায় অন্ধকার আন্দোলিত হচ্ছে বাতুলির মত।— সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নানার্থীর দল দূরদূরান্তর থেকে আসছে উষ্ণ প্রস্রবনে। সে রাজগৃহের নৃত্যগীত পটিয়সী বারাঙ্গনা। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে তাকে চেনে। সহস্র প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। তাই নাগকেশর বৃক্ষের অন্তরালে চলে গেল। অকস্মাৎ ভোরের শান্ত স্তব্ধতার ভেতরে শিবস্তোত্রের গম্ভীর মধুর সুর কানে এল।

উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং
ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।
ধ্যাত্মা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং
সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ।

স্তোত্রের দূরাগত সেই সুমধুর মেঘমন্দ্র ধ্বনি তার স্নায়ুকে কেমন অবশ করে দিল। আর একটু পরেই তরল অন্ধকারের পটভূমিতে আর একটু নিকষ-কালোর ইঙ্গিত নিয়ে আবির্ভাব হলো এক সুঠামদেহী দীর্ঘপুরুষের। ব্রাহ্মমুহূর্তের শীতল বাতাস কেন যেন অকস্মাৎ তার ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত মনে হল। উষ্ণ হয়ে উঠল তার কানের পিঠদুটো। আর সেই—সেই বহুবছর আগে এক উদ্দাম

ভালবাসার ভুল অক্ষরের দুঃস্মৃতি ঝরাফুলের বিবর্ণ পাপড়ির মত তার উত্তপ্ত চিন্তাস্রোতে ভেসে ভেসে তার মনের ঘাটে এসে লাগল—

ধন্বন্তরি।

শিবস্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে যিনি স্নানে চলেছেন তিনি আর কেউ নয়, আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ স্বনামধন্য ধন্বন্তরি! অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ ওর নখদর্পনে। শল্য চিকিৎসায় তার জুড়ি মেলা ভার। উনি স্বয়ং মগধাপতি মহারাজ বিম্বিসারের চিকিৎসক। তাঁর এসব—এসব অতুলনীয় কীর্তির কথা তার যত মনে হতে লাগল ততই তার ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি ক্ষুরধার ছুরির মত ঝিকমিক করতে লাগল। কিন্তু—

সে আর দাঁড়াল না। স্নান সমাপন করে ফেরার পথে দেখে ফেলতে পারে। না—না তার মুখোমুখি সে হতে চায় না, হতে পারবে না—

ধূপছায়ার মতো সন্ধ্যা নামছে। রাজগৃহের প্রান্তে আম্রপালীর উদ্যানে শালবতীর আলোকজ্জ্বল প্রাসাদ। প্রধান তোরণে নহবত বসেছে। সানাইয়ে বেহাগের সুর বাজছে। ভেতরে আম্রপল্লব আর সন্ধ্যামালতীর বলয় দিয়ে সুসজ্জিত দীর্ঘ গলি অতিক্রম করে গেলেই ঘন সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ এক উদ্যান। সমগ্র প্রাঙ্গন জুড়ে রত্নখচিত রঙীন চন্দ্রাতাপ লম্বিত হয়ে রয়েছে। তার নীচে ইতস্ততঃ এক একটা সুদৃশ্য তক্তাপোষের ওপরে রঙীন জাজিম পাতা রয়েছে। তার ওপরে বসে কোন একদল পাশা খেলছে, কোন দল দাবার গজ আর নৌকোর চাল নিয়ে মেতে উঠেছে। আবার কোথাও জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে গভীর গবেষনা চলেছে, কোথাও বিম্বিসারের রাজ্যশাসন প্রণালীর সমালোচনা ঝড়ের রূপ নিয়েছে।

আর এক জায়গায় আয়ুর্বেদীয় সংহিতার রচয়িতা ভরদ্বাজ এবং আত্রেয় তর্ক শুরু করেছে। আত্রেয় বলছেন আয়ুর্বেদে স্বর্ণ, পারদ ইত্যাদি নানা ধাতুর ব্যবহার এবং ক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন সুশ্রুত।

—না, কখনো নয়। চরক ও সুশ্রুতের অনেক পরে আয়ুর্বেদে ধাতুর ব্যবহারের প্রচলন হয়েছে।

বেশ ঠিক আছে, চলুন শালবতীর কাছে। আত্রেয় বললেন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তার প্রগাঢ় জ্ঞান নিশ্চয়ই আপনি স্বীকার করবেন। ভরদ্বাজ সম্মত হলেন।

কিন্তু আজ শালবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সহজ নয়। স্বয়ং মহারাজ বিম্বিসার এসেছেন তার কাছে। দুই প্রৌঢ় আয়ুর্বেদাচার্য ভরদ্বাজ আর আত্রেয় চলেছেন শালবতীর শয়নকক্ষ সংলগ্ন সুদৃশ্য নৃত্যস্থলীর দিকে। সেই বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন ছাড়িয়ে নাটমন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ বাঁয়ে রেখে কিছু—দূরে যেতেই কানে এল শত নটীর নূপুরনিক্কনের সুমধুর ধ্বনি। অত্যুজ্জ্বল উগ্র আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে সুবিশাল নৃত্যশালা। খর যৌবনবতী নর্তকীদের তন্বীদেহের লীলায়িত বিন্যাসে, ক্ষনে ক্ষনে বিভ্রমকারী বিভিন্ন মুদ্রার বৈচিত্র্যে তাদের উদ্দাম প্রাণের আবর্ত ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে! দর্শকদের চোখে মুগ্ধ অপলক দৃষ্টি। সভা আলো করে বসে আছেন, গীতশঙ্করের রচয়িতা মৈথিল ভম্ম মিশ্র। নাচগানের তালে তালে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন শালবতীর সঙ্গীতগুরু, গীতপ্রকাশের লেখক হরিভট্ট।

মগধাধিপতি বিম্বিসার এসেছেন। সেই উপলক্ষে মগধ তথা সমগ্র আর্যাবর্তের জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিজীবি সমাজ সমবেত হযেছে বিদূষী নগরসুন্দরীর গৃহে। এসেছেন রাগমঞ্জরী প্রণেতা পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল। এসেছেন নৃত্যবিদ ভরতাচার্য। এসেছেন সঙ্গীতসিদ্ধান্ত রচয়িতা রামানন্দতীর্থ। কিন্তু না— এখানেও তো নেই শালবতী!

ভরদ্বাজ আর আত্রেয় চলেছেন শালবতীর নয়নাভিরাম শয়নকক্ষের দিকে। কিন্তু আশ্চর্য! শয়নঘরের সুদৃশ্য রত্নখচিত মেহগিনির সেই দ্বার রুদ্ধ কেন? তাহলে—তাহলে কি শালবতী মহারাজের অঙ্কশায়িনী হয়ে গিয়েছে। ভরদ্বাজের দেহের ভেতরে যেন বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা পাক খেয়ে উঠতে লাগল। আর আত্রেয় ক্রুদ্ধ আক্রোশের একটা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল বন্ধ দরজার ওপারে। বারনারীকে মহারাজ একলা এত দীর্ঘ সময় যক্ষের মত আগলে রাখে কেন?

কিন্তু তখন স্বপ্নের মত নীলাভ আলোয় ভরা সুদৃশ্য প্রকোষ্ঠের ভেতরে তীব্র উত্তাপের রেশ ভাসছিল। মহারাজ বিম্বিসারের রক্তে রক্তে কামনার আগুন জলছিল। দৈত্যের মত প্রচণ্ড শক্তিতে শালবতীকে বুকের কাছে আকর্ষণ করছিল। আর করুণ ও ব্যাকুল কণ্ঠে শালবতী বলছিল—মাফ করুন মাফ করুন মহারাজ—আজ আমার শরীর ভাল নেই—

কিন্তু তখন বিম্বিসারের স্নায়ুতে স্নায়ুতে মত্ত ঝড় ভেঙ্গে পড়েছে। ক্ষিপ্র হাতে নামিয়ে দিল তার রেশমী শাড়ীর আঁচল। প্রায় স্বচ্ছ বক্ষবাসের বন্ধনে

আবদ্ধদুটো বিভ্রমের ছবি উন্মাদ করে তুলল বিম্বিসারকে! ঠিক সেই সময়—সেই সময় যখন বিম্বিসারের কামনায় উন্মত্ত বন্যার ভেতরে নিমজ্জন হওয়া ব্যতীত কোন গত্যন্তরই নেই তখন প্রখর বুদ্ধিশালিনী ও বিদুষী নগরশোভনা অকস্মাৎ বিচিত্র একটা কাণ্ড করে বসল—

তার অনাবৃত বক্ষোদেশের ভেতরে মহারাজের মাথাটা চেপে ধরল সজোরে। সেই যৌবনবতীর উদ্ধত কুচযুগলের মাঝখানে নিবিড় কবোষ্ণ সেই উপত্যকায় মুখ রেখে নেশাচ্ছন্ন মানুষের মত নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল মহারাজ। গভীর মমতায় তার মস্তকে হাত রেখে যেন বহু-বহু দূর থেকে ক্ষীন অস্ফুটকণ্ঠে বলল শালবতী, মগধাপতি আপনি আপনি আমাকে খুব—খু-উ-ব ভালবাসেন তাই না?

তোমার কি তাতে সন্দেহ আছে প্রিয়ে—

কিন্তু ঠিক এইমুহূর্তে দর্পনে যদি আপনার প্রতিকৃতি দেখতেন, তাহলে প্রত্যক্ষ করতে পারতেন, গভীর ভালবাসা আর মৃত্যুর ভেতরে কোন পার্থক্যই নেই মহারাজ—

কেন শালবতী? তুমি এসব কি বলছো!

আপনি চোখদুটো বুজে রয়েছেন, আপনার দেহ অসাড় হয়ে গিয়েছে, মৃত্যুও তো আমাদের এই পরিণতিতেই পৌঁছে দেয় মহারাজ—সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়াল বিম্বিসার। স্তব্ধ বিস্ময়ে শালবতীর গম্ভীর বিষন্ন মুখাবয়বের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, গভীর ভালবাসা আর মৃত্যুর ভেতরে কোন পার্থক্যই নেই! এ তুমি কি বললে? আর একবারও শালবতীর সেই অবারিত যৌবনশ্রীর দিকে নিরীক্ষণ না করে অবনত মস্তকে মন্থর পদক্ষেপে শয়নকক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল মগধেশ্বর। তার শুষ্ক অধরের রেখায় রেখায় কম্পিত হতে লাগল দৈববাণীর মত শুধু সেই কথাদুটো—গভীর ভালবাসা আর মৃত্যু—

গভীর ভালবাসা আর মৃত্যু!

গন্ধধূপের ধূমায় সুবাসিত সেই নির্জন শয়নকক্ষের রত্নপর্যঙ্কের ওপরে রাজেন্দ্রানীর মত বসে থেকেও মর্মান্তিক যাতনায় শালবতী নিজের মৃত্যু কামনা করতে লাগল। তার মরতে ইচ্ছে হলো সেও—সে-ই ভালবাসা, অবশ্য আর এক ধরনের আসক্তি আর এক ধরনের নিবিড় স্নেহের জন্যেই। রত্নগিরির নীচে সেই পর্ণকুটিরে ঘুমন্ত সেই কিশোরের জন্য নিঃশব্দ একটা কান্নার ঢেউ উঠল

তার বুকের ভেতরে ! নিবিড় করে ভালবাসাও যে কত দুঃখের—কত যন্ত্রণার —সেই শাশ্বত সত্যটি যেন শালবতী তার মর্মের ভেতরে অনুভব করল। প্রস্ফুটিত পদ্মকোরকের মত সেই নওল কিশোর যদি পৃথিবীর আলোয় চোখ না মেলতো, তাহলে অন্যান্য বারাঙ্গনার মত বাধাবন্ধনহীন প্রমত্ত জীবন যাপন করতে পারতো ! সেই বালকের নবারুনোপম সুন্দরপ্রভ মুখমণ্ডল অহর্নিশি যেন তার চেতনার ভেতরে জ্বল জ্বল করে অনির্বান নক্ষত্রের মত। আর তার সমগ্র সত্ত্বার ভেতরে বৃশ্চিকদংশনের একটা জ্বালা ছড়িয়ে পড়ে। তার অশ্রুসজল চোখের সামনে ভেসে উঠল স্বনামধন্য আয়ুর্বেদাচার্য ধন্বন্তরির প্রতিভাদীপ্ত মুখাবয়ব। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার ভেতরটা দাবদাহের মত নিঃশব্দে জ্বলে যেতে লাগল।

তোমার সঙ্গসুধাপান করতে চাই না—আমরা তোমাকে একবার দর্শনও কি করতে পারি না, আয়ুর্বেদসংহিতার প্রণেতা মহর্ষি আত্রেয়র বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হওয়া মাত্র শয়নকক্ষ থেকে থেকে বেরিয়ে এল শালবতী। সহাস্যে তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে এল তার মন্ত্রণাকক্ষে। ভরদ্বাজ বলল,ভদ্রে শালবতী তোমার মাতৃদেবী আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের আদিগুরু দৃঢ়বলের রক্ষিতা ছিলেন। তাই স্বভাবতই অতি শৈশব থেকে পরমশ্রদ্ধেয় দৃঢ়বলের সান্নিধ্যে থাকার ফলেই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদে তোমার—

আপনাদের বক্তব্য কি ভদ্র ? অনুগ্রহ করে সেই কথাটা শীঘ্র বলুন—

ভরদ্বাজ এবং আত্রেয় তাদের সমস্যার কথা ব্যক্ত করল।

শালবতীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখাবয়বে চিন্তার ছায়া ঘনীভূত হলো। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলল, আমার যতদূর মনে হয় বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের পরে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদে পারদ ও নানা ধাতুর ব্যবহার প্রচলন করেছিলেন অভিজ্ঞ আয়ুর্বেদাচার্য বাগভট্ট—

এবারে স্বকর্ণে শুনলেন তো ? ভরদ্বাজের দুচোখে গর্বের হাসি পরিস্ফুট হয়ে উঠল। শ্লেষ মিশ্রিত কণ্ঠস্বরে বলল, মহর্ষি আত্রেয় অনুগ্রহ করে আরও কিছুকাল অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করুন—

নবোদিত দিবকরের উজ্জ্বল কিরণে ঝলমল করছে আম্রপালীর নয়নাভিরাম উদ্যান। অকস্মাৎ বিপুল গিরির—ওপর থেকে বয়ে আসা উদ্দাম বাতাসের আর্তনাদ, উষ্ণ জলের নির্ঝরিনীর শব্দ স্তব্ধ করে দিয়ে দিগন্তে ধ্বনিত হলো বুদ্ধস্তোত্রে সুমধুর সুর—

ধর্মং শরণং গচ্ছামি

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

স্তোত্র গাইতে গাইতে চলেছে আম্রপালী বিদ্যায়তনের বিদ্যার্থীরা। পাহাড়ের পাদদেশে একটা পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো শালবতী। ওই তো—ওই তো ছেলেদের ভেতরে সবচেয়ে মাথায় উঁচু জীবককে দেখা যাচ্ছে।

জীবক—তারই অভিশপ্ত জীবনের বেদনার উপহার। শালবতীর চোখের দৃষ্টি অদৃশ্য চুম্বনের মত জীবকের মুখকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল।

দূরে বনের মাথায় সূর্য উঠে এসেছে। ছেলের দল চলে গিয়েছে দূরে। অদ্ভুত দুটো অলস চোখের দৃষ্টি তুলে তখনো তাকিয়ে থাকে শালবতী। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় ভারী হয়ে আসা তার চেতনা। সে ভাবে আর কয়েক মাস পরেই চতুষ্পাঠীর পাঠ শেষ হয়ে যাবে। তারপর—

আবার সেই জ্বালা—সেই অস্বস্তি তার মনে কাঁটার মত বিঁধতে থাকে। কয়েক মাস পর।

আয়ুর্বেদাচার্য ধন্বন্তরির শয়নকক্ষে পিলসুজের ওপরে মৃৎপ্রদীপ জ্বলছে। অন্ত্রাশয়ের একটা জটিল পীড়া তাকে চিন্তাকুল করে তুলেছে। অকস্মাৎ দ্বার-প্রান্তে মৃদু করাঘাত শুনতে পেলেন ঠুক—ঠুক—ঠুক—।

দরজা খুললেন। আর বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন—তুমি! আরে এস এস—

আপনার কাছে একটা আবেদন আছে, শালবতী মৃদু গলায় বলল।

আবেদন! বলো কি শালবতী, হস্তীকে বাঁধতে হয় স্তম্ভে মুখে লাগাম দিয়ে বাঁধতে হয় ঘোড়াকে, আর তোমাদের বাঁধতে হয় হৃদয়ে—আমি তোমাকে হৃদয়ে—

ঠিক বলেছেন তো আয়ুর্বেদাচার্য? শালবতীর চোখ দুটো সাফল্যের হাসিতে ঝিক করে ওঠে।

হ্যাঁ, তুমি তো আমার হৃদয়ে রাণীর মহিমায় বিরাজ করছো, কিন্তু—হঠাৎ থেমে গেলেন ধন্বন্তরি।

কিন্তু কি?

ইদানিং তুমি কেন যে আমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে, আমি বুঝতে—

আচ্ছা এখন শ্রবণ করুন ভদ্র, দরিদ্র, অনাথা বালককে আয়ুর্বেদের পাঠ দিতে হবে—ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে চোখের কোণা দিয়ে হেসে বলল, আপনাকে

উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেব—

কে, কার ছেলে কিছু শুনলেন না ধন্বন্তরি। সানন্দে রাজী হলেন। সেই শুরু।

শোন জীবক, মানুষের আয়ু কম। বোধশক্তি কম। নানাদিক থেকে মানুষের দুর্বলতা বড় বেশী—ধন্বন্তরি বলে।

এসব দেখে ভগবান ব্রহ্মার আয়ুর্বেদকে অষ্টভাগে ভাগ করেছেন—কি কি তন্ত্রে?

শল্যতন্ত্র, শালক্যতন্ত্র, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, বাজীকরণতন্ত্র—

নিশিথ রাত্রির প্রহরের পর প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

বৎস জীবক, শ্রবণ করো। মহর্ষি সুশ্রুত বিশেষভাবে জ্ঞান পেয়ে যা রচনা করেছিলেন তার নামই শল্যচিকিৎসা। শল্যতন্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে জীবক। পরম যত্নে তাকে চাদর দিয়ে আবৃত করে দেয় ধন্বন্তরি।

এক এক দিন গভীর রাত্রে শালবতী আসে। আসে সন্তর্পণে। জীবক যেন টের না পায়। খোঁজ নেয় তার পড়াশুনার। ধন্বন্তরী বলে, এরকম মেধাবী ছাত্র আমি খুব কম দেখেছি শালবতী—

শালবতীর মুখাবয়ব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবকের পরিচয় কি? নতমুখী হয়ে থাকে শালবতী। মৃদু অস্ফুটকণ্ঠে বলে দাসী অভ্যার পুত্র—

ছেলেটিকে আমার ভাল লাগে—তাই—কিন্তু আমার পারিশ্রমিক? আয়ুর্বেদাচার্যের চোখ দুটোয় উদগ্র কামনার লেলিহান অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়।

দেব, দেব—যেদিন জীবকের শিক্ষা সমাপ্ত হবে, সেইদিন—সেইদিন আপনার পাওনা মিটিয়ে দেব আয়ুর্বেদাচার্য—

দিন কাটে। মাস যায়। বছর ঘুরে আসে। পণ্যাঙ্গণা শালবতী, রাজগৃহের বেশ্যাকুলের ভূষণস্বরূপা শালবতীর নাগরের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ে। যেন উত্তাল খরস্রোতা নদীর মাঝখানে একটা দৃঢ় বংশদণ্ড। তার দুই পাশ দিয়ে উদ্দাম লালসার স্রোত বয়ে চলেছে।

তোমার কি হয়েছে বলতো? প্রধানা পরিচালিকা এবং সখী মদনিকা বলে বৃষ, অশ্ব ইত্যাদি যে কোন জাতীয় কামুক পুরুষের জন্য তোমার দ্বার অবারিত—সারারাত তোমার ঘরে লোক—

আমার অনেক—অনেক অর্থের দরকার মদনিকা।

নিয়মিত ধন্বন্তরির কাছে যায় শালবতী। বলে, ওকে শল্যচিকিৎসায় নিপুণ করে তুলুন ভদ্র। বাগ্‌ভট, চড়কের গ্রন্থ পড়ান—ধন্বন্তরি ছাড়াও ভরদ্বাজ, আত্রেয় আরও অন্যান্য আয়ুর্বেদাচার্যকে বেশি টাকা দিয়ে শিক্ষকতাকে নিযুক্ত করে।

দেখতে দেখতে জীবকের শিক্ষা সমাপ্ত হয়ে যায়। শল্যচিকিৎসায় অসাধারণ পারদর্শী হয়ে ওঠে সে। দিকে দিকে জীবক বৈদ্যের নাম ছড়িয়ে পড়ে। শালবতী বিপুল অর্থ ব্যয় করে মহাশৈল পাহাড়ের পাদদেশে জীবকের ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করে। দূর-দূরান্ত থেকে কাতারে কাতারে রোগী আসে।

সেদিন রাত্রে আকাশ ছিল ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন। টিপ টিপ বৃষ্টি ঝরছিল। ঠিক সেই সময়—সেই সময় ঘন অন্ধকারের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নিয়ে রাজপথ ধরে দুরভিসন্ধির মূর্তির মত চলেছিল একজন। সে শালবতীর সুরম্য প্রাসাদের সামনে দাঁড়ালো। প্রধান দ্বাররক্ষীর নিষেধ অমান্য করে ভেতরে গেল। চলে এল বারভোগ্যা নগরসুন্দরীর সামনে।

তুমি বলেছিলে পারিশ্রমিক দেবে। আর কতদিন—কতদিন বলতে বলতেই তার পর্বতের মত লঘু কোমল তনুদেহটিকে তার প্রশস্ত বক্ষোদেশে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে নিপিষ্ট করতে লাগল। আয়ুর্বেদাচার্য ধন্বন্তরির দুচোখে কামনার লেলিহান আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। উষ্ণ নিশ্বাসের প্রবাহে উঠানামা করছে তার বুক—

আঃ কি করছেন—কি করছেন আয়ুর্বেদবিশারদ দন্তঘর্ষণ করে বলল, আপনি আপনার নিজের কাজ—নিজের কর্তব্য করেছেন—কবিরাজমশাই—তার আবার পারিশ্রমিক—

মানে? আমার—আমার কাজ? অসামান্য নিষ্ঠার সঙ্গে জীবককে অষ্টাঙ্গআয়ুর্বেদ পড়িয়েছি—সেটা—

হ্যাঁ—জীবকের জন্ম আমার গর্ভে। আর আপনারই—বলতে বলতে তীব্র যন্ত্রণায় শালবতীর চোখদুটো অশ্রুসজল হয়ে এল। আর তার মনের ভেতরে ভেসে উঠল, তার এই দেহটাকে নিয়ে ধন্বন্তরির উন্মত্ত সম্ভোগের সেই দুঃসহ স্মৃতি। সেদিন তার অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে বারবিলাসিনীর বাধাবন্ধনহীন সুখের জীবনে এই লোকটা অভিশাপের বিষ ঢেলে দিয়েছিল······নতমুখে

নির্বাক হয়ে চলে গিয়েছিল শল্যবিদ ধন্বন্তরি।

একদা ধনেজনেসমৃদ্ধ, পূর্বভারতের সুপ্রাচীনকালের রাজধানী রাজগৃহ অর্থাৎ আধুনিককালের রাজগীরে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে, মহাশৈল পাহাড়ের পাদদেশে খড়গাইয়ের ভেতরে যষ্ঠিলতা আর কণ্টকতরুতে সমাচ্ছন্ন বিশাল একটা স্তূপ। লোকে বলে, এটাই হলো, জীবক বৈদ্যের বিখ্যাত আরোগ্যশালা আর তার বাসগৃহের ধ্বংসাবশেষ।

মহারাজ অজাতশত্রুর চিকিৎসক জীবকের অসাধারণ কীর্তির কথা ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু যে নগরশোভনা বিদুষী বারাঙ্গনা তার পঙ্কিলজীবনের অন্ধকারে বাস করেও তাকে খ্যাতির আলোকজ্জ্বল রাজ্যে পৌঁছে দিয়েছিল, মুছে দিয়েছিল জন্মলগ্নের অভিশাপ—সেই দুর্ভাগিনীর কথা কোথাও লেখা নেই।

ষষ্ঠ স্তবক

আমি বারাঙ্গনা। আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছা, সুখদুঃখ, মায়ামমতাঘেরা সংসারের স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা কিছু থাকতে নেই। যতদিন বাঁচবো—রাষ্ট্রশক্তির ক্রীড়নক হয়েই বেঁচে থাকতে হবে।

কৃষ্ণা দ্বাদশীর কৃশ চন্দ্রলেখার কিরণে যখন অরণ্যসমাচ্ছন্ন প্রান্তর মায়াময় হয়ে উঠেছিল তখন একদল অশ্বারোহী অতি দ্রুতবেগে সেই দূরবিসর্পিল প্রান্তর পথ অতিক্রম করছিল। সেই দ্রুত ধাবমান সৈনিকদের মুখাবয়বে তীব্র হর্ষোৎফুল্লতা শোভা পাচ্ছে। তারা দিগ্বিজয় সমাপন করে স্বদেশের অভিমুখে প্রত্যাগমন করছে। এমন একজন রণনিপুণ পরাক্রমশালী নৃপতির বিশ্বস্ত অনুচর তারা যাঁর বাহুবলে পদানত হয়েছে সুদূর পশ্চিমে পাঞ্জাব, রাজপুতনা থেকে শুরু করে পূর্বে অঙ্গ, বঙ্গ এবং সমুদ্র তীরবর্তী কলিঙ্গ। দক্ষিণাপথেও তাদের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান হয়েছে। শুধু তাই নয়, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শক ও কুষাণ রাজারাও বশ্যতা স্বীকার করেছে। তাদের সম্মুখবর্তী সেই অগ্রনায়কের অশ্বারূঢ় বীরমূর্তির দিকে তাকিয়ে ঘনিষ্ঠ বয়স্যদের চোখে অগাধ শ্রদ্ধা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাদের বুকের ভেতরে অদৃশ্য সেতারের রাগিনীর মত ঝঙ্কৃত হয় অরাতিদমনে অদ্বিতীয় সেই দিগ্বিজয়ী সম্রাটের নাম—

সমুদ্রগুপ্ত!

সমুদ্রগুপ্তের মুখমণ্ডলে বিজয়োল্লাসের কোন চিহ্ন নেই। তার প্রদীপ্ত দুইটি চক্ষুতে চিন্তার ছায়া থম থম করে। দিগ্বিজয়ের পরই মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করতে হবে। আর সেই যজ্ঞেরই সুখস্মৃতিকে রূপায়িত করে রাখার জন্যেই প্রচলন করতে হবে অশ্বমূর্তিলাঞ্ছিত স্বর্ণমুদ্রা! তার বুকের রক্তে কলধ্বনি বাজতে লাগল। কাজ—কাজ—অনেক কাজ তার—

এ কী!—কে ওখানে? সহসা সমুদ্রগুপ্ত অশ্বের গতিবেগ সংযত করল। তার প্রিয় বয়স্যদের চোখেও বিস্ময় ফুটে উঠল। সর্বাগ্রে মহারাজের নজরে পড়ল, রাত্রির মধ্যযামের অস্তমান ম্লান, পাণ্ডুর চন্দ্রালোকে আচ্ছন্ন এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর উচ্চ তটের ওপরে শায়িত হয়ে রয়েছে ছিন্নমৃণাল কুমুদিনীর মত এক নারীমূর্তি! সম্পূর্ণ নিরাবরণ তার দেহ। সেই নবোদ্ভিন্ন যৌবনের অপরূপ দেহলাবণ্যের দিকে তাকিয়ে সমুদ্রগুপ্ত ও তার অনুচরদের অপলক চোখের দৃষ্টি মুগ্ধ হয়ে এল।

দিগ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ত্বরিতপদে অশ্ব থেকে অবতরণ করে সেই সংজ্ঞা-হীন রমণীমূর্তির কাছে এল। তার মনে হলো, যেন শুভ্র তুষারমণ্ডিত একটি দীর্ঘ দেহরেখাই মূর্চ্ছিত হয়ে রয়েছে সেই তটিনীর জনমানবহীন তটে! তার কণ্ঠে, প্রকোষ্ঠ মুখগহ্বরে জমাট রক্তের চিহ্ন! নিশ্চয়ই হিংস্র নারীমাংসলোলুপ দস্যুদল এই রমণীর সর্বস্ব লুণ্ঠন করে এই নিঃসীম বনপ্রান্তরে উধাও হয়ে গিয়েছে।

মহারাজ নতজানু হয়ে সন্তর্পণে তার বক্ষে হস্তার্পন করে তার হৃদকম্পনের গতি অনুভব করতে করতে সেই রমণীর তুষারশুভ্র গাত্রবর্ণ, সর্বাঙ্গে কেমন একটা রূঢ় পরিপুষ্টি আর বহ্নিশিখার মত রূপরাশি দেখে তার মনে হলো, হিমালয়ের পরপারবর্তী শক-কুষাণদের নারীর সঙ্গে কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য আছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনের ভেতরে একটা সঙ্কল্প সুদৃঢ় একটা স্তম্ভের মতো উত্থিত হলো—এই অষ্টাদশী রূপসীকে সসম্মানে রাজ-অন্তঃপুরে স্থান দিতে হবে। তার জ্যেষ্ঠ্যপুত্র রামগুপ্ত মদ্যপ, উচ্ছৃঙ্খল, ব্যভিচারী। অতএব তার সঙ্গে নয়, দ্বিতীয় পুত্র রণনিপুণ, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে এর বিবাহ দিতে হবে—

মহারাজ দস্যু-ধর্ষিতা এই রমণীকে আপনি কি রাজ-অন্তপুরে স্থান দেবেন, সুযৌবনার অনাবৃত সৌন্দর্য লোলুপ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে করতে এক বয়স্য বলল।

স্তব্ধ হও অর্বাচীন, গর্জে উঠল সমুদ্রগুপ্ত, তুমি জানো না আমাদের শাস্ত্রে আছে, দস্যু দ্বারা উপদ্রুত নারী কখনো অসতী হয় না, বলেই উষ্ণীষ খুলে সূক্ষ্ম বস্ত্রাজালে রমণীর সর্বাঙ্গ ঢেকে দিল। আর অনুচরদের সঙ্গে একটিও বাক্য বিনিময় না করে সেই অষ্টাদশীর সংজ্ঞাহীন দেহ সন্তর্পনে বক্ষে তুলে নিয়ে মহারাজ অশ্বারোহণে রাজধানী অভিমুখে রওনা হলো।

পরদিন ঊষাকালে উজ্জয়িনীতে পৌঁছানোর পূর্বে ঘনসন্নিবদ্ধ তরুশ্রেণী সমাচ্ছন্ন এক বনপ্রদেশ অতিক্রম করতে করতে মহারাজের দৃষ্টিগোচর হলো, দূরে রক্তবর্ণ বস্ত্রাবাসের ছাউনি পড়েছে আর কিঙ্করী, নর্তকী, সংবাহক, সূপকার, নহাপিত প্রভৃতি বহুবিধ দাসদাসীর কলগুঞ্জন সেই আরণ্যক পরিবেশের স্তব্ধতাকে বিঘ্নিত করছে।

মুহূর্তে বিদ্যুতচমকের মত সমগ্র রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। নিশ্চয়ই জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র পাত্রমিত্র ভৃত্য সমভিব্যাহারে দ্যূতক্রীড়া, তিত্তিরি-যুদ্ধ দর্শন করতে মৃগয়ায় এসেছেন। আর মৃগয়ার নামে নির্বিচারে নিরীহ পশু-নিধন ব্যতীত

তার আর কাজ কি! মহারাজের বক্ষপঞ্জর বিদীর্ণ করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। যদিও উত্তরাপথ থেকে শুরু করে সুদূর দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তার বিজয়-পতাকা তারই অমিত বিক্রম ঘোষণা করছে তবুও সেই মুহূর্তে নিজেকে কেমন নিঃস্ব আর অসহায় বলে মনে হলো। আর ইচ্ছে করেই সমুদ্রগুপ্ত সেই সংকীর্ণ বনপথ পরিত্যাগ করে ঘনপল্লবিত কণ্টকতরুর ভেতর দিয়ে অগ্রসর হলো। কিন্তু—

যে আশঙ্কা করছিল তাই হলো। সহসা সেই জঙ্গলাকীর্ণ পথেই তার গতিরোধ করে দাঁড়াল যুবরাজ রামগুপ্ত। অশ্বপৃষ্ঠে বহ্নিশিখার মত সেই রূপরম্যা নারীকে দেখেই তার নেশাচ্ছন্ন চোখদুটোর দৃষ্টি চমকে উঠল। বিনীতভাবে বলল, পিতৃদেব কোথায় পেলেন এই রমণীরত্ন?

একটা কথাও বলল না সমুদ্রগুপ্ত। আকণ্ঠ সুরাপানে স্খলিতপদ, উচ্ছৃঙ্খল, লম্পট পুত্রের দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সম্মুখে অগ্রসর হলো। পশ্চাতে মহারাজের এক বয়স্য নিম্নকণ্ঠে বলল, যুবরাজ দস্যু-ধর্ষিতা উচ্ছিষ্টা এই নারী—

কে জানে, কোন খেয়ালে মহারাজ তাকে রাজপ্রাসাদের শুদ্ধান্তপুরে রাখবেন বলে যত্ন করে নিয়ে চলেছেন—আর একজন বলল।

অগ্নিদগ্ধ সর্পের মতো তীব্র যাতনায় যুবরাজের সারা দেহ যেন বিকৃত হয়ে উঠল। দূরে তরুশ্রেণীর ঘনসবুজের ভেতরে অপসৃয়মান সেই বিদ্যুতের উগ্র সাদা আলোর আকস্মিক চমকের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হলো, নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই মহারাজের অন্তরে আছে কোন জটিল আর দূরপ্রসারী দুরভিসন্ধি। পিতৃদেবের স্বভাবের সঙ্গে আছে তার বিলক্ষণ পরিচয়। কোন কাজ তিনি হঠাৎ করেন না। হয়তো পিতার বক্ষপঞ্জরের ভেতরে তার প্রাণের স্পন্দনের মতই প্রিয়, তার নয়নের মণি, তার দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্রগুপ্তের ভোগের—

পট্টমহাদেবীকে বললে হয়তো কোন প্রতিকার হতে পারে যুবরাজ—

অসম্ভব। হয়তো হিমালয়ের কোন গিরিশৃঙ্গকে স্থানচ্যুত করা যায়। ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রামগুপ্ত কূটকুটিল কণ্ঠে বলল, কিন্তু সম্রাটকে তার সঙ্কল্প থেকে বিরত করা যায় না—

মহারাজের তথাকথিত ঘনিষ্ঠ বয়স্যরা আর কালব্যয় না করে দ্রুত তার অনুগামী হলো।

দ্বিপ্রহরের রৌদ্রদগ্ধ নিঃসীম প্রান্তর অতিক্রম করতে করতে মহারাজ অষ্টাদশী সেই রূপসীকে বলল, তুমি তো বলছিলে, তুমি পুরুষপুরের শ্রেষ্ঠী বাসুদেবের কন্যা—হ্যাঁ কি যেন নাম বলেছিলে—

ধ্রুবস্বামিনী—

তুমি পিতার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছিলে ?

গান্ধাররাজ্যে। ক্ষণকাল পরে নতমুখী হয়ে লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলল, পথিমধ্যে আটবিক দস্যু কর্তৃক অপহৃত হই। দুর্বৃত্তরা আমার পিতাকে—তীব্র ব্যথার ভারে তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল। কয়েকমুহূর্ত পরে নিজেকে সংযত করে বলল, আমাকে কেন্দ্র করে বিবাদ-বিসংবাদ করতে করতে আমাকেই অরক্ষিত ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল—

কিন্তু তোমার কণ্ঠে, মুখাবয়বে ওই ক্ষত চিহ্ন ?

আমি কোথাও পালিয়ে যেতে না পারি এইজন্যে দস্যুপতি আমার দেহের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত করে প্রচুর রক্তক্ষরণ করায়। তাতেই মূর্চ্ছিত হয়ে যাই। ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় ধ্রুবস্বামিনী। তার দুটো আয়ত চোখের দৃষ্টি ব্যথাতুর হয়ে উঠল। স্তিমিত কণ্ঠে বলল, কিন্তু দস্যুনায়ক তাতেও নিশ্চিন্ত হলো না। সংজ্ঞালাভ করে আমি কোথাও চলে যেতে পারি, এই ভয়ে আমাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে রেখে চলে যায়—

মহারাজ কোন কথা বলল না। কেন যেন ধ্রুবস্বামিনীর ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক, পুরুষালী, সুদৃঢ় দীর্ঘ তনুদেহের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার মনে হলো, শ্বেতপাথর কেটে কুঁদে কুঁদে গড়া হয়েছে এই নিটোল উৎফুল্ল মূর্তি। আসমুদ্র হিমাচল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছে ঠিক ; কিন্তু ভেতরে ভেতরে বার্দ্ধক্যের শিথিলতা অনুভূত হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছে মৃত্যুর পদধ্বনি। তার অবর্তমানে তার রণকুশলী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ পুত্র চন্দ্রগুপ্ত কোষমুক্ত তরবারির মত তীক্ষ্ণধার এই নারীর সহযোগীতায় তার আসমুদ্রকরগ্রাহী রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে—প্রজানুরঞ্জন নৃপতি হিসেবে তার মতই সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হবে—

এই যে এখানে—এখানে—ওদিকে নয়—সহসা বহু মানুষের সমবেত দূরাগত কোলাহলে মহারাজের দিবাস্বপ্ন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিছুদূর অগ্রসর হতেই দেখা গেল, শতশত কুলি, স্থপতি, সূত্রধর, কারুশিল্পী সমভি-ব্যাহারে শ্রেণীনায়ক কুমারদত্ত বিজয়তোরণ নির্মাণ করছে। অযুত সেনার

অগ্রনায়ক হয়ে দিগ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত না এসে মাত্র চারজন বয়স্যকে সঙ্গে করে আসতে দেখে কর্মীরা বিস্মিত হয়ে গেল। শ্রেণীনায়ক কুমারদত্ত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, তোমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছো কি? জয়ধ্বনি দাও—

জয়, সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের জয় !!

জয়—সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের জয় !

সমবেত কণ্ঠের সেই জয়ধ্বনি বায়ুতাড়িত হয়ে দূর-দূরান্তরে প্রতিধ্বনিত হলো। দূরে রাজপথের ওপরে আর একটা বিজয়তোরণ নির্মাণ কার্য পরিদর্শন করতে করতে সহসা উল্লসিত জয়ধ্বনি কর্ণগোচর হতেই বিদ্যুত বেগে অশ্বপৃষ্ঠে ধাবিত হলো যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত !

এ কী পিতৃদেব, নির্দ্ধারিত সময়ের আগেই আপনি রাজধানীতে কেমন করে প্রত্যাগমন করলেন ?

কয়েকমুহূর্ত উৎসুক চোখে মহারাজের পশ্চাতে তাকিয়ে বলল, আপনার অদ্ভুত বিজয়ী সেনানী—অশ্বারোহী, পদাতিক—

তারা ধীর পদবিক্ষেপে আসছে বৎস। রাজধানীতে বিজয়োৎসবের সব ব্যবস্থা সমাপন হয়েছে ?

হ্যাঁ পিতৃদেব, পাটলিপুত্রের নাগরিকবৃন্দ আপনাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে—বলে অশ্বারূঢ় সম্রাটের পদযুগল স্পর্শ করে প্রণাম করতে যেতেই বয়স্যদের অশ্বের পশ্চাতে সেই তন্বী শ্বেতকায় রমণীমূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে তার চোখে বিস্ময় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সূক্ষ্ম চীনাংশুক বস্ত্রের উড়ানীতে আবৃত সেই নারীর মুখাবরণ। তবুও তার আড়ালেও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এই অনিন্দ্য-সুন্দর মুখশোভার ছায়াভাস। সেই মুহূর্তে চন্দ্রগুপ্তের দেহের ভেতরে একটা তীব্র শিহরণ তরঙ্গায়িত হয়ে যায়। ওদিকে কেউ জানতে পারে না, যুবরাজের শালতরুর মত দীর্ঘ সুদৃঢ় দেহাবয়ব, খড়্গনাশায়, নেত্রভঙ্গীতে কর্মযোগী পুরুষের কঠোর সঙ্কল্পের প্রতিভাস দেখে সেই বিদেশিনীর আয়তাক্ষীর দৃষ্টিও পিপাসাতুর হয়ে ওঠে। অস্ফুট আর বিনম্র কণ্ঠে কনিষ্ঠ যুবরাজ বলে, পিতৃদেব, কে এই নারী ?

যথাসময়ে জানতে পারবে—

রাজধানী, মহানগরীর পাটলিপুত্রে। নাগরিকবৃন্দের সরব ও উচ্ছ্বাসিত অভিনন্দন এবং তুমুল জয়ধ্বনির ভেতর দিয়ে রাজপ্রাসাদে পৌঁছালেন দিগ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত। অন্তপুরের পুরোনারীদের শঙ্খধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল সেই

বিশাল সুদৃশ্য প্রাসাদ। সহাস্যমুখে পরমভট্টারিকা কুমারদেবী মহারাজের প্রশস্ত ললাটে চন্দনের জয়টীকা অঙ্কিত করতে এসে স্তব্ধ হয়ে গেল। আর বিস্ময়ে ও কুটিল সন্দেহে বঙ্কিম হয়ে উঠল তার ভ্রূলতা।

অজ্ঞাতকুলশীলা ধ্রুবস্বামিনীর বিচিত্র বৃত্তান্ত শুনেই কুমারদেবীর মন বিষাক্ত হয়ে উঠল। মৃদুকণ্ঠে বলল, মহারাজ ওকে কি প্রাসাদাভ্যন্তরেই রাখবেন?

নীরব হয়ে রইল সমুদ্রগুপ্ত। তার গম্ভীর ও চিন্তাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে আর একটিও কথা বলল না কুমারদেবী। সচিব, সভাসদ, বিদূষক, বিচক্ষণ শ্রেষ্ঠীদের অধিকাংশের মতামত হলে—মহারাজ সদ্য দিগ্বিজয় থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। যে সব দেশকে পরাস্ত করেছেন তারা প্রতিহিংসাপরায়ণ শত্রুতে পর্যবসিত হয়েছে। এই সময় গুপ্তচরের ভয় বড় বেশি। ইতিমধ্যেই তক্ষশিলা থেকে আগত জঘনচপলা নাম্নী বিপুলানিতম্বিনী এক বারাঙ্গনাকে দেখে সমস্ত নাগরিক তো ভুলেছিলই এমনকি মহাধনিক সুবর্ণশ্রেষ্ঠী সুবর্ণদত্ত তাকে বিবাহ করার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। পরে গুপ্তচর বিভাগের অধিকর্তা বিরোধ বর্মার তৎপরতায় জানা গেল, জঘনচপলা আসলে পরাজিত গান্ধাররাজের চর! শুধু তাই নয়, এই সময় নগরে সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক, জ্যোতিষী, বারবনিতা, নট, কুশীলবের সংখ্যা এত বর্দ্ধিত হয়েছে যে এদের ভেতরে কে যে কোন ভাগ্যাহত, সিংহাসনচ্যুত নৃপতির চর, তা অনুমান করা খুব কঠিন।

পরিশেষে মুখ্যসচিব বর্ষকার বলল, আর এই অজ্ঞাত পরিচয় রমনীর দেহের তুষার বর্ণ-বা দীর্ঘ-সুদৃঢ় গঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে আমার কেমন যেন মনে হয়—অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল বর্ষকার। তার জটিল, রেখাঙ্কিত মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া নামল।

কি মনে হয় বলুন? সম্রাটের কণ্ঠে বিরক্তির আভাস। আমাদের চিরশত্রু উত্তর-পশ্চিমের দেশের শক কি কুষাণদের প্রেরিত চর এই নারী—

আপনি নিয়মিত পূজা-অর্চনা করেন শুনেছিলাম। কিন্তু আপনি যে এত অধিক পরিমাণে মদিরাসক্ত তা জানতাম না—

পাত্রমিত্র, সভাসদ, সচিব, পট্টমহাদেবী কারো কথায় কর্ণপাত না করে সম্রাট নির্মাণ করল ধ্রুবস্বামিনীর জন্য একটি স্বতন্ত্র সুদৃশ্য প্রাসাদ। সেখানে দাসদাসী সহচরী পরিবৃত হয়ে রাজেন্দ্রানীর মহিমায় বিরাজ করতে লাগল অজ্ঞাত পরিচয় সেই রহস্যময়ী।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত।

গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা পরাক্রমশালী, বিচক্ষণ নৃপতি মৌর্য-চন্দ্রগুপ্তের সুযোগ্য পুত্র। সার্থক উত্তরাধিকারী।

বায়ুতাড়িত শুষ্ক পত্র যেমন অরণ্যের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে চলে যায় তেমনি মহৎ স্বপ্ন আর আকাশচুম্বী বাসনার দ্বারা চালিত হয়ে শুধু যুদ্ধের পর যুদ্ধ আর রাজ্যবিস্তার করেছে। কখনো কোন অবসরে হয়তো কোন চন্দ্রহাস রাত্রির নির্জন মধ্যযামে বীণার তারে ঝঙ্কার তুলেছে। রচনা করেছে কবিতাও। আর সেই কবিতা তার সভাকবি হরিষেণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিতও হয়েছে। কিন্তু কখনো কেউ বলতে পারবে না, কোন নারীর প্রতি তার আসক্তির কথা!

সেইজন্যেই—সেইজন্যেই ধ্রুবস্বামিনীর প্রতি তার পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের নানা কল্পিত কারণ নগরবাসীদের মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে ফিরতে লাগল। আর সিতাংশুকা, পত্রলেখা, সুনয়নী প্রভৃতি পাটলিপুত্রের রূপজীবা নগর-কামিনীদের রূপযৌবন নিয়ে বারমুখ্যাগমণকারীদের সরস আলোচনার ওপর যবনিকাপাত হলো। শ্রুতিগোচর হতে লাগল সেই নারীবিলাসী ভোগী-দের ভেতরে ধ্রুবস্বামিনীর অলৌলিক রূপৈশ্বর্য সম্বন্ধে কথপোকথন—

১। আমি একদিন বাতায়ন পথে তাকে প্রত্যক্ষ করেছি—আঃ ঠিক যেন অমিতদ্যুতি স্থির সৌদামিনী—

২। আমিও দেখেছি পুষ্পবলয় বেষ্টিত অলিন্দে পদচারণ করছে ধ্রুব-স্বামিনী। যেমন শিলাতলের মত বিশাল জঘন, তেমনি তার মধ্যদেশ এত কৃশ যে যে কোন বলশালী কামীকে সে মন্মথের দশমী দশায় নিয়ে যেতে পারে—

৩। ধ্রুবস্বামিনীর প্রাসাদের এক পরিচারিকা সুললিতার কাছে শুনেছি—মদনের আবাসস্থলরূপ তার অতিবিশাল নিতম্ব, উদ্ধত সুপুষ্ট কুচজুগল কপিল-মুনিরও ধ্যানভঙ্গ করতে পারে—

ধ্রুবস্বামিনীর মনোরম দেহসৌষ্ঠব সম্বন্ধে এইসব চাঞ্চল্যকর কথা নারীমাংস লোলুপ রামগুপ্তের শ্রুতিগোচর হয়। আর তার রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কে যেন উদগ্র কামনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে দেয়। কিন্তু বাধা অনেক। ধ্রুবস্বামিনীর বিলাশভবনের পরিব্রাজিকা (নারী অধ্যক্ষ) রচনী অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ। তার কড়াপ্রহরায় পিপীলিকারও সাধ্য নেই সেখানে প্রবেশ করে। তবুও সতর্ক শিকারীর মত কোন সুবর্ণ সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে রামগুপ্ত।

ওদিকে মহাসমারোহে অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজন শুরু হলো। কাশী, কাঞ্চী, কোশল, শ্রাবস্তী, লিচ্ছবি, এবং যারা সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেছে যেমন তক্ষশিলা, পূর্ব-মালব, এমন কি সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র ও অবন্তী প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমের দেশের যবন (শক) নৃপতিদের কাছে সাদরে নিমন্ত্রণের বার্তা বহন করে রাজদূতরা গেল।

আসন্ন অশ্বমেধযজ্ঞের উৎসবে উল্লসিত কলরোলে মুখরিত রাজধানীরই দূরপ্রান্তে অট্টালিকার সুরম্য কক্ষে বিপুল রাজৈশ্বর্যের ভেতরে বাস করেও ধ্রুবস্বামিনীর নিজেকে বন্দিনী মনে হয়। তার মনের দর্পণে বারে বারে প্রতিবিম্বিত হয় একটি—একটি মাত্র মুখের ছবি—চন্দ্রগুপ্ত !

তবে কি তাকে এত যত্ন করে রাখার মূলে সম্রাটের অভিপ্রায় আছে—কনিষ্ঠ যুবরাজের সঙ্গে—না আর ভাবতে পারে না। তার ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের গভীর অন্ধকারে রামধনুর রঙীন ঝিলিমিলি একবার চকিতে পরিস্ফুট হয়েই মিলিয়ে যায়। আর তার মনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা কালসাপের তীব্র-দংশনে তার সুখস্বপ্ন মুহূর্তে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সঙ্গীহীন একক জীবনের দুর্বিসহ যন্ত্রণা তাকে পীড়িত করে।

তার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে অতিকায় এক একটি ঝুড়ি ভর্ত্তি করে সুস্বাদু সুমিষ্ট রসালো ফল ও পুষ্টিকর বিবিধ আহার্য সামগ্রী আসতে থাকে।

ইতিমধ্যেই ঘটে গেল একটা অপঘটনা।

শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি। রাজপুরী থেকে প্রচণ্ড তোপধ্বনিতে রাত্রির মধ্যযাম বিজ্ঞাপিত হলো। পাটলিপুত্রের প্রধান নগরদ্বারের প্রহরীরা দুন্দুভি বাজিয়ে উচ্চকণ্ঠে প্রহর হাকল। ঠিক সেই সময়—

বিচিত্র চীনাংশুকে আবৃত পালঙ্কশয্যায় জ্যোৎস্নারই একটা রেখার মত শায়িত হয়েছিল ধ্রুবস্বামিনী। সুরম্য কক্ষের চতুষ্কোণে স্ফটিক গোলকের মধ্যে পুন্নাগচম্পক তেলের সুগন্ধী দীপ জ্বলছে, শিয়রে জ্বলছে গন্ধধূপ। ধূপশালাকার মদির গন্ধে তার চেতনা যখন কেমন আচ্ছন্ন ও বিবশ হয়ে আসছিল তখুনি ফলের ঝুড়ির ভেতর থেকে বিষধর কালভুজঙ্গের মত বেরিয়ে এল যুবরাজ রামগুপ্ত ! নিপুণ শিকারীর মত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এল 'গজদন্ত' নির্মিত পালঙ্কের কাছে। সবুজ কুঞ্চলীর বন্ধনে আবদ্ধ দৃঢ় কঠিন আর উদ্ধত কুচজুগল, তার সুপুষ্ট নিতম্বদেশ যুবরাজের রক্তের ভেতরে কামনার লেলিহান অগ্নি

প্রজ্বলিত করল। আর নির্মম পীড়নে সেই রূপসীর দেহলতাকে বিমোহিত করতে তীব্রকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল ধ্রুবস্বামিনী—কে—কে তুমি—প—রি—ব্রা—জিকা— জালবদ্ধা ব্যাঘ্রীর মত তার বাহুবেষ্টনের ভেতরে ধ্রুবস্বামিনী যুদ্ধ করতে লাগল। তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে যুবরাজের বক্ষোদেশে ক্ষত করল।

কিন্তু—

শেষপর্যন্ত আমিষলোলুপ রামগুপ্তের দুর্বার কামনার প্রবল স্রোতে কুটোর মত কোথায় বিলীন হয়ে গেল ধ্রুবস্বামিনী!

এই দুর্ঘটনা সম্রাটের কর্ণগোচর হতেই নিদারুণ একটা গ্লানির অপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার মন। মন্ত্রণাগৃহে সভাসদ সচিবদের সঙ্গে পরামর্শ না করে জেষ্ঠ্য যুবরাজের গর্ভধারিণী পরমভট্টারিকা কুমারদেবীর অশ্রুসজল অনুরোধে কর্ণপাত না করে রামগুপ্তকে পর্বতাকীর্ণ দুর্গমপ্রদেশ নেপালে নির্বাসিত করল সম্রাট।

বিপুল সমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন হলো। সম্রাটের রণকুশলতা, সুশাসন, নানাবিধ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য, বাদ্যযন্ত্রে নিপুণতা প্রভৃতি গুণপনাকে কেন্দ্র করে সভাকবি হরিষেন রচিত সুদীর্ঘ প্রশস্তি শিলালিপিতে উৎকীর্ণ করা হলো। পারস্যসম্রাট দরায়ুস এবং কুষাণ নৃপতি কনিষ্কের অনুকরণে বীণাবাদনরত সরস্বতী মূর্তি অঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রারও প্রচলন যেদিন থেকে শুরু হলো ঠিক তার ছয়মাস পরে দিগ্বিজয়ী বীর সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের বিচিত্র জীবননাট্যের যবনিকাপাত হলো।

স্মরণাতীতকালের প্রথা অনুযায়ী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যভার না দিয়ে চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনের অধিকার দিতে হবে—সম্রাটের এই আন্তরিক বাসনা জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী বধকার ও অগ্রমহিষী কুমারদেবীর কূটকুটিল চক্রান্তে আসমুদ্র করগ্রাহী রাজ্যের অধীশ্বর হলো রামগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্তের ওপরে সহানুভূতিশীল অন্যান্য সচিব-সভাসদ-সেনানায়ক ও বিপুল সংখ্যক প্রজাদের মন ব্যথাভরাক্রান্ত হয়ে উঠল। তাদের এই পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ বিদ্রোহে পর্যবসিত হতে পারতো: হতে পারতো একটা রক্তাক্ত যুদ্ধ।

কিন্তু—

আশ্চর্য! রাজকুমার চন্দ্রগুপ্ত দেশে দেশে নগরে নগরে সকরুণ আবেদন জানালো, যুদ্ধ নয়, বিদ্রোহ নয়—পিতার সুনাম ক্ষুন্ন হবে। অনুগ্রহ করে মুখ্য-সচিব ও পরমভট্টারিকা কুমারদেবীর সিদ্ধান্তকেইপ্রশান্তচিত্তে স্বীকার করে নিন—

এসব শুনে ধ্রুবস্বামিনীর মনে হয়, কুমার চন্দ্রগুপ্ত মানুষ নন, দেবতা। স্বার্থ, বাসনা, কামনার পৃথিবীতে বাস করেন, কিন্তু এই জগতের কোন তৃষ্ণাই তাকে স্পর্শ করতে পারে না!

সিংহাসনে আরোহণ করার পর রামগুপ্তের প্রথম কাজ হলো, রাজ্যের যে কোন সম্পত্তির ওপর রাজকীয় অধিকারের সূত্রেই হয়তো ধ্রুবস্বামিনীর প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে বিবাহ করা! অজ্ঞাতকুলশীলা বিদেশিনী এবং শক-নৃপতির গুপ্তচর সন্দেহে মুখ্যসচিব এবং পরমভট্টারিকা যাকে একদিন প্রাসাদাভ্যন্তরে রাখতেও কুণ্ঠিত হয়েছিল তাকেই রাজবধূর সম্মান দিতে একটুও ইতস্তত করল না। এই হয়—

এই নিয়ম। স্বজনপোষণের জন্য বহু অবিচার এবং দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে হয়। কিন্তু তারা জানতো না—এমনি করেই গরিমাদীপ্ত গুপ্তসাম্রাজ্যের শ্মশানভূমি তারা রচিত করছিল। আর সেই সর্বনাশা করুণ পরিণতির কিঞ্চিৎ আভাসও পাওয়া গেল রহস্যময়ী সদ্যবিবাহিত সেই নববধূর কাছে।

বাসরকক্ষের চারিদিকে হেমদণ্ডের শীর্ষে খরদ্যুতি দীপিকা জ্বলছিল। আর ময়ূরপঙ্খী পালঙ্কে পরিব্যপ্ত পুষ্পস্তবক থেকে উত্থিত পরিমল বায়ু বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় মধুভাণ্ডের গাত্রে যেমন ষট্‌পদ পড়ে থাকে; তেমনি ধ্রুবস্বামিনীর পুষ্পলতিকার মত দেহটাকে মথিত করে পরম পরিতৃপ্তিতে রামগুপ্ত অস্ফুট কণ্ঠে বলল, আজ থেকে তোমার রূপের আগুনে আমি দগ্ধ হয়ে যেতে চাই ধ্রুব—

শুধু তুমি কেন, তোমাদের এই রাজ্যপাট, আমি, সমগ্র পাটলিপুত্র—সব একদিন এই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে—

অ্যাঁ—কি বললে, সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে—শুধু থাকব তুমি আর আমি! সুখস্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন মানুষের মত বিড় বিড় করে বলল রামগুপ্ত।

চরম একটা ঘৃণার ধিক্কার জ্বলতে লাগল ধ্রুবস্বামিনীর আয়ত নয়নে।

পরদিন অতি প্রত্যুষে যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত যখন তার কক্ষের বাতায়নপথে নবোদিত আদিত্যের বর্ণচ্ছটার অপরূপ শোভা দেখছিলেন, সেইসময় প্রতিহারী বলল, রাজ-অন্তঃপুরের প্রধানা পরিচারিকা আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী—

প্রাতঃপ্রণামযুবরাজ, মহারাণী আপনাকে এই ফুলটি উপহার দিয়েছেন—বলেই পরিচারিকা বিদায় নিল। শিশিরসিক্ত একটা সতেজ শ্বেত স্থলপদ্ম!

বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেল যুবরাজ। চকিতে তার মনের ভেতরে ভেসে উঠল, অশ্বারূঢ়া প্রদীপ্ত দীপশিখার মত সেই রমণীমূর্তি! কিন্তু—তার কাছে একটি প্রস্ফুটিত স্থলপদ্ম প্রেরণের হেতু কি থাকতে পারে? নিশ্চয়ই পুষ্প-কোরকের অভ্যন্তরে গূঢ় কোন সঙ্কেত আছে। তার শিশিরস্নাত পল্লবগুলো একে একে উন্মোচন করতেই পুংকেশরের কাছে শ্বেতশুভ্র কোমল পল্লবে কয়েকটা হিজিবিজি রেখা চোখে পড়ল। সেই পাপড়িটি ছিঁড়ে ফেলে প্রদীপের সামনে মেলে ধরতেই দেখল কজ্জলমসী দিয়ে লিখিত এক লিপি—অদ্য মধ্যরাত্রে একাকী আসবেন সঙ্কেতকুঞ্জে—ধ্রুবস্বামিনী—

সপ্তপর্ণ অটবীতে আর রক্তবর্ণ মাধবীলতায় আচ্ছন্ন সঙ্কেতকুঞ্জ। তার মধ্য-স্থলে লতাগুল্মে সমাচ্ছন্ন কৃত্রিম পর্বতগাত্রে এক নির্ঝরের রূপালী রেখা শোভা পাচ্ছে। সেই নির্ঝরের সন্নিকটে লতানিকুঞ্জের নিভৃতে বসে তার বাঞ্ছিত-জনের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে অভিসারিকা ধ্রুবস্বামিনী। তার কুণ্ডলিত কবরীতে জাতিপুষ্পের শোভা। পরিধানে অগ্নিবর্ণ চীনাংশুক। কিন্তু—

এত বেশ-বাস প্রসাধনের পরিপাট্য,—এত ব্যাকুলিত প্রতীক্ষা—সব—সব বুঝি ব্যর্থ হয়। প্রহরের পর প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে। সে আসছে না কেন? দুঃসহ জ্বালায় দাবদাহের মত প্রজ্বলিত হতে হতে ভাবে—যদি আজও সে প্রত্যাখাত হয়—যদি অপমানিত হয়, তাহলে—তাহলে একটি—একটি মাত্র সঙ্কেতে সমগ্র পাটলিপুত্র মহাশ্মশানে পরিণত করবে—

আজ্ঞা করুন মহারাণী, সম্মুখে এসে দণ্ডায়মান হলো কুমার চন্দ্রগুপ্ত।

ভেবেছিলাম, আজও বুঝি উপেক্ষা করবেন—

এখন আপনি আমার অগ্রজের ধর্মপত্নী। আমার পরম পূজনীয়া—আপনার আদেশ এখন আমার শিরোধার্য্য—

আপনি এত বিলম্ব কেন করলেন কুমার?

আপনার সঙ্গে নিভৃতে গোপনে সাক্ষাৎ ধর্মবহির্ভূত কাজ। তাই প্রতি-হারীদের নজর এড়িয়ে আসার জন্যে আমাকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে—

আপনি খুব ধর্মভীরু কুমার—

আমার পিতৃদেবের শিক্ষা মহাদেবী— বাল্যকাল থেকে বলল, ধর্ম আর নীতিহীন কোন কাজ তিনি সমর্থন করতেন না—

ও, তাই বুঝি একটি মদ্যপ, কামুক পশুকে আপনারা পাটলিপুত্রের

সিংহাসনে বসিয়েছেন আর অজ্ঞাতকুলশীলা এবং অভিভাবকহীন বলেই তার হাতে আমাকে সমর্পণ—

বিচক্ষণ বহুদর্শী মুখ্যসচিব বর্বকার এবং পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি—

তাদের অভিসন্ধিটা যে দুরভিসন্ধি, আপনার পিতৃদেবের সমগ্র রাজ্য যে রসাতলে যেতে বসেছে তাও কি আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন না কুমার? ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে কোমল ও মৃদু কণ্ঠে আবার বলল ধ্রুবস্বামিনী, আপনাকে ভর্ৎসনা করে যাতনা অনুভব করি কুমার, তীব্র আবেগে তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে। তবুও রাজপুত্রের নবারুনোপম জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল, প্রশস্ত ললাটের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিবিড় সুখস্বপ্নে বিভোর মানুষের মত বলে, প্রথম দৃষ্টিতে দেখেই আমি যে উপলব্ধি করেছিলাম, আপনি পিতার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী—ধীর পদক্ষেপে চন্দ্রগুপ্তের বক্ষের সন্নিকটে এসে তার ভেতরের সুপ্ত ক্ষাত্রতেজ জাগ্রত করার জন্যেই সংসারঅভিজ্ঞ প্রবীণা বয়স্কার মত বলল, গুরুজনদের প্রতি ভক্তি ভালো কিন্তু অন্ধভক্তি ভালো নয় কুমার—

আপনি কি বলতে চাইছেন—আপনার বক্তব্য স্পষ্ট করে বলুন মহারাণী—

আপনি কি প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হচ্ছেন না—আপনার অপদার্থ অগ্রজ বর্বকারের হাতের ক্রীড়নক হয়েছে—আপনি কি জানেন না—আপনার পিতৃদেব যে শক ও কুষাণদের সিন্ধুর পরপারে বিতাড়িত করেছেন তারা আপনাদের রাজ্য আক্রমণ—

কে আপনি? ধ্রুবস্বামিনীর উদ্দীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল চন্দ্রগুপ্ত। তার বিস্ময়াভিভূত চোখে সন্দেহের ছায়া পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

আমি আপনাদের রাজকুলবধূ—শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে বলল, আপনার পূজনীয় অগ্রজের ধর্মপত্নী। অতএব আমার আদেশ—দুটো বিষয় আপনাকে বলতে হবে—অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যেয়ে কঠোর দৃষ্টিতে রাজকুমারের সরলতার সৌন্দর্যে স্নিগ্ধ মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার বক্তব্যের ওপরে নির্ভর করছে আপনাদের সমগ্র রাজ্যের ভবিষ্যৎ—

বলুন মহারাণী—যুবরাজের কণ্ঠ কেমন ভয়ার্ত শোনালো।

আমি যে দীর্ঘ ছয়মাস স্বতন্ত্র প্রাসাদে অবস্থান করছিলাম, তার ভেতরে আপনাকে তিনবার আহ্বান করেছি। আপনি আসেন নি কেন?

পিতৃদেবের নিষেধ ছিল—

আমাকে রাজেন্দ্রানীর মহিমায় রাখার মূলে সম্রাটের কি অভিপ্রায় ছিল ?

জানি না। কাউকে বলে যেতে পারেন নি। তবে পিতৃদেবের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ সভাকবি হরিষেণ না কি বলেছিলেন—

অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় যুবরাজ। আর কেমন পিপাসাতুর দৃষ্টিতে ধ্রুবস্বামিনীর অগ্নিবর্ণ চীনাংশুকে আবৃত দীর্ঘ দেহবল্লরীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

বলুন যুবরাজ—নীরব হয়ে গেলেন কেন ?

তাঁর বাসনা ছিল অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনান্তে আপনার সঙ্গে আমার—

তাহলে কেন—কেন আপনারা আমাকে ধিক্কৃত জীবনের অন্ধকারে ঠেলে দিলেন কুমার, দগ্ধপক্ষ বিহঙ্গীর মত যন্ত্রণায় ধ্রুবস্বামিনীর দেহটা বিকৃত হয়ে উঠল।

দূরে নির্ঝরনিম্নে সলিলপানে তৃপ্ত হরিণশিশুর হর্ষধ্বনি শোনা যায়। বৃক্ষচূড়ায় সদ্যজাগ্রত বিহঙ্গের কাকলী জাগে।

কুমার চন্দ্রগুপ্ত! গভীর প্রীতিস্নিগ্ধ মধুরকণ্ঠে বলে ধ্রুবস্বামিনী, স্মরণ রাখবেন—কেতকীপরাগের আহ্বান উপেক্ষা করে না কোন মদান্ধ ভৃঙ্গ। পূর্ণিমারাত্রের কোন চকোর—বলতে বলতে তীব্র আবেগে আকুলিত হয়ে চন্দ্রগুপ্তের বক্ষে মস্তক অবনত করে বলে, সুহৃত্তোম চন্দ্রগুপ্ত—জীবনটাকে নতুন করে শুরু করা যায় না ?

কশাহত প্রাণীর মত বেদনানমিত শিরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে কুমার চন্দ্রগুপ্ত।

আমিও তোমাকে প্রথম দেখার পর থেকে বিনিদ্র রজনী যাপন করেছি; আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে তোমাকে আমি ভালোবাসি—এসব কথাই বলতে চেয়েছিল চন্দ্রগুপ্ত। কিন্তু—

জন্মার্জিত সংস্কার। ভ্রাতৃবধূ। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের নীতি ধর্মের অনুশাসনের নিগড়ে আবাল্যলালিত। তাই শুধু বিনীত কণ্ঠে বলল, তা হয় না ভদ্রে—আপনার বাসনাকে সংযত করুন শোভনাঙ্গী—

আপনি পাষাণ—আপনি নিষ্ঠুর! উদ্যতফণা সাপিনীর মত আন্দোলিত হলো তার দীর্ঘ দেহ। আর দুটো কজ্জলায়িত চক্ষু থেকে বিষাক্ত আক্রোশের বৃষ্টি ক্ষরিত হতে লাগল। মর্মতন্তু ছিঁড়ে যেন আর্তনাদ করে বলল ধ্রুবস্বামিনী, মনে রাখবেন, আপনার প্রতি আমার স্বতোৎসারিত গভীর আসক্তিই আমার মনের ভেতরের কালনাগটাকে ঘুম পাড়িয়েরেখেছিল—এইবার—সে জাগবে—

মুহূর্তের ভেতরে উন্মত্ত একটা ঝড়ের বেগে লতানিকুঞ্জের আড়ালে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেইদিন—সেইদিন প্রভাতে ধ্রুবস্বামিনী প্রাসাদশীর্ষে উঠে এসে বস্ত্রাঞ্চলের ভেতর থেকে রক্তচক্ষু ধূম্রবর্ণ পারাবত বের করে আকাশে উড়িয়ে দিল। পারাবত তিনবার প্রাসাদ পরিক্রমণ করে পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হল।

এই ঘটনার সপ্তমদিবস অতিক্রান্ত হওয়ার পর নিশাবশেষের তরল অন্ধকারে সহস্র সহস্র ছায়ামূর্তির মত বিশাল এক সেনাবাহিনী মহানগরী পাটলিপুত্র অবরোধ করল। ভারতের ইতিহাসে এই ঘটনার উল্লেখ আছে, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিশ্ববিশ্রুত নৃপতি মহামতি কনিষ্কের উত্তরসূরী ভারতের শেষ কুষাণ রাজা কীদার পীরো রাজপুতনা এবং কাশ্মীর জয় করে পুরুষপুরে পেশোয়ার প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মগধ আক্রমণ করেছিল।

শত্রুসেনা আসছে দেখেই পাটলিপুত্রের নৈশপ্রহরীরা দুন্দুভি বাজিয়ে নগর-বাসীকে সতর্ক করল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যসচিব বর্ষকার এবং সান্ধিবিগ্রহিকের নির্দেশে দুর্গনগরী পাটলিপুত্রের লৌহনির্মিত দশটি প্রধান তোরণদ্বারে ইন্দ্রকীলক (খিল) এঁটে দেওয়া হলো। কীদার পীরোর সেনা-সমুদ্রের মাঝখানে সমগ্র নগর ক্ষুদ্র পাষাণদ্বীপের মত জেগে রইল।

প্রাকারে প্রাকারে ভল্লহস্তে প্রহরীরা ঘুরতে লাগল। লৌহজালিকে (লোহার জাল দিয়ে তৈরী বর্ম) সর্বাঙ্গ আচ্ছাদন করে ইন্দ্রকোষে (দুর্গ প্রাচীরের একপ্রকার স্তম্ভ। ভেতর থেকে তীর ছোঁড়ার জন্য এর গায়ে ছিদ্র থাকত) লুকিয়ে ধনুহস্তে ধানুকীরা পরিখার পরপারে কুষাণ সেনাদের ওপরে বিষ-বিচূরিত শর নিক্ষেপ করছিল।

ওদিকে পুরীমধ্যে আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় ভয়ার্ত্ত নাগরিকদের আর্ত কোলাহল শুনে সম্রাট রামগুপ্তের সুখনিদ্রা ভঙ্গ হলো। ধ্রুবস্বামিনীকে নিয়ে প্রমত্ত নিশিযাপন ও তার আশ্লেষক্লান্তিতে তার দেহ যেন ভেঙ্গে পড়েছে। তীব্র মদিরার প্রভাবে আচ্ছন্ন চোখদুটো কোন রকমে উন্মীলন করে ক্ষীণ অস্ফুটকণ্ঠে বলল, কিসের গোলমাল—

কুষাণ সেনারা নগরী আক্রমণ করেছে, প্রতিহারী বলল। কক্ষের চারি-দিকে দৃষ্টিপাত করে রামগুপ্ত বলল, আমার তরবারি কোথায়?

প্রতিহারী দ্রুতপদক্ষেপে মণিমুক্তাখচিত কোষবদ্ধ তরবারি এনে দেখল, মগধেশ্বর আবার নিদ্রামগ্ন হয়ে গিয়েছেন—

কিন্তু আশ্চর্য ! বিখ্যাত রণপণ্ডিত কীদার পীরো কে জানে কোনদূরভিসন্ধিতে দুর্গ আক্রমণ করল না। শুধু দশ সহস্র রণনিপুণ কুষাণ-সেনা পাটলিপুত্রের চারিদিকে ক্রোশের পর ক্রোশ, যোজনের পর যোজন ব্যপ্ত করে বস্ত্রাবাসের ছাউনি ফেলে অবরোধ করে বসে রইল।

কয়েকদিন পর। কুষাণ রাজ্যের দূত নিয়ে এল বিচিত্র এক প্রস্তাব—ধ্রুবস্বামিনী নাম্নী পরমভট্টারিকাকে কুষাণ সম্রাটের শিবিরে প্রেরণ করলে তারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করবে। এই প্রস্তাবে মগধেশ্বর সম্মতি না দিলে দুর্গাবরোধ চলবে।

মন্ত্রণাগৃহে সভার জরুরী অধিবেশন ডাকা হলো। মুখ্যসচিব বর্ষকার, রাজমাতা কুমারদেবী চন্দ্রগুপ্তের চোখেমুখে দুশ্চিন্তা আর উৎকণ্ঠার চিহ্ন। শুধু সভার কেন্দ্রস্থলে রত্নসিংহাসনে মহারাজ রামগুপ্ত নির্লিপ্ত ও নির্বিকার।

বর্ষকার। মহারাণীর কথা জানল কি করে বর্বর, ম্লেচ্ছ ওই কীদার পীরো—

কুমারদেবী। দেখুন, ওই পিশাচিনী রূপসীই হয়তো বর্বরটাকে ডেকে এনেছে—

বিদূষক। না, মহাদেবী, অত্যুজ্জ্বল আলোর খোঁজ পতঙ্গ পাবেই—

হঠাৎ সভাস্থ সকলকে বিস্মিত করে দিযে মহারাজ রামগুপ্ত বলল, দাও ধ্রুবস্বামিনীকেই পাঠিয়ে দাও। পাটলিপুত্র বিপদমুক্ত হোক—

হ্যাঁ ঠিক বলেছো বৎস, কুমারদেবী বললেন, সুন্দরী নারীর অভাব নেই মগধে—

বলছেন কি আপনারা ? তীব্র প্রতিবাদে চন্দ্রগুপ্তের চোখদুটো জ্বলে উঠল, ধ্রুবস্বামিনী রীতিমত রাজকুলবধূ—পণ্যবধূ নয়, যে হস্তান্তর করা যায়। মগধ এই অসম্মানজনক প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হতে পারে না—

সাধু—সাধু ! সভাসদরা বলল, আমরা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। এই হীন সর্ত্ত সমগ্র দেশের পক্ষে অপমান।

প্রত্যাখাত হয়ে দূত ফিরে গেল। বিপদের আশঙ্কা আরও তীব্র হলো। সেইদিন ধ্রুবস্বামিনী চঞ্চল আর বিক্ষুব্ধ হয়ে রাজপুরীর দিকে কি যেন অন্বেষণ করছিল। সমুদ্রগুপ্তকেও যে শৈশবে লালিত করেছে এমন একজন বর্ষীয়ান পরিচারিকাকে বলল তুমি মোহনগৃহের সন্ধান জানো ? রাজধাত্রী কিছুই বলতে পারল না।

সেযুগে প্রত্যেকরাজভবনে একটি গোপন কক্ষ থাকতো—তার নাম মোহনগৃহ। দেখতে অন্যান্য সাধারণ কক্ষের মতই। কিন্তু তার প্রাচীর ও হর্ম্যতলে

গুপ্তদ্বার থাকতো—সেই গুপ্তদ্বার দিয়ে ভূনিম্নস্থ সুড়ঙ্গপথে পুরীর বাইরে যাওয়া যেত। স্বয়ং সম্রাট ছাড়া আর কেউ জানতো না এই পথের সন্ধান। উৎসুক হয়ে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ রাজপ্রাসাদের একান্তে একটি পরিত্যক্ত ঘর নজরে পড়ল ধ্রুবস্বামিনীর। ঘরটি অত্যন্ত অপরিস্কার। ছাদের মধ্যস্থলে এক জায়গায় একটি রক্তবর্ণ প্রস্তর দেখতে পেল। একটি দীর্ঘ বংশদণ্ড দিয়ে সেই প্রস্তরখণ্ড সরিয়ে দিতেই চতুষ্কোণ একটি কালো গহ্বর দেখা দিল! রন্ধ্রটি পরীক্ষা করে দেখল, ভেতরে ধাপে ধাপে সোপান নেমে গিয়েছে। সেই কক্ষের অর্গল বন্ধ করে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করল ধ্রুবস্বামিনী। ইষ্টক নির্মিত সেই সুড়ঙ্গপথ এত সংকীর্ণ ও স্বল্পচ্চ যে মাথা নীচু করে চলতে হয়। বহুদূর পথ অতিক্রম করার পর সে অকস্মাৎ মুক্ত বায়ুর হিল্লোলে আঘ্রাণিত পৃথিবীর মাটির ঘ্রাণ পেল। গণ্ডকীনদীর তীরে একটি বৌদ্ধ মঠে শেষ হয়েছে এই পথ। দুর্গনগরী পাটলিপুত্র থেকে নিষ্ক্রমণের পথের সন্ধান পেয়ে কেন যেন ধ্রুবস্বামিনী মেরুমরালীর মত হর্ষোৎফুল্লা হয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করল প্রাসাদে। আর কিসের যেন হীনমন্যতার গ্লানির অপচ্ছায়ায় আবৃত তার মনের গভীর অন্ধকারে। সেই দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথ একটা আলোকজ্জ্বল জ্যোর্তিময় রেখার মত হয়ে পরিস্ফুট উঠল সঙ্গে সঙ্গে মহৎ ও উদার একটা অনুভূতির প্রশান্তিতে আবিষ্ট হয়ে এল তার মন।

সেইদিনই নিশীথরাত্রিতে চন্দ্রগুপ্তের কক্ষে এল ধ্রুবস্বামিনী।

যবনরাজের কাছে আমাকে প্রেরণে বাধা দিলেন কেন সুহৃত্তোম কুমার?

ভদ্রে, আপনাকে বিক্রি করে সুখ ও শান্তি আমার কাম্য নয়—

তীব্র হর্ষে উদ্ভাসিত হলো ধ্রুবস্বামিনীর মুখমণ্ডল। স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল, প্রাণাধিক কুমার! আপনি জানেন, না কুষাণ সেনার এক একটি হিংস্র জল্লাদ। আক্রমণ করলে তারা আবাল বৃদ্ধ বনিতা নির্বিচারে হত্যা করবে—

যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ বাধা—আমি একটা উপায় আবিষ্কার করেছি কুমার, নগরী শত্রুরা অধিকার করলেও এক বিন্দুও ধনসম্পদ পাবে না—আর একটিও নিরীহ নাগরিক প্রাণে মরবে না—

বলেন কি মহাদেবী! তীব্র আবেগের অতিশয্যে ধ্রুবস্বামিনীর মৃণাল ভুজযুগল আবেষ্টন করল কুমার। উত্তেজনায় কম্পিত কণ্ঠে বলল, এই দুর্যোগ নিশায় তুমি—আপনি আলোকবর্ত্তিকার—

আমার প্রাণাধিক কুমার বলেই চন্দ্রগুপ্তের সুখস্পর্শে বর্ষাদিনের কদম্বফুলের

মত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে তার বিম্বোষ্ঠে তপ্তচুম্বন এঁকে দিল ধ্রুবস্বামিনী। তীব্র জলোচ্ছ্বাসের মত তার বক্ষোদেশে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুমারের দেহটাকে মথিত করতে করতে অস্ফুট আর উদ্‌ভ্রান্ত কণ্ঠে বলল, আমি মহাশ্মশানের আলো প্রিয়—আমার জন্মলগ্নে অভিশাপ আছে—

তুমি এসব কি বলছো ধ্রুবস্বামিনী !—কি করছো তুমি—

না—না বাধা দিও না প্রাণাধিক—নিবিড় সুখের অনুভবে তলিয়ে যেতে যেতে বহু—বহু দূর থেকে ক্ষীণ অস্ফুটকণ্ঠে বলল, আমার বহু বিনিদ্র রজনীর বাসনাটা— অনির্বচনীয় একটা মাদকতায় তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল। বিবশ হয়ে গেল তার চেতনা।

পরদিবস রাত্রে রামগুপ্ত যখন রত্নখচিত গজদন্তনির্মিত পালঙ্কে ধ্রুব-স্বামিনীর তনুমাধবীলতাকে বেষ্টন করে পরমসুখে নিদ্রামগ্ন হয়ে গিয়েছিল ঠিক সেই সময়—সেই সময় তীব্র শ্বাসরোধকর ধূমে তার সুখনিদ্রা ভঙ্গ হলো। নিদ্রাজড়িত চক্ষু দুইটি বহু আয়াসে উন্মীলিত করে বিকৃত কণ্ঠে ডাকল—ধ্রু—ব—স্বা—মি—নী—

আগুন—আগুন ! রাজপ্রাসাদের বাসিন্দাদের সমবেত তীব্র আর্ত কোলাহলের ভেতরে বিলীন হয়ে গেল সম্রাটের কণ্ঠস্বর। রাজপুরীর প্রাসাদে প্রাসাদে লেলিহান অগ্নি অমাবস্যা রাত্রির মসীকৃষ্ণ অন্ধকারকে শত শত খণ্ডে বিদীর্ণ করে উল্লাসে প্রলয়ঙ্করী নৃত্য করছে। সেই ভয়াবহ অগ্নি বহুদূর ব্যপ্ত অন্ধকার আকাশকে উদ্ভাসিত করে তুলল। রাজপ্রাসাদের গৃহপালিত ময়ূরশারিকা হরিণ শিশুদের আর্তস্বরে আর সর্বগ্রাসী অগ্নির তীব্র গর্জনে নিশীথ রাত্রির বাতাস আলোকিত হয়ে উঠল।

অগ্নি ক্রমশঃ আরো পরিব্যপ্ত হতে লাগল। রাজপুরীর প্রাসাদগুলো ভস্মীভূত করে নগরের অন্যান্য গৃহাভিমুখে ধাবিত হলো।

ধ্রুবস্বামিনী তখন কোথায় ?

ধ্রুবস্বামিনী তখন আলুলায়িতকুন্তলে, স্খলিত বসনে এক হস্তে প্রজ্জ্বলিত মশাল নিয়ে বিপদনাশিনী রণচণ্ডীর মত উত্তেজিত বিহ্বল নাগরিকদের সেই সুড়ঙ্গ পথে নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করছিল। বিক্ষুব্ধ জনতা বাহ্যজ্ঞানশূন্য ত্বরায় উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে জলোচ্ছ্বাসের মত সুড়ঙ্গের মুখে আসছে। উচ্চকণ্ঠে অভয় দিয়ে ধ্রুবস্বামিনী বলছে, কোন ভয় নেই। কেউ প্রাণে মরবে না—সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করলেই গণ্ডকী নদীর তীরে পৌঁছাতে পারবে—

জয় রাণীমার জয়! সহস্রকণ্ঠে সম্মিলিত জয়ধ্বনিতে সেই সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ পথ মুখরিত হয়ে উঠল।

রাজকুমার চন্দ্রগুপ্ত তখন সেই সুড়ঙ্গের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে স্থির বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার ধ্রুবস্বামিনীর দিকে আর একবার দূরে প্রজ্জলিত রাজপুরীর বিধ্বংসী অনোল্লাস নিরীক্ষণ করছিল। আর মনের ভেতরে বেদনার ভার পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল—দারুনির্মিত প্রাসাদের ওই লেলিহান অগ্নিতেই জীবন্ত দগ্ধ হচ্ছে তার—তার আত্মীয় পরিজন—

তোমার মাতৃদেবী, তোমার অগ্রজের কথা চিন্তা করে ব্যাকুল হয়েছো প্রিয়তম, ক্ষীণ আলোয় যেমন পুঁথি পড়ে তেমনি ঝুঁকে পড়ে মশালের আলোয় তার ব্যথিত মুখের দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহকণ্ঠে বলল ধ্রুবস্বামিনী, যাদের জন্য তুমি ভাবছো, তারা গুপ্তসাম্রাজ্যের শ্মশান রচনা করছিল প্রিয়তম—ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দ্রুত উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, মোহনগৃহও আক্রান্ত হয়েছে। এখুনি অগ্নি সুড়ঙ্গমুখে প্রবেশ করবে আর বিলম্ব করো না—এস প্রাণাধিক,বলেই হস্ত আকর্ষণ করে নিয়ে চন্দ্রগুপ্তকে নিয়ে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করল ধ্রুবস্বামিনী যেতে যেতে পরমপ্রীতিভরে তার পৃষ্ঠদেশ বেষ্টন করে ক্ষীণ করুণ কণ্ঠে বলল, তুমি আমাকে ক্ষমা করো কুমার। আমিই রাজপুরীতে এবং নগরীর দারু প্রাসাদগুলোতে অগ্নিসংযোগ করেছি—কেন করেছি তা তোমাকে বলছি—

কথা বলতে বলতে সুড়ঙ্গপথ থেকে নিষ্ক্রমণ দ্বারের সম্মুখে এসে অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো ধ্রুবস্বামিনী। চন্দ্রগুপ্তের চরণে মস্তক রেখে প্রণাম করে বলল, এইবার—আমাকে বিদায় দাও প্রিয়তম—

সে কী? উত্তেজিত বিস্মিত কণ্ঠে বলল চন্দ্রগুপ্ত।

না—না, আমি তোমার সঙ্গে যাওয়ার যোগ্য নই প্রিয়তম—

কেন—কেন?

কীদ্বার পীরো আমার পিতা—তারই এক বারাঙ্গনার গর্ভজাতা—আমি পুরুষপুরের নগরসুন্দরী প্রিয়তম—অশ্রুসজল চোখদুটো চন্দ্রগুপ্তের বিহ্বল মুখের ওপরে মেলে ধরে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, এসব জেনেও তুমি যদি ক্ষমা করতে পারো—তাহলে শুধু তাই করো—

না—না, ধ্রুবস্বামিনী, তুমি যেই হও—তুমি এসো।

তুমি ডেকো না—ডেকো না দুহাতে কান ঢেকে ধ্রুবস্বামিনী হৃদয়বিদার-কণ্ঠে বলল, আমি যেতে পারবো না প্রিয়তম। আমি বারাঙ্গনা। কুষাণ

রাষ্ট্রশক্তির ক্রীড়নক—যতদিন থাকবো ততদিন ক্রীদার পীরোর হুকুমে আমাকে গুপ্তচরের ঘৃণিত কাজ করতে হবে, তীব্র উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ে বলল ধ্রুবস্বামিনী, অবন্তী সৌরাষ্ট্র আরও কত রাজ্য আমার জন্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে, কুমারের ব্যথিত মুখের দিকে কোমল করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, শুধু তোমাকে—তোমাকে দেখেই মগধে এসে হেরে গেলাম প্রিয়তম—

অগ্নি সুড়ঙ্গ মুখে প্রবেশ করছে ধ্রুবস্বামিনী—তুমি চলে এস—

না—না আমায় মরতে হবে প্রাণাধিক—আবার জন্মান্তরে যখন দেখা হবে—তখন তোমার ধ্রুবস্বামিনীকে সঙ্গে নিও—বলেই সবলে টেনে সুড়ঙ্গের পাষাণ দ্বার বন্ধ করে দিল—

ধ্রুবস্বামিনী—চন্দ্রগুপ্তের ব্যাকুল কাতর আহ্বান পাষাণ প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

সবগ্রাসা অগ্নি সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করল।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র এই চন্দ্রগুপ্তই 'বিক্রমাদিত্য' নাম নিয়ে বিদ্যায় ও সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে ও শিল্পে যে স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করেছিল, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অনেকগুলো পাতাজুড়ে তার ইতিবৃত্ত লেখা আছে। কিন্তু সেই সুদীর্ঘ গৌরবজ্জ্বল ইতিহাসের কোথাও এতটুক্ জায়গা হয় নি ধ্রুবস্বামিনীর।* রাজরাজড়াদের রণনিপুণতা, রাজ্যবিস্তার ও সুশাসনের ক্লান্তিকর বিবরণে কণ্টকীর্ণ ইতিহাসে অঘটন-ঘটনপটিয়সী অন্যান্য নগর-সুন্দরীদের মতই ধ্রুবস্বামিনীও—

উপেক্ষিতা।

* হিন্দী সাহিত্যকোষ বলছে—খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক বিচিত্র এই সুন্দরী রমনী ধ্রুবস্বামিনী! হিন্দী সাহিত্যের দিকপাল জয়শঙ্কর প্রসাদ ধ্রুবস্বামিনীর ইতিবৃত্তকে ভিত্তি করে একটি নাটক ও রচনা করেছেন। (হিন্দী সাহিত্যকোষ দ্বিতীয় ভাগ—পৃঃ ২৫৯)

সপ্তম স্তবক

—তুমি সারা হিন্দুস্থানের ভাবী সম্রাট আর আমি একজন নগরসুন্দরী। তবুও তুমি আমাকে ভালবেসেছো। এখন মরতেও আমাব দুঃখ নেই—

নগরসুন্দরী।

নীলকণ্ঠ—যার আর এক নাম। ভোগী-কামী পুরুষদের অতিরিক্ত যৌন আবেগের বিষ তারা ধারণ ক'রে সমাজজীবনকে সুস্থ রাখে বলে সমাজ-বিজ্ঞানীরা তাদের এই নামে ভূষিত করেছেন। দেহসম্ভোগের উপকরণ ছাড়াও নৃত্যগীতপটিয়সী এবং চতুঃষষ্ঠী কামকলায় পারদর্শিনী যে গণিকারা দেশের সংস্কৃতির সুমহান ঐতিহ্যকে পুষ্ট করে তুলেছিল তাদের সেই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা হিন্দুযুগের শেষের দিকে ম্লান হযে আসে। ঐতিহাসিকরা তার কারণ হিসেবে মনে করেন—গুপ্তযুগ থেকে শুরু করে শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজবংশ সেন-নৃপতিদের আমল পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রায় ছয়শো বছরে দেশের বিপুল ধনসমৃদ্ধি হয়েছিল। সেই প্রাচুর্যের হাত ধরে এসেছিল বিলাসিতা। সেই বিলাসিতা স্বাভাবিক নিয়মেই যৌনবিকার বা ব্যভিচারে পরিণত হযেছিল। পৃথিবীর সব দেশে যেমন তেমনি এদেশেও যে কোন পাপাচারের একটা ধর্মীয় আবরণ ছিল।

মহাভারতে, রামায়ণে, জাতকে, কামসূত্রে, অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত যে অভিজাত বিদুষী লাস্যজীবি বারবিলাসিনীরা সমাজে সম্রাজ্ঞীর মহিমায় বিরাজ করতো তাদেরই উত্তরসূরীরা শুধুই দেহপোজীবিনীতে পরিণত হতে শুরু করেছিল যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় প্রথায় তার নাম—

দেবদাসীপ্রথা।

এই প্রথার উৎপত্তির ইতিহাস কুয়াশাচ্ছন্ন। তবে জানা যায় মিশর, গ্রীস অ্যাসিরীয়া, ফিনিসীযা ইত্যাদি প্রাচীনদিনের সভ্য দেশগুলোর মত ভারতেও বহুদিন থেকে দেবতার মনোরঞ্জনের জন্য দেবদাসী নিযুক্ত করার প্রথা ছিল। একসময় জগন্নাথের মন্দির থেকে শুরু করে দক্ষিণাপথে প্রায় প্রত্যেক দেবালয়ই দেবদাসীদের নৃত্যগীতে মুখরিত থাকতো। কিংবদন্তী বলে কামাখ্যার সুবিখ্যাত দেবায়তনে প্রায় পাঁচ হাজার দেবনর্তকী ছিল।

শাস্ত্রে আছে দেবদাসীর প্রয়োজনীয়তা হলো, 'দেবানাং দাসী' অর্থাৎ দেবতাগণের সেবায় নিযুক্ত কিঙ্করী! বলাবাহুল্য দেবদাসীকে আজীবন কুমারী থেকে নাচে গানে দেবতাকে তুষ্টকরতে হতো আর সেই সুযৌবনাদের ব্রহ্মচর্যের অস্বাভাবিক জীবনের সুড়ঙ্গ পথেই প্রবেশ করতো যৌন ব্যভিচার। ইতিহাস বলছে, কালক্রমে এরা দেবায়তনের পূজারী কিম্বা তার (মন্দিরের) ধনী-বিলাসি কর্তৃপক্ষদের দেহসম্ভোগের উপকরণে পর্যবসিত হতো। এইভাবেই মৌর্য রাজত্বের গৌরবোজ্জ্বল কালে যে গণিকারা রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হতো, সেই রাষ্ট্রীয় মালিকানা যেই পরবর্ত্তীকালের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের নিয়মানুযায়ী ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিবর্ত্তিত হলো অমনি নৃত্যগীতে পারদর্শিণী, বিদুষী, শাস্ত্রজ্ঞ নগরশোভানারা তাদের সেই আভিজাত্যমণ্ডিত মহিমার উচ্চ আসন থেকে অতল পাঁকের ভেতরে নামতে শুরু করল।

ভারতের কোন মন্দিরে, কে প্রথম কয়জন দেবদাসীকে নিয়োগ করেছিল, —সে ইতিহাস জানা যায়না। তবে কলহন রচিত "রাজতরঙ্গিনী" (কাশ্মীরের ইতিহাস) বলছে, অষ্টম শতাব্দীতে উত্তরবাংলার ধনেজনে সমৃদ্ধ জনপদ পুণ্ড্র-বর্দ্ধনের একটি দেবায়তনের কমলা নাম্নী* এক রূপরম্যা দেবকিঙ্করী ছিলেন ঐশ্বর্যশালী পুরোহিতের ভোগ্যা। ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্যে আছে পাল-রাজত্বের শ্রেষ্ঠ নৃপতি রামপাল প্রতিষ্ঠিত রাজধানী রামাবতীর প্রত্যেক দেবালয়েই শোভনাঙ্গী অনেক দেবদাসী ছিল। আর বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজবংশ—সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গাধীপ বিজয়সেনের বিলাসের সহচরী যে ছিল তারই স্থাপিত দেবমন্দিরের নৃত্যকুশলী ধন্যযৌবনা শত শত দেবদাসী তার পাথুরে প্রমাণ হলো—দেওপাড়া শিলালিপি। আর একটি তাম্রশাসনে ব্রাহ্মীঅক্ষরে উৎকী করা আছে, শেষ স্বাধীন হিন্দু নৃপতি লক্ষণ সেনও নিয়মিত জঘনচপলা দেববনিতা পরিবৃত হয়ে বাস করতেন।

এল মুসলমান যুগ।

বখতিয়ারের বঙ্গবিজয় (১২০২ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে শুরু করে আকবর পর্যন্ত (১৫৪২-১৬০০), সুদীর্ঘ প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের ইতিহাসে বারাঙ্গনাদের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। বরং বলা যায়, একদা যে কোন জনপদের

---

* Luxury and Immorality (History of Bengal) vol. I. R. C. Majumder P. 618

ভূষণস্বরূপা, যে কোন নগরের প্রথমশ্রেণীর নাগরিক সেই বারবিলাসিনীদের ওপরে বাদশাহ-সুলতান-নবাব-আমীর-ওমরাহদের, বিত্তশালী ব্যক্তিদের অর্থাৎ এক কথায় সমাজের উঁচুতলার মানুষদের প্রভুত্ব ও শাসন আরও কঠোর হলো। সৃষ্টি হলো হারেম!

মোগলযুগের একমাত্র তথ্যনির্ভর ইতিহাস আইন-ই-আকবরীতে যাকে বলা হয়েছে 'ইম্পিরিয়েল সিটি অফ উইমেন'! বাদশাহের অসংখ্য রূপবতী স্বাস্থ্যপুষ্ট পত্নী, উপপত্নী, নর্তকী, ক্রীতদাসী পরিবৃত বিশাল এক সুরক্ষিত নগরী। ব্যক্তি বিশেষের (সম্রাটের) লালসা চরিতার্থের জন্য হারেমের সমারোহ যত বাড়তে লাগল ততই একদা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সার্বজনীন আনন্দের উৎস 'বেশ্যাপল্লী' তার শ্রী ও জৌলস হারিয়ে শুধুই আমিষলোলুপ মানুষের উদ্দাম যৌনলীলার বারাণসী হয়ে উঠল।

হারেমের বাদশাহের অনুগ্রহপুষ্ট দু'একজন সৌভাগ্যবতী ছাড়া বেশীর ভাগেরই জীবন ছিল হতাশার অন্ধকারে ঢাকা। সম্রাটের সান্নিধ্যবঞ্চিত তাদের বিক্ষুব্ধ মন ও উদ্বেল এবং বুভুক্ষু যৌবনভার তাদের বিপথে নিয়ে যেত। তারা প্রায়ই উচ্ছৃঙ্খল, কামুক রাজপুত্র, আমীর, মনসবদার ইত্যাদি বিবিধ রাজপুরুষদের লালসার শিকার হতো। তাদের খেয়ালখুশীর ওপর নির্ভর করতো দুর্ভাগিনীদের জীবন। যেমন হয়েছিল—

আনারকলির।

গোড়া থেকে বলি। আনারকলির ইতিবৃত্ত—

মোগলযুগের এক হতভাগিনী রূপজীবিনীর করুণ ও মর্মান্তিক কাহিনী।

রাজসভা আলো করে বসে আছেন মহামতী আকবর।

আজ প্রথম আর্জি কার?

পাথরব্যবসায়ী গিয়াসুদ্দিন মধ্য এশিয়া থেকে কি এক মহামূল্যবান প্রস্তর নিয়ে এসেছে জাঁহাপনা, রাজসভার প্রধান নাজীর বলল।

তার পণ্যসহ তাকে আমার সামনে হাজির করো—

গিয়াসুদ্দিন এল। তার সঙ্গে বোরখা পরা এক স্ত্রীলোক।

সে কি! তোমার পণ্য কই—এ তুমি কাকে নিয়ে এলে?

জাঁহাপনা, অপরাধ নেবেন না। মহামূল্যবান প্রস্তর নয়—এই আমার পণ্য, বলেই তার মুখের আবরণ সরিয়ে দিল ব্যবসায়ী গিয়াসুদ্দিন।

যেন বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল। সভার প্রতিটি লোকের চোখ ধাঁধিয়ে

গেল উগ্র সাদা আলোর ঝলকে। আশ্চর্য রূপ তার। জ্যোৎস্নার মত গায়ের রঙ। সুডৌল মুখে শান্ত আর স্নিগ্ধ কমনীয়তা।

বাঃ—অস্ফুট স্বরটা বেরিয়ে এল আকবরের মুখ থেকে।

এ যে একেবারে আনারকলি! উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল রসিক বীরবল।

তুমি একে পেলে কোথায়?

সে এক ইতিহাস জাঁহাপনা! গিয়াসুদ্দিন বলতে শুরু করল—আমার ব্যবসার সূত্রে মধ্য এশিয়ার নানা জায়গায় আমাকে যেতে হয়। আপনি জানেন জাঁহাপনা, এই মধ্য এশিয়ার মরুভূমির ডাকাতরা সাপের চেয়ে হিংস্র আর ভয়ঙ্কর। এই কারণে আমি একা কখনও এসব অঞ্চলে যাই না। সঙ্গে থাকে বিশ্বস্ত এবং জোয়ান দশ বারোজন দেহরক্ষী। আর পাথরের বাক্স বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রায় একশো কুলী। তাদের প্রত্যেকের কাছে থাকে ধারালো তলোয়ার। আর আমার কাছে থাকে পর্তুগীজদের তৈরী আগ্নেয়াস্ত্র—বন্দুক।

এই মরুভূমির অঞ্চলের একটি পান্থশালায় এক রাত্রির জন্য আশ্রয় নিয়েছি। আমার লোকজনরা ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিন মরুভূমির ওপর দিয়ে দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছে।

ঘুম নেই আমার। আফিং ফুরিয়ে গিয়েছিল জাঁহাপনা—

বক্তব্য সংক্ষেপ করো। তোমার নেশার কথা শোনার মত সময় আমার নেই, গর্জে উঠলেন বাদশা।

জী-হুজুর—বান্দার গোস্তাকি মাফ করবেন, হাতজোড় করে আবার বলতে শুরু করল গিয়াসুদ্দিন, ঘুম আসছিল না বলেই জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। জ্যোৎস্নার আলো থৈ থৈ করছে মরুভূমিতে। যতদূর তাকানো যায়, মনে হয় যেন একটা সাদা চাদর বিছানো রয়েছে একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত।

হঠাৎ চমকে উঠল আমার চোখের দৃষ্টি। দূরে—অনেক দূরে মেটে মেটে আলোয় ভরা মরুভূমির বুকে কালো কালো কতগুলো ছায়ামূর্তি কাকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে!

বহু—বহু দূর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—কে কোথায় আছো আমাকে বাঁচাও—বাঁচাও—

নিশ্চয়ই ডাকাতরা কাউকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমার লোকজন নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম। সামনে যেয়ে দেখি—

হঠাৎ চুপ করে গেল গিয়াসুদ্দিন। তার মুখে লজ্জার ছায়া পড়ল।

কি থামলে কেন—কি দেখলে ?

ফুলের মত এই মেয়েটির দেহের কোথাও একটু কাপড়ের চিহ্ন নেই। একেবারে নিরাভরণ। তাকে তলোয়ারের ডগা দিয়ে খোঁচাচ্ছে। আর সে প্রাণভয়ে দৌড়াচ্ছে।

আমার অনুচররা ডাকাতদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর আমি বন্দুক বাগিয়ে চিৎকার করে বললাম—হাত তুলে এক পা এক পা করে পেছিয়ে যাও—

বন্দুক দেখেই ওরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ওরা হাত তুলে পিছু হটতে লাগল। দস্যু সর্দার মিনতি করে বলল, অনুগ্রহ করে প্রাণে মারবেন না—আমরা যাচ্ছি।

একটু থামল সে। আবার যেন বহু—বহু দূর থেকে বলল,সেই থেকে আমার কাছে মেয়ের মতই আছে। কিন্তু জাঁহাপনা আমার বয়স হয়েছে—

কুছ পরোয়া নেই—খাপসুরৎ চেহারা—ও আমার হারেমে, বলেই হঠাৎ থামলেন সম্রাট। স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে যেন নিজের মনে মনেই বললেন, না হারেমে নয়—ও আমার সভা নর্তকীদের ভেতরে নর্তকী হবে—

খুব খুশী হলো গিয়াসুদ্দিন।

বলল—খোদা আপনার মঙ্গল করবেন জাঁহাপনা।

যখন রাজসভায় আনারকলির ভবিষ্যৎ ঠিক হচ্ছিল তখন সম্রাট এবং প্রধান পারিষদ বীরবল, টোডরমল, আবুল ফজল ইত্যাদির ভেতরে কেউ একজনও জানতে পারলেন না,আর একটি চোখের তীব্র দৃষ্টি আনারকলির সেই স্বর্ণলতার মত তন্বী বরতনুতে সূঁচের মত বিঁধছিল ; জানতে পারলেন না তার তরুণ রক্তে আগুন ধরে গিয়েছে। জানতে পারলেন না একটা উদগ্র লালসা তার চেতনার ভেতরে বিষধর সাপের মত ফঁসে উঠছে।

কে সে ?

আর কেউ নয়, যুবরাজ সেলিম। ইতিহাসে যিনি জাহাঙ্গীর বলে খ্যাত।

বেশী দেরী হল না।

সেই দিনই রাত্রে নর্তকী মহলের প্রধান রক্ষী খোজা হাফেজকে ঘুস দিয়ে নর্তকীদের প্রধানা রাবেয়ার সঙ্গে দেখা করল সেলিম। তাকে মনের বাসনা খুলে বলল।

কিছুই বলল না রাবেয়া।

ভেতরে ভেতরে আনারকলির ওপরে হিংসায় জ্বলে যেতে লাগল। এমন আশ্চর্য রূপ যে এখানে এসেই কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই স্বয়ং যুবরাজকে আকৃষ্ট করে ফেলেছে।

কি চুপ করে রইলে কেন রাবেয়া ?

যুবরাজ আমার গোস্তাকী মাফ করবেন ! সে একজন সামান্য নর্তকী আর আপনি হিন্দুস্থানের ভাবী সম্রাট—

না—ওসব কথা রাখো—ওকে দেখার পর থেকেই কেমন পাগলের মত হয়ে গিয়েছি রাবেয়া। কোন কাজে মন দিতে পারছি না, অতবড় শক্তিশালী সম্রাটের তনয়ের কণ্ঠে দীনদুঃখী ভিখারীর করুণ মিনতি ফুটে উঠল।

এই হয়—এই নিয়ম। প্রেম মুহূর্তে রাজসিংহাসন থেকে পথের ধুলোয় নামিয়ে আনতে পারে !

সেই শুরু।

যুবরাজের অনুরোধে এবং মোটা উৎকোচে বশীভূত হয়ে ফুলওয়ালীর ছদ্মবেশ পরিয়ে আনারকলিকে বাইরে পাঠায় রাবেয়া আর হাফেজ। পাঠায় প্রতি রজনীতে।

প্রথম দিন আনারকলি দ্বিধা করছিল।

ভয়ে, আশঙ্কায় উত্তেজনায় দুরু দুরু কাঁপছিল তার বুক। তার মনে হয়েছিল—মনে হয়েছিল ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবন তার। অদৃষ্ট তাকে আবার কোন অজানা বিপদের ভেতর টেনে নিয়ে চলেছে !

ভাবছিস কি পোড়ারমুখী, জ্বলে উঠেছিল রাবেয়া, তোর এই আগুনের মত রূপের জন্যই তো পতঙ্গের মত ছুটে এসেছে স্বয়ং রাজকুমার !

আনারকলি যায়। যেতে হয় অভিসারে। প্রথমদিনই সে বলেছিল, বলেছিল বেশ দৃঢ়গলায় এবং আস্তে আস্তে, রাজকুমার, আমি খুব সামান্য রমণী। আপনি আমাকে—

সামান্য তুমি হতে পারো, অসামান্য তোমার রূপ আনারকলি। আমি তোমাকে—তোমাকে, প্রবল উচ্ছ্বাসে আর কিছুই বলতে পারল না সেলিম।

দিন কাটে। মাস যায়।

নির্জন রাত্রে আসে সেলিম। আসে জ্যোৎস্নাভরা সন্ধ্যায়। আসে স্তব্ধ দুপুরে।

আনারকলির ভয় আর সঙ্কোচ কেটে যায়। সে এখন সুখস্বপ্নের ভেতরে ডুবে থাকে। আফিমের মিষ্টি নেশায় মৌতাতের মত আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তার চেতনা। কিন্তু—

একদিন যুবরাজের প্রাসাদের উদ্যানে বসে ছিল আনারকলি। বসেছিল বকুল গাছের নীচে শানবাঁধানো বেদীতে !

টুপটাপ ঝরছে বকুল।

তখনও সেলিম আসেনি। শিকারে গিয়েছে। এখুনি ফিরে আসবে।

আনারকলির সময়টা আর কাটেনা। সে উঠে দাঁড়াল।

সন্ধ্যার বিষন্ন অন্ধকার নামছে। যতদূর চোখ যায়, বেলী, মল্লিকা, মালতী, চম্পা, চামেলী আরও কত রকমের ফুল বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে।

আনারকলি প্রজাপতির মত যেন হাওয়ার ওপর পা ফেলে গেল ফুলের বনে। একটা একটা করে বেলীফুল নিয়ে মালা গাঁথতে বসল। আজ রাজকুমারকে অবাককরে দেব। প্রতিদিন বাঁদীর হাতের তৈরী মালা পরে ! আজ—

খপ করে দুটো হাত এসে পড়ল তার চোখে।

কে—কে ?

হাতে সুগন্ধী সেরাজীর (মদ) গন্ধ। আর বুঝতে বাকী রইল না কে !

চোখ ছেড়ে দিয়ে তার নরম কবুতরের মত নরম আর হাল্কা দেহটাকে যুবরাজ তার চওড়া বুকের ভেতরে টেনে নিল।

আঃ—ছাড়ো—ছাড়ো চারিদিকে তোমার বান্দা বাঁদীরা ঘোরাঘুরি করছে। তারা দেখে ফেলবে—

সেলিম ছাড়ল না।

আরও ঘন করে তাকে কাছে টেনে নিয়ে চুমোয় চুমোয় তার মুখখানা আচ্ছন্ন করে দিল। আবেশে আনারকলির চোখ দুটো বুজে এল। কেমন অসাড় আর নিস্পন্দ হয়ে এল তার দেহ। হঠাৎ তাকে ছেড়ে দিল সেলিম।

তার নিস্তেজ নিস্পন্দ দেহ আর নিমীলিত চোখদুটোর ভেতরে ক্লান্তির ছায়া দেখতে পেল।

কি ব্যাপার আনারকলি, তুমি এরকম করছ কেন ?

আনারকলি কোন কথা বলল না। ঘোরলাগা চোখদুটো মেলে ধরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

. তোমার কি তবিয়ৎ খারাপ ? যুবরাজের দ্রুতকণ্ঠে তীব্র উৎকণ্ঠা ফুটে

ওঠে, তুমি কেমন অসাড় হয়ে যাচ্ছো। তোমার চোখদুটোর দৃষ্টি—

প্রিয় রাজকুমার, জেনানাদের সঙ্গে এত মেলামেশা করেছো, সুখ-স্বপ্নের আবেশে মগ্ন হয়ে যেন বহু—বহুদূর থেকে বলল, তুমি গভীর মহব্বতের রীতি জানো না, বলতে বলতে কেন যেন হঠাৎ থেমে গেল আনারকলি। আবার মৃদুকণ্ঠে বলল, মেয়েদের জীবনে মহব্বতের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। আন্তরিক ভালোবাসা তাদের স্বর্গসুখের আস্বাদ দেয় রাজকুমার—তীব্র আবেগে সেলিমের বুকে মাথা ঘষতে ঘষতে বলল, তাই তুমি যখন আমাকে 'পেয়ার' করছিলে—তখন আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন বেহেশ্‌তে চলে গিয়েছি—

সেলিমের রক্তের ভেতরে গুরু গুরু ঝড় ভেঙ্গে পড়ল। তীব্র মাদকতাময় একটা উত্তেজনা তরঙ্গায়িত হয়ে গেল তার সারা দেহে। পাগলের মতবিড় বিড় করে বলতে লাগল, আমার ঘরে চল—ঘরে চলো আনারকলি—

ঘর? হঠাৎ যেন চমকে উঠল আনারকলি। বলল, যুবরাজ ঘরে যাব সেইদিন যেদিন তুমি আমাকে সম্মান দিয়ে মর্যাদা দিয়ে ঘরে নিয়ে যাবে—

গম্ভীর হযে গেল সেলিম।

সারা হিন্দুস্তানের সম্রাট মহামতি আকবরের বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানা মনে পড়ে গেল। সে যুবরাজ—আর যাকে সে ভালোবাসে—সে একজন নর্তকী—এটা তার পিতৃদেবের আভিজাত্যে ভীষণ আঘাত করবে। আকবর কখনো কোন অবস্থাতেই—

রাগ করলে? কি ভাবছ বলেই যুবরাজের গালে একটা চুমু এঁকে দিয়ে খুশী করার চেষ্টা করে—লাস্যজীবি বুদ্ধিমতী আনারকলি বলল এখানেই তো ভালো, কেমন চাঁদের আলো, রাশি রাশি ফুলের মেলা, বকুলের গন্ধ,এই সুন্দর পরিবেশে তুমি আর আমি—

সেলিম আর দেরী করল না।

ক্ষুধার্ত অবুঝ শিশু যেমন মায়ের স্তনভাণ্ডদুটো বের করার জন্য বস্ত্রাঞ্চল টানাটানি করে, খামচায়, অস্থির হয়ে ওঠে, তেমনি অস্থির দ্রুত হাতে তাকে অবারিত আর নিরাভরণ করতে লাগল যুবরাজ। ঠিক এমন সময—

খস্—দূরে কেয়া ঝোপের আড়ালে সন্দেহজনক শব্দ হলো।

কে—কে—ওখানে? ক্ষিপ্ত কুকুরের মত চিৎকার করে উঠল সেলিম।

কোথাও কাউকে দেখা গেল না। শুধু সাঁ সাঁ করা বাতাস সেই বিস্তীর্ণ উদ্যানে অব্যক্ত যন্ত্রণার কাতরানির মত গোঙাতে লাগল।

কিন্তু এই সন্দেহজনক শব্দ সেই ছন্দোসুরভিত উন্মাদনাময় পরিবেশটাকে যেন তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করল।

কেউ নিশ্চয়ই দেখেছে—আমার ভয় করছে—বলেই দ্রুত পায়ে বধ্যতাড়িত ভীতা হরিণীর মত চলে গেল আনারকলি।

আমি দেখেছি সম্রাট—আমি নিজের চোখে দেখেছি, বীরবল বাদশাহের কানের কাছে ফিস ফিস করে বললেন।

আষাঢ়ের মেঘ নামলো আকবরের মুখে।

একটি কথাও বললেন না। সেলিমের মুখখানা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আর তার বুকের ভেতরটা যেন পুড়ে যেতে লাগল। মনের সেই যন্ত্রণাতেই জ্বলে পুড়ে অস্থির হয়ে বললেন, না—না—তা কিছুতেই হতে পারে না—

আচ্ছা সম্রাট, বলেই আকবরের কানে কানে মন্ত্রণা দিলেন ইতিহাস বিখ্যাত সেই মন্ত্রী। বিচিত্র ও ভয়ঙ্কর সেই মন্ত্রণা।

বীরবল চলে গেল।

আকবরের মনের ভেতরে অজস্র চিন্তা পাক খেয়ে যেতে লাগল। সে উদার। জাতি বর্ণ ইত্যাদি সম্বন্ধে তার উদারতার খ্যাতি কাশ্মীর থেকে কুমারিকা পর্যন্ত প্রসারিত। সে নিজে মুসলমান হয়ে রাজপুত কন্যার পানি-গ্রহণ করেছেন। সারা ভারতে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তার। কিন্তু প্রস্তরব্যবসায়ী গিয়াসুদ্দিনের রক্ষিতা—কোথা থেকে বানের জলে ভেসে আসা একটা অজ্ঞাতকুলশীল মেয়ে হবে সেলিমের—

না কিছুতেই না—চিন্তায় জ্বলে পুড়ে যেতে যেতে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন। আচ্ছা—সন্ধ্যা হোক, দেখা যাবে বীরবলের কথা কতটুকু সত্যি—

রাজপ্রাসাদের চারিদিকে সন্ধ্যা নামল। বাদশাহের হুকুমে রক্তবর্ণ পাথরের রঙীন দরবারকক্ষের হর্ম্যতলে সুগন্ধী গোলাপ জল ছিটিয়ে দিল বান্দারা। দেওয়ালের গায়ে গায়ে বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত প্রদীপ আর ঝাড়বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। শত শত সুগন্ধী প্রদীপের আলোয় ঝলমল করে উঠল সুদৃশ্য মন্ত্রণাগৃহ।

সেই কক্ষের শেষ প্রান্তে সুদৃশ্য গালিচায় মোড়া রত্নসিংহাসনে এসে বসলেন সম্রাট আকবর। মুখে চিন্তার ছায়া। তার কয়েক ধাপ নীচে দুইদিকে সারি

দিয়ে বসেছেন বীরবল, আবুলফজল, টোডরমল ইত্যাদি ধুরন্ধর সভাসদরা। আর বাদশার পাশে বসল স্বয়ং রাজকুমার সেলিম।

কিন্তু সে সাধারণত পিতার এই দরবারে আসে না। বাদশাহের হুকুমে তাকে আসতে হয়েছে। তাই সে বিরক্ত ও বিস্মিত।

সভাসদরা অবাক করে আকবর হুকুম দিলেন—আনারকলিকে হাজির করো।

আনারকলি !

যেন একটা বাজ পড়ল সভায়। এই জরুরী দরবার নর্তকীর নাচ দেখার জন্য। সেলিমের বুকের ভেতরটা দুলে উঠল। সেই রাত্রে তার উদ্যানে কেয়াকুঞ্জের ভেতরে রহস্যময় সেই শব্দটা আবার তার কানে বেজে উঠল।

আনারকলি এল !

অপরূপ সাজে সেজেছে সে ! নৃত্যপটিয়সী রাজনর্তকী নৃত্যের জন্য তৈরী হয়েই এসেছে। সেই অত্যুজ্জ্বল সোনার মত দেহটাকে পেঁচিয়ে পরেছে রূপালি চুমকী বসানো নয়নসুখ নীলাম্বরী। ভৈরবীদের মত সমস্ত চুল টেনে মাথার মাঝখান থেকে উঁচু করে বাঁধা গম্বুজের মত খোপায় পরেছে নীল অপরাজিতার মালা। দুই হাতের মনিবন্ধে, বাহুতে পরেছে শ্বেত-মল্লিকার বলয়।

তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সেই সুগন্ধী ধূপে আর উজ্জ্বল আলোয় ঝলমকে মন্ত্রণাগৃহও যেন ম্লান হয়ে গেল। আকবরের চোখের দৃষ্টিতে নেমে এল মু তন্ময়তা। তার মনে হল—মনে হল যেন বহু—বহু শতাব্দীর ওপার থেকে বেদনার উত্তাল স্রোত অতিক্রম করে এসেছে বিষাদের এই প্রতিমা—এ নীলপরী। নীল তো বেদনারই রঙ !

বীরবল কিন্তু বাঁকা চোখে তাকালো সেলিমের মুখের দিকে। সে মুখ পাথরের মত নির্বিকার। চোখের দৃষ্টি ভাবলেশহীন। তাহলে কি সে আর কাউকে দেখেছিল যুবরাজের প্রাসাদের উদ্যানে।

জাঁহাপনা ফরমায়েজ করুন, কী নাচ দেখাবো ? হাত জোড় করে বলল আনারকলি।

দেবদাসী নৃত্য—

সম্রাটের হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গে নাচের বোল ফুটল। শুরু হলো সানাইয়ের করুণ সুরের মূর্ছনা।

আরম্ভ হলো নাচ।

ঘুঙুরের শব্দ, পাখোয়াজ, তবলা, সানাইয়ের বিচিত্র সেই ঐকতানে জমে

উঠল আসর। দর্শকরা সবিস্ময়ে দেখছে আনারকলির দেহবল্লরী উত্তাল নদীর মত তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে। তার নৃত্যের প্রতিটি মুদ্রায় দেবতার কাছে আত্মনিবেদনের করুণ আকৃতির সেই অপূর্ব ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে! কিন্তু—

দেবতা পাষান। দেবতা নির্বিকার! তাই দেবদাসী অস্থির আর আকুল হয়ে উঠেছে। তখন সে ঘুরে ঘুরে চোখে তীব্র যন্ত্রণা ফুটিয়ে উদ্দামহয়ে সাপিনীর মত এঁকে বেঁকে নাচছে। সেই উদ্দাম নাচের ভেতরেই কাণ্ডটা ঘটে গেল।

আনারকলি যখন তার দেহটাকে মুচড়ে দুমড়ে তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে দেবতাকে মিনতির মুদ্রা ফুটিয়ে তুলছিল তখন হঠাৎ নজর পড়ল সেলিমের দিকে।

মুহূর্তের জন্য থেমে গেল নাচ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার সামলে নিয়ে নাচতে যেতেই তাল কেটে গেল। পাখোয়াজ আর সানাইবাদকের চোখে ভ্রূকুটি ফুটল।

বন্ধ করো নাচ—গর্জন করে উঠলেন সম্রাট। সব স্তব্ধ হয়ে গেল।

শ্মশানের শান্তি নেমে এল নূপুরনিক্কনে মুখরিত সেই প্রমোদকক্ষে। দ্রুত ও অস্থির পদক্ষেপে বাদশা স্বয়ং সিংহাসন থেকে নেমে এগিয়ে এলেন। বাঘের মত প্রকাণ্ড মুখখানা হিংস্রতায় কুটিল হয়ে উঠল।

গ্রহ বাদশা নিজে নেমে এসেছেন। উপস্থিত প্রত্যেকের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে!

আকবর সোজা সেই নর্তকীর সামনে দাঁড়ালেন। যেন হিংস্র আর ক্ষিপ্ত সিংহের সামনে ভীরু শান্ত এক মেষশাবক।

কেন তোমার তাল কাটল?

কোন কথা নেই আনারকলির মুখে। তার দেহের সমস্ত রক্ত কে যেন শুষে নিয়েছে। পাংশু, বিবর্ণ মুখ।

জাঁহাপনা, আপনি বসুন—আমরা দেখছি—ছুটে এল প্রধান কোতোয়াল। ছুটে এল রাজসভার নাজীর লিয়াকত!

ঠিক এই সময়ে সেই প্রমোদকক্ষের অন্য দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল একজন।

তারপরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত।

সভাসদ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা বাদশাকে বহু কষ্টে বুঝিয়ে নিরস্ত

করল। তারপর চলল কিছুক্ষণ মন্ত্রণা। আর একটু পরেই সম্রাট রায় দিলেন। ভয়ঙ্কর সেই রায়—

সভাকক্ষে নৃত্যরত অবস্থায় কোন নর্তকী যদি বেতমিজ ব্যবহার করে তাহলে রাজসভার আভিজাত্য ক্ষুন্ন হয়। তার শাস্তি—জীবন্ত সমাধি।

চমকে উঠল সকলে। শুধু একটু তাল কেটে দেবার জন্যে এতবড় শাস্তি। প্রত্যেকে একটু বিস্মিত হলো। শুধু একজন বাদে।

তিনি বীরবল।

তিনি জানেন, লঘু পাপে গুরু শাস্তি দিয়েছেন কেন? সেলিমকে যে ভাবী-কালে এই বিশাল দেশের দণ্ডমুণ্ডের মালিক হতে হবে—যে এত বড় দায়িত্ব নেবে—সে কি একটা নর্তকীকে শাদী করতে পারে। লোকে যে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। কখনও হিন্দুস্থানের মর্যাদা দেবে না—

সেলিমের বুকের ভেতরটা জ্বলে যেতে লাগল। কিন্তু একটা কথাও বলতে সাহস করল না।

রাত্রি নামল গভীর হয়ে।

পরদিন পূবের আকাশে ভোরের রেখা ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আনার-কলিকে নিয়ে কয়েকজন রাজকর্মচারী লাহোরে রওনা হবে।

সেখানে গিয়াসুদ্দিনের সাথে দেখা করিয়ে তারপর তাকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হবে!

নির্জন ঘরে পায়চারী করে সেলিম। আর যুবরাজ হয়ে জন্মানোর জন্যে মনে মনে সহস্রবার ধিক্কার দেয়! ইচ্ছা করে এখুনি—এখুনি এই রাজবেশ খুলে ফেলে আনারকলির হাত ধরে পথের ধুলোয় নেমে আসে, ইচ্ছে করে সম্রাটের পাদুটো জড়িয়ে ধরে বলে, অপরাধ যদি কিছু হয়ে থাকে—সে ওর নয়—অপরাধ তার।

কিন্তু কিছুই করল না, কিছুই করার উপায় নেই। তার প্রেম, তার ভালবাসায় কোন স্বাধীন ইচ্ছা থাকতে পারেনা—রাষ্ট্রের রাজনীতির কুটিল পথ ধরে নিয়ন্ত্রিত হবে তার প্রেম প্রীতিএই নিয়ম। সম্রাটের এই আইন। তবুও সে—

এল। এল নিঃশব্দ পায়ে মাটির নীচের সেই কারাগারের সামনে। কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করে ভেতরে গেল।

কে?

না। ঘুম নয়। স্বপ্ন—সুখস্বপ্নের ভেতর থেকেই যেন জেগে উঠল আনারকলি! অস্ফুটস্বরে বলল, আমি যে তোমার কথাই ভাবছিলাম? প্রিয়তম—

আনারকলি চল, আমরা পালিয়ে যাই সম্রাটের রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে দূরের কোন দেশে!

আনারকলি কোন কথা বলল না।

গভীর প্রশান্তিতে তার মুখখানা উজ্জল হয়ে উঠল। সেলিমের ঘন চুলে ভরা মাথায় পরম আদরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, পাগলামি করো না—তোমাকে সারা হিন্দুস্থানের ভার নিতে হবে—একটু থামল। নিভু নিভু গলায় দূর থেকে বলল, তুমি আমাকে ভালবেসেছো—এখন মরতে আমার এতটুকু কষ্ট নেই, বলতে বলতে চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। কিন্তু মুখে স্মিত হাসির ঝরণা!

খট—খট—খট ছুটে এল কারারক্ষী। খুব ভয় পেয়ে আর ব্যস্ত হয়ে বলল, যুবরাজ, বান্দার গোস্তাকী মাফ করবেন—সম্রাটের নৈশ পরিক্রমার সময় হয়ে এসেছে—

যাও—যাও—তুমি যাও—সেলিমকে জোর করে ঠেলে পাঠিয়ে দিল আনারকলি!

লাহোর শহরের প্রান্তে কবর খোড়া হয়েছিল। মৌলভী কোরানের বয়াৎ আউড়ে ছিল। কোন ত্রুটি ছিল না।

আনারকলি কিন্তু কিছুই শুনল না। তার দৃষ্টি ছিল বিপুলব্যপ্ত আকাশের দিকে। সে দৃষ্টিতে এতটুকু বিষাদের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। ছিল নিবিড় একটা প্রশান্তি—যেন নিশ্চিত নিরুদ্বেগ মন নিয়ে কোন অবারিত সুখ আর শান্তির রাজ্যে যাত্রা করছে—

সত্যিই সে সেলিমকে ভালবেসেছিল—সেই প্রেম তাকে এতটুকু ক্লিষ্ট আর বিষাদাচ্ছন্ন হতে দেয়নি। গভীর প্রেম যে মৃত্যুকেও অতিক্রম করতে পারে আনারকলির জীবনের অন্তিম মুহূর্তগুলোর অভিব্যক্তিই তার প্রমাণ!

আজও লাহোরের একপ্রান্তে স্বাস্থ্যঘন সবুজ ঘাসে আবৃত আনারকলির সমাধি শত শত শতাব্দীর ওপার থেকে স্মরণ করিয়ে দেয়, উদারনীতিতে বিশ্ববিশ্রুত সম্রাটের আভিজাত্য ও দম্ভের জন্য এক নগরশোভনার নিঃশব্দ আত্মবলিদানের বেদনাভিষিক্ত কাহিনী।

অষ্টম স্তবক

নগরসুন্দরীর ক্লেদ-পঙ্কিল জীবনের অন্ধকারেও বিদ্যুতের উগ্র আলোর প্রতিভাস দেখা যায়। তাই অতি নগণ্য এক জনপদবধূ হয়েও সে বলেছিল দেশের মাটি আমার কাছে স্বর্গের চেয়েও বড়—

সব কাজ শেষ হয়েছে।

সফল হয়েছে জীবনের সমস্ত বাসনা। কোথায়—কতদূরে পারস্যের পাহাড়ঘেরা খোরাসানের এক দরিদ্র মেষপালকের ঘরে জন্ম নিয়ে, কত অসংখ্য যুদ্ধ, রক্তপাত আরও কত ঝড় দুর্যোগ আর বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে নাদিরকুলী খাঁ থেকে সে হয়েছে আজ সম্রাট নাদিরশাহ! সারা মধ্যএশিয়ায় তার তলোয়ারের দীপ্তি ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। তার পায়ের নীচে চূর্ণ হয়ে গেছে কান্দাহার, জ্বলছে কাবুল, রক্তের স্রোত বয়ে গিয়েছে লাহোরের পথে পথে। টুকরো টুকরো হয়ে বিলীন হয়ে গেছে হিন্দুস্থানের তখ্‌ত্‌-ই-তাউসের গর্ব! তার লুব্ধ বাহু কেড়ে নিয়েছে কোহিনূর। কোহিনূর হারিয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছে বাদশাহী উষ্ণীষ। তার অস্ত্রাঘাতে শোনিতাক্ত হয়েছে দিল্লীর রাজপথ। লুণ্ঠনলিপ্সু নিষ্ঠুর পারসিকবাহিনী খুন জখম, নির্বিচারে হত্যার ভয়ঙ্কর বিভীষিকা জাগিয়ে একেবারে স্তব্ধ করে দিয়েছে ধনে জনে সমৃদ্ধ জনপদের জীবন। দেওয়ান-ই-খাসের সুরম্য প্রাসাদের শীর্ষে উড়ছে তার বিজয়কেতন। দুর্বল মোগলশক্তির অক্ষম প্রতিভূ বাদশাহ মহম্মদশাহ প্রভুভক্ত ভৃত্যের মত তারই পদলেহন করছে।

না। বাকী নেই কিছুই। রাজকোষ থেকে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে নিয়েছে। দখল করেছে সেই ভুবনবিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন। লুটে নিয়েছে রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা, রূপোর বাসন, মণি-মুক্তা।

শুধু ধন দৌলত নয়। শকুনীর মত ছোঁ মেরে নিয়ে নিয়েছে এদেশের মাটির যা কিছু ভাল। হাতীশালে একটি সুপুষ্ট তেজীয়ান হাতী নেই; অশ্বশালায় নেই একটা হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়া! দেশজুড়ে কোথাও মাথা খুঁড়লেও পাওয়া যাবে না একটা কারু শিল্পী! লুণ্ঠিত সেই বিপুল ঐশ্বর্য আর শিল্পী কারিগর সব—সব তার পারসিকবাহিনীর সতর্ক প্রহরায় নজরবন্দী।

ওরা যাবে তার দেশে পারস্যে! ভারতের কারুকার তাদের নিপুণ হাতের ছন্দে যতিতে গড়ে তুলবে তার বড় সাধের খোরাসান—তার সুদূর বাল্যকালের

স্মৃতিবিজড়িত জন্মভূমি! যতগুলো রঙীন আশা তার মনে রামধনুর মত ঝিকমিক করছিল সব—সব যেন সার্থকতার মশাল হয়ে দাউ দাউ করে জলছে! তবুও—

তবুও তার মন ভার। বিষণ্ণতায় ছেয়ে আছে তার সমস্ত চেতনা। তীক্ষ্ণ ও তীব্র অস্বস্তিতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় তার বুকের ভেতরটা। তার মনে হয়—মনে হয় সে ব্যর্থ—সে অক্ষম—

আগর ফিরদৌস বর রুয়ে জমীন অস্ত্।
হমীন অস্ত্ ও হমীন অস্ত্— হমীন অস্ত্।

সেই মধুর করুণ সুরের গান। সেই মূর্চ্ছনা!— সেই মন উদাস করা বিচিত্র বিভ্রমের কণ্ঠস্বর যেন যমুনার ওপার থেকে বাতাসের সওয়ার হয়ে ভেসে এল—ভেসে এল রাজধানীর উপকণ্ঠে এই জীর্ণ দরগায়। তীরের মত উঠে দাঁড়ালো দিগ্বিজয়ী বীর নাদিরশাহ। কোথায়—কোথায় সে কতদূরে! ওই ঘন সবুজের ছবির মত দেওদার বীথির আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে না কি!

অস্থির পায়ে বাইরে এল। ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। যতদূর চোখ যায়—যেন কেমন একটা ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতা! জনহীন নির্জন রাজপথে ধুলোর ঘূর্ণি উড়ছে; দূর আকাশে চক্রাকারে ঘুরছে শকুনের পাল। তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তারই রক্তপিপাসু অনুচরদের হাতে নিহত কোন বেওয়ারিশ মৃতদেহের দিকে! সাঁ সাঁ বাতাস যেন করুণ হাহাকারের মত তার কানের কাছে বেজে চলেছে। আর বহু বহুদূর থেকে অব্যক্ত যন্ত্রণার গোঙানির মত বুকফাটা কান্নার ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে। সন্তানহারা কোন মা কি স্বামীহারা কোন সদ্যবিধবা নারীর কান্না!

ভরদুপুরে সেই নির্জন মসজিদের চত্বরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তার নিজেকে মনে হল হিংস্র জল্লাদ! মনে হল কালান্তক যমদূত! না—তার কাছে আসবে কেন —কেন আসবে সেই নৃত্যগীতনিপুণা রূপরম্যা নারী! অজস্র অগণন মানুষের তাজা রক্তে তার এই হাত দুটো যে রঞ্জিত।

তার মনের ভেতরে ভেসে উঠল কয়েকদিন আগে দেওয়ান-ই-খাসের মনোরম সন্ধ্যার একটি দৃশ্য! মহম্মদশাহ তাকে খুশী করার জন্যেই বলেছিল একটু নাচনাগানা শুনবেন শাহজী।

নাচ! গান! চমকে উঠেছিল তার রক্তাভ চোখদুটোর দৃষ্টি। অস্ত্রের ঝনঝনানি, যুদ্ধরত সৈনিকদের হুঙ্কার আর আহত ও মুমূর্ষ মানুষের তীব্র করুণ

আর্তনাদের শব্দ ছাড়া অনেক—অনেকদিন সে আর কিছুই শোনেনি। সেরাজীর নেশায় ঢুলু ঢুলু চোখদুটো বুজেই সে আস্তে আস্তে বলল, বেশ একটু নাচ গান হোক—

সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ান-ই-খাসের নৃত্যস্থলীতে জ্বলে উঠল ঝাড়বাতির আলো! স্বর্ণনির্মিত ধূপাধার থেকে সুগন্ধী ধূপের ধোঁয়ায় চারিদিক আমোদিত হয়ে উঠল। বেজে উঠল ত্রিতন্ত্রী বীণা, কিন্নর, আর অমৃতী! যখন মধুর সুরের ঐকতানের গভীর মূর্চ্ছনায় চারিদিক কেমন আচ্ছন্ন ও বিবশ হয়ে গেল তখুনি নূপুরনিক্কনের তীব্র ধ্বনি তুলে এল এক নারী! পান্না-হাজরা জামদানী শাড়িতে জড়ানো তার বল্লরীর মত দীর্ঘ তনুদেহ! নাচের তালে তালে ডাইনে বাঁয়ে দুলছে তার বেণীতে জড়ানো বফতহানা মসলিন। তার মনে হয়েছিল যেন বেহেস্ত থেকে নেমে এসেছে কোন সুযৌবনা অপ্সরী! লীলা-পূর্ণ বাহুবিক্ষেপে, ছন্দায়িত অঙ্গহারে আর মদির কটাক্ষে বিচিত্র মুদ্রা রচনা করে নৃত্য করতে থাকে সে। স্বরযন্ত্রের মধুর ঐকতানে আর পদমঞ্জীরের ঝঙ্কারে আলোকমালায় উজ্জ্বল নৃত্যস্থলী যেন বিপুল উল্লাসে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে লাগল—

তোফা—তোফা। তার মুখ থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরিয়ে এসেছিল। কি নাম?

নূরবাঈ। মুলতানী নর্তকী, থেমে থেমে বলেছিল মহম্মদ শাহ, রাগদর্পনের লেখক ফকীরউল্লাহের কি রকম দূরসম্পর্কের নাতনী। শুধু নাচ নয়—ও খুব ভাল গাইতেও পারে—

সেই শুরু। দিল্লীতে অভিযান করতে এসে তার প্রবাসের দিনগুলো ছন্দোসুরভিত আর মধুর করে তুলেছিল নৃত্যগীতপটিয়সী রূপধন্যা সেই নারীর সান্নিধ্য।

সে তার কাছে এসেছে ভোরের আবছায়ায়, এসেছে দুপুরের নির্জনতায়, এসেছে গভীর রাত্রে—কত সুরে কত গান যে শুনিয়েছে। খুব ভোরে ভৈরবী, কখনো গভীর রাত্রে মালকোশ—আরও কত রাগ-রাগিনা সেসব কি ছাই সে জানে। কিন্তু সে বুঝতে পারে, নূরবাঈ সাধারণ রাজনর্তকী নয়। নৃত্যগীতে অসাধারণ তার পাণ্ডিত্য।

সারাজীবন শুধু যুদ্ধ আর মানুষ খুন করে গেলেন শাহজী, ডালিমের দানার মত ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে সে বলেছিল, আপনি গানের মর্ম কি বুঝবেন?

অবাক হয়ে ে তার সেই শিশিরে ভেজা স্থলপদ্মের মত মুখখানার দিকে তাকিয়েছিল। কা কি বলছে। লোকে তাকে বলে 'তহমস্পকুলি' (বীর যোদ্ধা)। সে ক হাতে দুর্দ্ধর্ষ রক্তলোলুপ তাতারদের দমন করেছে আর এক হাতে ঠেকিয়েছে আবাদালীদের বিদ্রোহ। তার নামে সারা মধ্য-এশিয়ায় একটা নিদারুণ আতঙ্কের শিহরণ বয়ে যায়। তার চেতনার ভেতরের হিংস্র জন্তুটা ফুঁসে উঠেছিল। কিন্তু তার সুর্মাটানা ডাগর দুটো চোখের সরল আর নিষ্পাপ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সে ভেতরে ভেতরে শান্ত হয়ে গিয়েছিল।

কিছু মনে করলেন শাহজী। জানেন, আমাদের হিন্দুস্থানে মানুষের সবরকম অনুভূতির গান যেমন আছে তেমনি প্রত্যেকটি ঋতুরও গান আছে—

কি রকম?

গ্রীষ্মঋতুতে রাগদীপক, বর্ষায় মেঘমল্লার, শরতে শ্রীরাগ, হেমন্তে রাগ মালকোশ আর শীতে ভৈরোঁ রাগ—

আরও কত কথা বলতো। কখনো গান কখনো নাচ নিয়ে নানা আলোচনা করতে করতে সে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতো। কখনো পুষ্পলতিকার সেই বরতনু আবেশে হেলিয়ে দুলিয়ে নৃত্যের মুদ্রা ফুটিয়ে তুলতো, কখনো রাগ-রাগিনীর কথা বলতে বলতে সুরেলা গলায় এক কলি গান গেয়েই বলতো—এটা হলো মূলতানী-ধানেশ্রী—

আরও কত অসংখ্য রাগ-রাগিণীর নাম যে বলতো। কথায় কথায় রাত বাড়তো। আর সে কেমন অস্থির হয়ে উঠতো। বলতো, আমি এখন যাই শাহজী—

যাচ্ছো কোথায়, আমার মনোরঞ্জনের জন্যেই মহম্মদশাহ তোমাকে পাঠিয়েছে—

—গান নাচ তো শোনাচ্ছি শাহজী, বড় বড় দুটো চোখে ভয়ের ছায়া থর থর করে।

আর তোমার কিছু নেই নূরবাঈ! বলেই তাকে তার বলিষ্ঠ দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল নাদিরশাহ। সঙ্গে সঙ্গে তার চওড়া বুকে সুগন্ধী আর নরম চুলে ভরা মাথাটা ঘসতে ঘসতে নূরবাঈ আস্তে আস্তে যেন অনেক—অনেকদূর থেকে বলেছিল, আমার যা আছে সব—সব আপনাকে দেব শাহজী—যদি আমাকে একটা প্রতিশ্রুতি—

—কি সর্ত ?

বন্ধ করতে হবে যুদ্ধ। আপনার অনুচরেরা আর একটি মানুষও খুন করবে না—

—তাই হবে। তোমার জন্য আমি সব—

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই উন্মত্ত একটা ন্যার ঢেউয়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার বুকে। আর বাইরে স্তব্ধ গভীর রাত্রি মধুর এক সুখের অনুভবে আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

দিন কাটে। মাস যায়। রাজধানীর মানুষ আবার নিভয়ে পথে বেরিয়ে আসে। হত্যার বিভীষিকা নেই, নেই অস্ত্রের ঝনঝনানি, নেই রক্তলিপ্সু পারসিকদের নিষ্ঠুর পদশব্দ। ধনেজনে সমৃদ্ধ দিল্লীর চলমান জীবনের স্রোত উদ্দাম বেগে বয়ে যেতে লাগল।

ওদিকে রাজপ্রাসাদ থেকে অনেকদূরে এক সুরম্য অট্টালিকায় নূরবাঈকে নিয়ে তার প্রমত্ত নিশিযাপনের উচ্ছৃঙ্খল আনন্দও চলতে লাগল উদ্দামবেগে ইতিমধ্যে ঘটে গেল এক কাণ্ড।

লোকচক্ষুর অন্তরালে সে সুন্দরীশ্রেষ্ঠ নর্তকীকে নিয়ে বড় সুখের জীবনযাপন করছিল বলে বাদশা মহম্মদশাহের প্রধান আমীর খান-ই-দেওয়ান ঘোষণা করল—সে নিহত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিহিংসার আগুনে জলে পুড়ে মোগলসেনারা বাজের মত অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল শান্ত নিরুদ্বিগ্ন পারসিক সৈন্যশিবিরে। নির্বিচারে সাতশত শত্রুসেনা হত্যা করে তারা প্রতিশোধ নিল। এই নিদারুণ সংবাদ যেই তার প্রমোদভবনে পৌঁছলো অমনি তার ভেতরের ঘুমন্ত হিংস্র জল্লাদটা নিরুদ্ধ আক্রোশে জেগে উঠল। র সর্বক্ষণের সঙ্গী বন্দুকটা হাতে নিয়ে উন্মত্ত একটা ঝড়ের বেগে বেরোতে যাবে এমন সময়—

জাঁহাপনা, ভুলে যাচ্ছেন আপনার প্রতিশ্রুতি—পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল সেই খরযৌবনবতী নর্তকী। সে কিন্তু একটা বাঘের মত গর্জন করে বলেছিল, পথ ছাড়ো, তোমার দেশের লোক বেইমানী করেছে—

দুম্—দুম্—দুম্—উপর্যোপরি তিনটি গুলী ছুঁড়ে চারিদিকে সচকিত করে সে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিল—দিল্লীর আবালবৃদ্ধ-বণিতা- প্রত্যেকটি প্রাণীকে হত্যা করো—যতক্ষণ একজনও বেঁচে থাকবে ততক্ষণ থামবে না—

শুরু হলো নির্বিচারে গণহত্যা। শোনিতপ্রিয় তার নিষ্ঠুর সৈন্যরা হত্যার উল্লাসে পৈশাচিক হয়ে উঠল। সন্ধ্যাসমাগমে মহানগরী জনমানবহীন শ্মশানে

পরিণত হতে চলেছে লক্ষ্য করে এবং মহম্মদশাহের ব্যাকুল অনুরোধে তার অনুচরদের নিরস্ত্র হতে বলেছিল। তার নির্দেশে কেউ কেউ বিরত হলো, আবার কিছু লুণ্ঠনলিপ্সু সৈন্য লুঠতরাজ ও বীভৎস হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে দেখে এবং নূরবাঈয়ের মধুরকবোষ্ণ সান্নিধ্য হারানোর দুঃখে ক্ষোভে তার সেই প্রমোদভবন সংলগ্ন জীর্ণ মসজিদে চলে এসেছে। এখানে আর কেন—কি জন্যে আসবে নূরবাঈ? সে তো আর প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি! কিন্তু আবার শোনা গেল সেই সুমধুর কণ্ঠস্বর—অগর ফিরদৌশ বর রুয়ে জমীন অস্ত্‌······

তুমি! উচ্ছ্বসিত আনন্দে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল নাদিরের। আর চোখদুটো বিস্ময়ে থমকে গেল—এ কাকে দেখছে—এ কি সেই পান্না-হাজরা জামদানীতে জড়ানো সেই রূপ ও যৌবনের নারী। তার পরনে আজ শবনম মসলিন। শ্বেতশুভ্র তার রঙ। রাজনর্তকী তার বর্ণাঢ্য পোষাক পরিত্যাগ করে পুণ্যশ্রী তপস্বিনীর মত শুদ্ধ আর পবিত্র মূর্তি নিয়ে তার সামনে এসেছে। তাকে দেখলে কামনা জাগে না শুধু মনে হয়—একটা সুদূর স্বপ্ন। হয়তো এখুনি দুপুরের এই সোনাঝরানো রোদে আকাশের নীলে শিশিরের মত মিলিয়ে যাবে। ধীর পায়ে তার কাছে এল পারসিক বীর! কিন্তু—

থমকে দাঁড়াতে হল। দূরে আতঙ্কিত শহরের নির্জন রাজপথের দিকে কেমন উৎসুক আর স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখদুটো ছড়িয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত বিড় বিড় করে বলছে নূরবাঈ, আগর ফিরদৌশ বর রুয়ে জমীন অস্ত্‌······

কি বলছো নূরবাঈ এর মানে কি?

পরে বলবো একদিন, ব্যথিত দুটো চোখের জলভরা করুণ দৃষ্টি তুলে ধরে প্রায় অস্ফুটস্বরে বলল, তুমি থামবে না শাহজী, দিল্লী যে জনহীন হয়ে গেল—

মাথা নীচু করল নাদিরশাহ। অপরাধীর মত বলল, ওরা বদলা নিচ্ছে নূরবাঈ—তোমার কথায় থেমে গিয়েছিলাম তো অনেক আগে। কিন্তু কেন আমীর খান-ই-দেওয়ান—এই সর্বনাশটা করল?

ওসব কথা থাক শাহজী, নাদিরের বুকের কাছে তার নিঃশ্বাসের সীমানায় ঘন হয়ে দাঁড়ালো নূরবাঈ। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল, কতগুলো কথা—

সত্যি বলছো! নাদিরের চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীতে ঢ্যাঁড়া পড়ল; মহামান্য পারসিক সম্রাট নাদিরশাহের হুকুম—যদি কোন পারসিক সৈন্য কোন বাড়িতে লুঠতরাজ করে কি কাউকে হত্যা

করে তাহলে তার গর্দান যা—বে—এ—

আবার শান্তি নামল রাজধানীতে।

কিসের প্রেরণায়, অস্তমান মোগলশক্তির শেষ প্রতিভূ দুর্বল ও অক্ষম মহম্মদশাহকে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়েছিল সেই লুণ্ঠনলিপ্সু নিষ্ঠুর নাদিরশাহ; নিজের হাতে তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছিল—কেন শুধু সিন্ধুনদের পশ্চিম পার তার অধিকার রেখে পূর্বদিকের সমস্ত ভূভাগ ও রাজধানী দিল্লী পর্যন্ত মোগলবাদশাকে ছেড়ে দিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিল সে কথা ইতিহাসে নেই—নেই ঐতিহাসিক মীরজা মেহদীর লেখা 'নাদিরনামায়'! কেননা লোকচক্ষে হেয় নগণ্য আর অবহেলিত নূরবাঈয়ের মত নগরসুন্দরীরা কখনো ইতিহাসে স্থান পায় না।

ইতিহাসখ্যাত বীর নাদিরশাহ দেশে ফিরে চলেছে।

সারি সারি উটের পিঠে শোভা পাচ্ছে লুণ্ঠিত বিপুল তৈজস সম্ভার। কাফিলা (ক্যারাভান) একেবারে সামনে আছে বিশ্বস্ত ও যুদ্ধনিপুণ পারসিক অনুচররা আর মাঝখানে নিরাপদ স্থানে হৃষ্টপুষ্ট একটা উটের পিঠে সুসজ্জিত হাওয়াদায় চলেছে দিগ্বিজয়ী বীর নাদিরশাহ আর তার ভাবী সম্রাজ্ঞী নূরবাঈ—তার পরণে ঝলমলে সার্টিনের শালোয়ার। মাথায় সোনার চুমকি বসানো ফিকে সবুজ ওড়না। গায়ে রক্তনীলবর্ণের মোগলজ্যাকেট! দীর্ঘ ও পুষ্ট নিবিড় কালো বেণীতে ফিক ফিক করে হাসছে একটি নার্গিসের অস্ফুট কোরক! তার সুর্মাটানা ডাগর চোখে স্বপ্ন নেমেছে, সারা পারস্যের সম্রাজ্ঞী হবে—অনাগত সেই ভবিষ্যতের সুখের চেয়েও তার মন ভরপুর হয়ে আছে আর একটা আত্মপ্রসাদে দুর্দান্ত একটা বিষধর আর হিংস্র সাপকে পোষ মানিয়েছে। ওর বুকের বহু নীচে লুকানো মানবিক নরম নরম অনুভূতিগুলোকে প্রদীপের মত জ্বালিয়ে দিতে পেরেছে—

তারা পার হয়ে গেল লাহোর।

পার হয়ে গেল অমৃতসর—শিয়ালকোট—রাওলপিণ্ডি। ভারতের সীমানা যেখানে শেষ সেইখানে আসতেই নাদির লক্ষ্য করল তীব্র যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠেছে নূরবাঈয়ের প্রতিমার মত সুডৌল মুখে

কি হয়েছে নূরবাঈ?

কিছু বলে না সে। শুধু অস্ফুটস্বরে বিড় বিড় করে বলে, আগর ফির দৌশ বর রুয়ে জমীন অস্ত্‌…।

কি বলছো নূরবাঈ—তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে?

না।

তাহলে কি হয়েছে—ওরকম করছো কেন? ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল নাদির-শাহ। দূরে মধ্য এশিয়ার গহন পার্বত্যলোক আর এদিকে তুষারশুভ্র কারা-কোরোম, দূরে দিগন্তের নীলরেখায় আঁকা হিন্দুকুশের দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল নূরবাঈ, আগর ফির দৌশ বর রুয়ে জমীন অস্ত্‌—এই বয়াৎটার অর্থ জানতে চেয়েছিলেন একদিন—

হ্যাঁ—হ্যাঁ কি? এর সঙ্গে তোমার মন খারাপের কি যোগ—

বয়াৎটার মানে হল, মাটির ওপর যদি কোথাও স্বর্গ থাকে তবে সে এইখানে—সে এইখানে সে আমার স্বদেশ একটু থেমে কান্নায় ভার ভার-গলায় বলল নূরবাঈ, দেশের মাটি ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না জাঁহাপনা—

বলছো কি তুমি! গর্জে উঠল নাদির। টাকাপয়সা, গয়না, পারস্যের সম্রাজ্ঞী হওয়া এসবের চেয়েও—

আমার দেশ—আমার মাতৃভূমি অনেক বড়—বলতে বলতেই অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল নূরবাঈ। কান্নাজড়ানো গলায় বলল, আমার গোস্তাফী মাফ করবেন হুজুর—

তার কান্না থরো-থরো মূর্তির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন শান্ত আর স্নিগ্ধ হয়ে গেল নাদিরের চোখদুটোর কঠোর দৃষ্টি। সস্নেহে তার মাথায় হাত দিয়ে বলল, দেশকে তুমি এত ভালবাসো নূর, নিজের মনেই অস্ফুটস্বরে বলল, আমিও তো স্বদেশে ফিরে চলেছি—

সসম্মানে আর বিপুল স্বর্ণালঙ্কারে নিজের হাতে সাজিয়ে নূরবাঈকে ফিরে যেতে দিয়েছিল নাদিরশাহ—

যুদ্ধের বজ্রনির্ঘোষ, নির্বিচারে বীভৎস গণহত্যা আর লুণ্ঠনের ইতিবৃত্তে ভারাক্রান্ত নাদিরের ইতিহাসে নূরবাঈয়ের কোন স্থান নেই। প্রবল ঝঞ্ঝার মত তার দিগ্বিজয়ের অভিযানে কোথায় কুটোর মত উড়েগেছে সে। কিন্তু আজও আছে—

আছে যমুনার ধারে নূরবাঈয়ের কবর। আজও হয়তো কান পাতলে শোনা যাবে—যমুনার জলের অস্ফুট কলোল্লাসে, হু হু হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে নগণ্য এক নগরসুন্দরীর নিবিড় দেশপ্রেমের অনুরণন।

নবম স্তবক

অতি নগণ্য এক নগরসুন্দরী হয়ে বড় স্বপ্ন দেখেছিল বলেই তাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল—

লালকুণওয়ার।

আজও চিরাগী দিল্লীর আশেপাশের গ্রামের গ্রামবৃদ্ধরা লালকুণওয়ারের কথা বলতে বলতে মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু সেখানকার বহুদর্শী বর্ষিয়সীরা বুক উজাড় করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়েছিল বলেই—তীব্র আবেগে তাদের কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে। আর কিছু বলতে পারে না। বলতে চায় না।

কে এই লালকুণওয়ার—কি এমন অতিরিক্ত আশা করেছিল সে? সেসব বৃত্তান্ত মুসলমান যুগের তথা মধ্যযুগের কোন ইতিহাসে নেই। কোন বাদশাহ তার বিলাস-ব্যভিচারের সহচরীদের আবাসস্থল অর্থাৎ হারেমের জন্য কত টাকা ব্যয় করতেন, কাকে কত বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার দিতেন তার খুঁটিনাটি বিশদ বিবরণ আছে 'আকবরনামায' 'জাহাঙ্গীরনামায়' এবং 'শাহজাননামায়'। কিন্তু এইসব অতিকায গ্রন্থগুলোর কোথাও নেই, আনারকলি কি লালকুণওয়ার-দের কথা; নেই কারা বা কতজন তাদের (বাদশাহদের) উচ্ছৃঙ্খল ও নিষ্ঠুর আচরণের বলি হতো। কোথাও নেই তাদের উৎকট যৌনলালসার খেয়াল চরিতার্থ করতে গিযে কতজন হতভাগিনী প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিযেছিল। নেই, তার কারণ—এগুলো যে প্রায ঈশ্বরের তুল্য সর্বশক্তিমান সম্রাটের লজ্জার কথা—কলঙ্কের কথা।

তাই বাদশাহদের আত্মজীবনীতে কিম্বা তাদেরই অনুগ্রহপুষ্ট ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাসে তাদের জঘন্য ব্যভিচারের কথা এবং হারেমের ফুলের মত সুন্দর আর নিষ্পাপ এক একটি রমণীদের ওপরে তাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের সেই নারকীয ইতিবৃত্ত থাকতে পারে না। কিন্তু—

বুদ্ধজাতকের বারাঙ্গনা সুলসা থেকে শুরু করে আনারকলি, লাল-কুণওয়ার ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবনের করুণ ইতিহাস লেখা আছে 'হিষ্ট্রি অফ প্রষ্টিটিউশনে'র পাতায়।

তখন দিল্লীর বাদশা জাহন্দার শাহ।

অত্যন্ত বিলাসী সম্রাট সে। সারা দিন সে তার হারেমের সুন্দরী নারী পরিবৃত হয়ে ও উৎকৃষ্ট সেরাজীর প্রভাবে নেশাচ্ছন্ন হয়ে থাকত। শত শত

রূপসীর কবোষ্ণ সান্নিধ্যেও তৃপ্ত না হয়ে তার দুই চোখ শুধু অন্বেষণ করে বেড়াতো অপরূপ লাবণ্যময়ী নারীর বরতনু। তার অনুচরেরা হন্যে হয়ে দেশে দেশে খুঁজে বেড়াতো শুধু অনাঘ্রাত পুষ্পের মত কুমারী রূপসী মেয়ে। এখানে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

জাহন্দার শাহের হারেমের জন্য বার্ষিক খরচ ছিল দুই কোটি টাকা। শোনা যায়, সেখানে ছিল সাড়ে সাতশো রমণী। তার ভেতরে নাকি শ'দুয়েক স্ত্রীলোক তার উপপত্নী। বলাবাহুল্য এরা সবাই সেরা সুন্দরী।

কিন্তু সুখাদ্যও অত্যন্ত বেশী খেলে অরুচি হয়। বিস্বাদ লাগে অতি মহার্ঘ সেই আহার্য। তাই—

একদিন জাহন্দার শাহ তার প্রধান উজীরকে বলল, দেখুন তো সারাদেশ খুঁজে—সত্যিকারের সুন্দরী কোন মেয়ে পান কিনা?

সত্যিকারের সুন্দরী! উজীর মাথা চুলকায়। বাদশার নেশামত্ত রক্তাভ চোখদুটোর দিকে তাকাতে ভয় পায়।

কি রকম সুন্দরী বুঝতে পারছেন না, একটু থেমে সেই নারীরূপপিপাসু সম্রাট চোখ বুজে বলল, শুনুন তার গায়ের রঙ হবে ভোরের আকাশের মত— আবছায়া নীলিমার আভাসে তাকে মনে হবে একটা সুদূর স্বপ্নের রেখা। আর সে মেয়ে যখন কথা বলবে তখন মনে হবে যেন মধুর সুরে গান করছে। হাসলে মনে হবে—

বুঝতে পেরেছি জাঁহাপনা—ঠিক ধরতে পেরেছি। হঠাৎ মন্ত্রীর চোখ-দুটো যেন ঠিক নির্দিষ্ট বস্তুটি পাওয়ার উল্লাসে ঝকমক করে উঠল। বলল, চিরাগী দিল্লীতে যে বিশাল তালাব আছে তার কাছে থাকে এই রকম সুন্দরী মেয়ে—

কার কাছে থাকে?

আজ্ঞে একা, একটু গলা নামিয়ে বলল, পতিতা—প্রতিরাত্রির জন্য দুই হাজার টাকা তার—

ঠিক আছে—তাকে তলব দাও—

এল লালকুণওয়ার।

তার দিকে তাকিয়েই জাহন্দারের চোখ দুটো মুগ্ধ হয়ে গেল। এত রূপ কি কোন মানুষের হয়? সারা মুখে মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার মত কমনীয়তা।

জাহন্দারের মনে হল, সত্যিই সুদূর একটা স্বপ্নের নীলিম আভাসের মত। ক্ষীনতনুদেহ পেঁচিয়ে পরেছে মেঘডম্বুর নীলাম্বরী। নীলাভ রেখার মাঝখানে তার শ্বেতশুভ্র মুখাবয়ব দ্বাদশীর ক্ষীণ চাঁদের মত শোভা পাচ্ছে।

সেই দিন থেকে জাহন্দার শাহর কাছে যেন লুপ্ত হয়ে গেল পৃথিবী। অহর্নিশি লালকুণওয়ারকে নিয়ে মত্ত হয়ে থাকে। হারেমের অন্য কারো দিকে ঘুরেও তাকায় না।

দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েকটা মাস। একদিন হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

সেদিন প্রমত্ত নিশিযাপনের পর গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গিয়েছিল জাহন্দার। কিন্তু—

চিরাগী দিল্লীর রূপসী বারবণিতা বসল রাজসিংহাসনে। মাথায় সোনার মুকুটে ঝাড়বাতির আলো ঠিকরে পড়ছে। পাশে সম্রাট জাহন্দার। রাজ-সভার দেয়ালের গায়ে গায়ে সুগন্ধী ধূপ জ্বলছে।

হঠাৎ দরবারকক্ষ আলো করে এলো এক দিব্যকান্তি যুবক। মাথা নীচু করে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করল তাদের দুইজনকে। তারপর সম্রাটের পাশে লালকুণওয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, মা, বাবা যা করেননি—করতে পারেন নি, আমি তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করবো,—তুমি শুধু আমার পাশে থেকে আমাকে প্রেরণা দেবে মা—

এমন সময় ঝড় এলো।

কালবৈশাখীর ঝড়। গুম গুম করে ডেকে উঠল মেঘ। মুষলধারে নামল বৃষ্টি। সেই ঝড়ো বাতাস আর বৃষ্টির ভেতরে বিচিত্র সেই তরুণটি কোথায় উধাও হয়ে গেল।

ঘুম ভেঙ্গে গেল লালকুণওয়ারের।

বাইরে সত্যিই বৃষ্টি পড়ছে। রাজপ্রাসাদের উদ্যানে শিরিষ গাছে. ঝড়ো-বাতাসের আর্তনাদ আছড়ে পড়ছে। কিন্তু এ কী স্বপ্ন?

মা—তাকে মা বলে ডাকল কন্দর্পকান্তি এক যুবক। সে বারনারী। তার দেহের রক্তে রক্তে শত শত মানুষের লালসার বিষ। বারবাসরের লীলার অভিশাপে অভিশপ্ত তার জীবনের প্রতিটি দিন। নেহাতই রূপসী বলে সে সম্রাটের প্রিয়পাত্রী। তার ভোগের সামগ্রী। কিন্তু সে হবে রাজমহিষী।

তার ঘুম এল না।

ঘুমুতে পারল না। ডেকে তুলল জাহন্দারকে। ঘুম ঘুম চোখে স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে সে ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল। হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসল।

লালকুণওয়ারের কোলে মাথা রেখে একবারে ছেলেমানুষের মত ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠল।

সে কী, তোমার কী হয়েছে, বেশী নেশা করতে এইজন্যে নিষেধ করি।

একটু শান্ত হয়ে বলল, আমি পাপী, আমি মদ্যপ—আমি শুধু বেশ্যাসক্ত নই—হীন, অত্যন্ত হীন, বলে নিজের ওপরেই যন্ত্রণায় জ্বলে যেতে যেতে বলল, তুমি তো জান—আমার হারেমে আমার সাতশো মহিষী আছে, তারা কেউ আর্মেনিয়ান, কেউ পারসী, কেউ রাজপুত, কেউ মারাঠী, তাদের এক একজনের চেহারা তো দেখেছ ঠিক যেন হৃষ্টপুষ্ট এক একটা বিড়াল। তারা প্রত্যেকে আমার কাছে পালা করে একমাস করে থাকে। প্রায় প্রতিরাত্রে দৈহিক মিলনও হয়, কিন্তু—হঠাৎ থামল জাহন্দার। যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠল মুখখানা। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল, তারা কখনও কেউ সন্তানসম্ভবা হয় না—আমি সন্তানহীন—আমারই পাপে—একটু থেমে আবার বলল, সেই আমার মত লোক গতরাত্রে স্বপ্ন দেখেছি—তোমাকে রোজার সময় প্রতিরাত্রে চিরাগী দিল্লীর তালাবে নগ্ন হয়ে স্নান করেছি। তার ফলেই তুমি সন্তানসম্ভবা হয়েছ—

তুমি আমাকে আগে বলনি কেন?

বলিনি—আমি তো মদ্যপ—আমার কথা বিশ্বাস করবে না—তুমি তালাবে যাবে না—উপরন্তু আমি তোমাকে সাদী করিনি—কখনও মৌলবী ডাকিনি—কোন অনুষ্ঠানই করিনি—

সে সব করতে এখন বাধা আছে?

কোন উত্তর দিল না জাহন্দার। মনে মনে ভাবল, হারেমে যত খুশী রক্ষিতা রাখো—যার সঙ্গে খুশী রাত কাটাও। কিন্তু শাদী করতে হলেই সভার বৈঠক বসাতে হবে—প্রত্যেক সভাসদের অনুমোদন নিতে হবে—সে অনেক ঝামেলা—এসব কিছু না বলে বলল, চলো না, রোজা তো এসে গেল, চিরাগী দিল্লীর সরোবরে স্নান করি—

পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল লালকুণওয়ার। যাকে এত ভালবাসে তাকে সম্মান দিতে এত চিন্তা করছে কেন! হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত মনে হল নিত্য স্নানের ফলে এবং ফকির নাসিরুদ্দিনের আশীর্বাদে—

যদি সন্তানসম্ভবা হয় সে, তখন তো আর দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না।

কি এত ভাবছ ?

কিছু না। যাবো। স্নান করবো। চিরাগী দিল্লীর তালাবে।

রোজার দিন এসে গেল।

গভীর রাত্রে ছয় আর ছয় বারো হাওদার সুসজ্জিত পাল্কী করে রওনা হলো জাহন্দার লালকুণওয়ার।

সে এক অদ্ভুত যাত্রা। হাওদারদের মুখে টুঁ শব্দ নেই। একেবারে নিঃশব্দে তারা সওয়ারী নিয়ে চলেছে।

পাল্কী চলে।

লালকুণওয়ারের বুকের রক্তে আনন্দের কলধ্বনি বাজে। তার চোখে রাজমহিষীব স্বপ্ন নেমে আসে। বাদশার বুকে মাথা রেখে বলে, স্বপ্ন কখনো সত্যি হয় গো ?

কথা বলে না জাহন্দার। সেরাজী খায় আর নেশারক্ত চোখদুটোর দৃষ্টি লালকুণওয়ারের দেহটাকে যেন লেহন করে। গ্যাংড়ানো গলায় বলে, স্বপ্ন সত্যি হয় কিনা বলতে পারি না, তবে যার স্মৃতিতে চিরাগী দিল্লী সৃষ্টি হয়েছে— তার আশীর্বাদে বহু বন্ধ্যা মেয়ে সন্তানবতী হয়েছে—

ফকির নাসিরুদ্দিন খুব জাগ্রত না ?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ বলেই মত্ত একটা পশুর মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জাহন্দার।

আঃ কি করছো—করছো কি পাল্কীর ভেতরে, বলেই সজোরে খিমচে কিল মেরে নিজেকে মুক্ত করল। বলল, একটা পবিত্র কাজে যাচ্ছি আমরা— এখন—এসব—

আরে রেখে দাও তোমার ফকির—রাগী শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে লালকুণওয়ারকে উন্মাদের মত জাপ্টে ধরল আর ক্ষিপ্র হাতে খুলে ফেলল সবুজ কাঁচুলীর বন্ধনে আবদ্ধ সেই বিচিত্র দুটো বিভ্রমের ছবি। তারপর সেই নগ্ন বুকে সে নদী হয়ে মিশে গেল। বাইরে দিনমানের ফুটফুটে জ্যোৎস্না গায়ে মেখে পৃথিবীটা যেন মধুর এক স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইলো। পাল্কী নিঃশব্দে চলতে লাগল।

অশেষ ক্লান্ত দুটো নরনারী পাল্কীর দূর কোণে বসে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। খরচোখে লালসা পরিতৃপ্ত জাহন্দারের দিকে তাকিয়ে বলল লাল,আস্তে আস্তে, ফকিরের চিরাগের এই পবিত্র মাটিতে এসেও তুমি নিজেকে একটু সামলাতে পারলে না। বলতে বলতে কেন যেন এক অজানা আশঙ্কায় তার বুকের ভেতরটা শির শির করে উঠল। আর দূরে কোন গাছের কোটরের ভেতর থেকে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল, ধু—ধুম—ধু—

এক সময় তারা চিরাগী দিল্লীতে পৌছাল—

সবুজ ঘাসে ঢাকা একটা বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠের প্রান্তে একটা দরগা। দরগার ভেতরে ফকির শেখ নাসিরুদ্দিনের সমাধি। কিংবদন্তী বলে শেখসাহেব অগাধ ঐশ্বর্য ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় সর্বত্যাগী ফকিরের জীবন বরণ করে নিয়েছিল। তাঁর অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল।

তার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে ভক্তরা তৈরী করেছে এই দরগা আর সেই মসজিদের সম্মুখে খুঁড়েছে এক বিশাল জলাশয়। এই সরোবর আর দরগাকে লোকে বলে চিরাগীদিল্লী। কেউ জানে না—নিশিরাত্রে কে এই সমাধির ওপরে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে যায় আর সেই সরোবরের পারে কার একটা ছায়াদেহ ধীর পায়ে পায়চারি করে। স্থানীয় লোক অনেক কথা বলে। সে সব অন্ধ সংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু—

লালকুণওয়ারের ইতিবৃত্ত অতিরঞ্জিত গল্পও নয়। সেটা প্রকৃত ঘটনা। মধ্যযুগের এই ঐতিহাসিক করুণ ঘটনাটি অশ্রুবিন্দুর মত টলমল করছে মানুষের মনে।

শুরু হল স্নান পর্ব।

মাথার ওপরে রাশি রাশি তারার দীপালি জ্বলছে। সেই তারার ঝাঁক দোল খাচ্ছে চিরাগীর কালো জলে।

তারা দাঁড়ালো দীঘির পাড়ে।

দুইজনেই সম্পূর্ণ নিরাবরণ। সেই নিশিরাত্রের তরল অন্ধকারের পটভূমিতে তারা ভরা আকাশের নীচে তাদের মনে হল, যেন সৃষ্টির প্রথম পুরুষ ও নারী। লালকুণওয়ারকে নিয়ে উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। দীঘির শান্ত জল আলোড়িত করে চলল জলকেলী।

সন্তানের কামনায় উন্মাদ হয়ে ভুস ভুস করে ডুব দেয় লালকুণওয়ার,

কখনো সাঁতরে সাঁতরে চলে যায় দীঘির আর এক প্রান্তে। কখনো পরস্পরকে ডুব দিয়ে ধরার চেষ্টা করে।

আকাশে রমজানের চাঁদ দেখা যায়।

হঠাৎ নাম না জানা রাতচরা পাখীর কর্কশ স্বর ভেসে এল বহু—বহু দূর থেকে! আর সাঁ সাঁ করা বাতাস প্রেতিনীর মতো কাঁদতে লাগল দীঘির চারিদিকের উঁচু পাড়ে।

চল আর ভাল লাগছে না।

এক্ষুণি কি? রাত শেষ হোক—তীব্র উৎসাহে জাহন্দারের ভেজা চোখ দুটো জ্বলে আর লালের নগ্ন দেহটার দিকে লোভীর মত তাকায়। আবার ভয়—সাংঘাতিক একটা ভয় শিউরে ওঠে তার বুকের ভেতর—যদি সত্যিই—

সত্যিই আল্লার দয়ায়, ফকিরের কৃপায় এই বেশ্যা যদি গর্ভবতী হয়ে যায়। তখন—তখন তো লোকলজ্জার ভয়ে একে শাদী করতেই হবে।

আশ্চর্য! কয়েক মুহূর্ত আগে যার যৌবন পুষ্ট দেহটাকে পরম উল্লাসে ভোগ করেছে। তাকে শাদী করবে ভাবতেই বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল তার মন। শাদী কথাটার ভেতর যেন যুগযুগান্তরের সংস্কার জড়িয়ে আছে।

কি ভাবছো?

কিছু না তো, মনের সব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সহজ স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করলো বাদশা। বলল, তাহলে আর স্নান করবে না বলছো।

না, বেশ শীত শীত করছে—আর পারছি না গো. আদুরে গলায় বলল লালকুণওয়ার। ধীর পায়ে সে পাড়ে উঠে এলো। পূর্ণিমা চাঁদের আলোর গোলকটা তার ভেজা চুলে ভরা মাথার পিছনে জ্যোতি শিখার মত ফুটে রয়েছে। চাঁদের ধূসর আলোয় সেই অনাবরণ ও সুযৌবনা নারী দেহকে একটা সুদূর স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল। যে কোন মুহূর্তে—যেন সেই নারীর ধান্যমঞ্জরীর মত নগ্ন নারীতনু ওই আকাশে, জ্যোৎস্নার আলোয় দূরের কাজল কালো দিগন্তে গলে গলে জল হয়ে মিশে যেতে পারে।

জাহন্দারের অপলক চোখদুটো মুগ্ধ হয়ে গেল। সে একটা সুদৃশ্য তোয়ালে দিয়ে তার সেই সিক্তদেহ মুছে দিতে শুরু করল। আস্তে আস্তে মুছছে, যেন কোন ফুলের গা থেকে ধুলো ঝেড়ে দিচ্ছে। তারপর—

তারপর পাল্কী থেকে এল এক বিশাল রৌপ্যপাত্র। তার ওপর সাজানো

রয়েছে মুর্শিদাবাদ রেশমে তৈরী জামদানী শাড়ী। সুর্মা, মেহেদী, সুগন্ধী আতর—আরও সব বিচিত্র ও বহুমূল্য প্রসাধন সামগ্রী। একটু পরেই অপরূপ সাজে সাজলো লালকুণওয়ার। সেই দীর্ঘ ছন্দিত দেহ পেচিয়ে পরল নীলাভ রঙের জামদানী। তাকে দেখে মনে হল কালো মেঘের ভেতর থেকে যেন বিজুলীরেখা ঝকমক করছে।

আবার—আবার জাহন্দারের মনে লোভের সাপ ফুঁসে উঠল।

কিন্তু—ভবিষ্যৎ আশঙ্কার কথা, ফকিরের অনুশাসন এবং এই বহুভোগ্যা নারীর মনে ঘর সংসারের দুর্বার লোভ, সে-সব ভেবে নিজেকে সংযত করল।

দিন কাটে। যেই ঘন হয়ে রাত নামে,অমনি রাজপ্রাসাদের গুপ্তদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যায় সোনালী ঝালর দেওয়া সুদৃশ্য শিবিকা।

লালকুণওয়ার কোনদিন জাহন্দারের কোলে মাথা রেখে আবেশে চোখদুটো বুজে থাকে, আবার কোনদিন বাদশার চওড়া বুকে মাথা রেখে ব্যাকুল হযে বলে, বলো—বলো—তুমিও মনে মনে একটি সন্তান চাও—

তুমি আমায় বিশ্বাস করো না লাল—বাদশার কথায় অভিমানের আভাস ফুটে ওঠে। লালকুণওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ে জাহন্দারের বুকে। আর চুমায় চুমায় একেবারে আচ্ছন্ন করে দেয় তার কালো কুচকুচে দাড়িতে আচ্ছন্ন মুখাবয়ব। জাহন্দারের স্নায়ুতে স্নায়ুতে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কানের পিঠ দুটো গরম হয়ে ওঠে। তার মনে হয় তার শিরদাঁড়া বেয়ে যেন উত্তপ্ত জলের স্রোত হু হু করে বয়ে চলেছে! দাঁতে দাঁত চেপে ধরে ভেতরের ঝড়টাকে সামলাতে চেষ্টা করে। পারে না।

মাসখানেক পর একদিন লালকুণওয়ার হাসিতে লাস্যে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে যেই সুখবরটা দিল জাহন্দারকে, অমনি তার চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল। কিন্তু হেসে বলল, আল্লা তাহলে আমার প্রার্থনা শুনেছে—

সেইদিন—সেইদিনই রাত্রে তারা এল চিরাগী দিল্লীতে। লালকুণওয়ার ভেতরে ভেতরে খুশিতে ফেটে পড়ছে। পরীর মত সেজেছে। যেন হাওয়ার ওপর পা ফেলে সে জলে নামল। নামল জাহন্দার! দুজনে পরম উল্লাসে জলকেলি করল কিছুক্ষণ—হঠাৎ জাহন্দার বলল—মিষ্টি করে বলল, চলো তোমাকে পিঠে করে নিযে সাঁতরে ওপারে যাই—

পারবে—চলো—

লালকুণওয়ার তার হাল্কা দেহটা এলিয়ে দিল বাদশার পিঠের ওপরে।

জাহন্দার দুই হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে পুকুরের মাঝখানে অগ্রসর হলো। সেখানে অনেক জল—

হঠাৎ চিৎ হয়ে লালকুণওয়ারকে উল্টে ফেলে দিল জলে। আর দুই হাত দিয়ে লোহার সাঁড়াশীর মত তার গলাটা টিপে ধরল।

এ কী—তুমি! আর কিছু বলতে পারল না—দীর্ঘক্ষণ স্নানে, সাঁতারে ক্লান্ত লালের দেহটা অসাড় হয়ে ভারী একটা পাথরের মত তলিয়ে গেল অতল জলে—

আর—বাদশা জাহন্দার?

পাড়ে উঠতে উঠতে অস্ফুটস্বরে বিড় বিড় করে বলল, হ্যাঁ—একটা বেশ্যার হয়েছিল রাজমহিষী হওয়ার শখ—

আজও অনেক রাতে সব পাখি যখন ঘুমিয়ে পড়ে, আকাশের চাঁদ যখন একা একা হাসে তখন শ্বেতবসনা এক দীর্ঘতনু নারী ধীরগতিতে যেন হাওয়ার ওপর পা ফেলে বারে বারে চিরাগী দিল্লীর সেই বিশাল জলাশয় অতিক্রম করে।

গ্রামবৃদ্ধরা বলে, ওই ছায়াদেহ আর কারুর নয়, লালকুণওয়ারের অতৃপ্ত আত্মাই এখানে আসে। নগণ্য এক নগরসুন্দরী হয়ে বড় স্বপ্ন দেখেছিল বলেই তাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল।

দশম স্তবক

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসবিখ্যাত এক নগরসুন্দরী যার জন্য লক্ষ্ণৌ থেকে প্যারিস পর্যন্ত আলোড়ন উঠেছিল; বিচলিত হয়ে উঠেছিল দিল্লীর ফরাসী দূত থেকে শুরু করে মারাঠী মন্ত্রী নানাফড়নবীশ—

শুরু হলো ইউরোপীয় যুগ।

দুঃসাহসী বিদেশী ব্যবসায়ীরা দলে দলে উত্তাল সাগড় পাড়ি দিয়ে এল এদেশে। তারা বহন করে নিয়ে এল নতুন চিন্তা, নতুন ভাবধারা। তারা গঞ্জে গঞ্জে গড়ল কুঠি, গড়ল দুর্গ, গড়ল গীর্জা। দেশের মানুষের সঙ্গে তাদের ভাবের আদান-প্রদান হলো। সাগরপারের শ্বেতকায় অধিবাসীদের সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জীবনাদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার ফলে যেমন এদেশের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী হলো প্রসারিত, এল মানসিক সমৃদ্ধি—যাকে এককথায় ইতিহাসে বলা হয়েছে 'রেনেসাঁস'—তেমনি প্রদীপের উজ্জ্বল আলোর নীচেই জমে উঠল পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার।

এই হয়—এই নিয়ম। নদীর এক কূল যেমন গড়ে,তেমনি আর এক কূল ভাঙ্গে।

ইউরোপীয়দের সঙ্গে সান্নিধ্যের ফলে এদেশের মানুষের সহজাত ধর্মবিশ্বাস ও নীতিবোধ বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তার কারণ বিদেশীদের উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল জীবনের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল এখানকার মানুষের মনে! এই যুগসন্ধিক্ষণের নির্ভরযোগ্য এক ইতিহাসে লিখছে—Drunkenness, gambling house and brothels, resort of dancing girls were universally practiced by Europeans. প্রকাশ্যে মদ্যপানের জন্য বার, জুয়োখেলার কেন্দ্র ও বেশ্যালয় তৈরী করতে লাগল ইউরোপীয়রা। আবার আর একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বলেছেন স্পষ্ট, পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরেজ সওদাগররা অধিকাংশই ছিল অবিবাহিত। যারা বিবাহিত ছিল তাদেরও পরিবার নিয়ে আসার হুকুম ছিল না। তাই তারা প্রকাশ্যেই দেশীয় স্ত্রীলোকদের উপপত্নী বা রক্ষিতা হিসেবে রাখতো—Kept native concubines and proses……

এদেশে পর্তুগীজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র, গোয়ার এখানে সেখানে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠল দেশী মদের দোকান আর 'ব্রথেল' বা বেশ্যালয়। দুর্নীতির স্রোত বয়ে যেতে লাগল গোয়ায়।

Carey. Good old days of John Company. দ্রষ্টব্য

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য পর্তুগীজরা ব্যবসা করতে এসে নির্বিচারে শুরু করেছিল লুঠতরাজ আর নারীধর্ষণ। নির্মম আর হিংস্র জলদস্যুর ভূমিকা নিয়েছিল তারা। বাংলার সমুদ্রপোকুলের নোয়াখালি, বরিশাল, চব্বিশ পরগণার জনবহুল জেলাগুলো জনমানবহীন শ্মশানে পরিণত হয়েছিল।

পর্তুগীজরা এদেশের মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে বাছাই করতো। তাদের ভেতরে যারা সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী ও যুবতী শুধু তাদেরই কুঠিতে রেখে পাশ্চাত্য দেশের উপযোগী আদব-কায়দা শিখিয়ে বেশ্যাবৃত্তির ট্রেনিং দিত। তারপর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাদের চড়া দামে বিক্রি করতো!

এই শহর কলকাতার গঙ্গার ধারেই আহিরীটোলা অঞ্চলে 'তাদের এমন একটি পর্তুগীজ কুঠির অস্তিত্ব ছিল* যেখানে নেটিভ মেয়েদের সর্টস্কার্ট আর ব্লাউজ পরিয়ে বাজনার তালে তালে বিলেতী নাচ শিখিয়ে চটকদার বারবণিতায় পরিণত করা হতো। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আলেকজান্দার হ্যামিল্টন স্বচোক্ষে দেখেছেন, ডাচদের অর্থাৎ ওলন্দাজদের এই রকম একটা বাগানবাড়ি যেখানে Number of girls are trained up for the prostitutions···

শুধু পর্তুগীজ নয়, শুধু ওলন্দাজ নয়। ইংরেজ এবং ফরাসী সওদাগররাও এই জীবন্ত পণ্যের ব্যবসা খুব লাভজনক মনে করেছিল।

বলাবাহুল্য, ভারতের পতিতাবৃত্তির ইতিহাসেও ইউরোপীয় সওদাগরদের এই ঘৃণ্য বেসাতি এবং তাদের নীতি-ধর্ম বহির্ভূত উচ্ছৃঙ্খল আচরণের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। অর্থাৎ অবারিত আকাশে মনের আনন্দে ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো পাখীকে যেমন খাঁচায় পোরা হয় তেমনি বহুবল্লভ' বারবিলাসিনীরা মাত্র একজনের ভোগের উপকরণ হয়ে হারেমে বন্দিনী হয়েছিল মুসলমান যুগে; আর ইংরেজ যুগে তারা হয়ে গেল commodity অর্থাৎ নিছক পণ্য!

ভাবতেও বিস্ময় হয় গৌতম বুদ্ধের স্নেহধন্যা প্রখরবুদ্ধিশালিনী সুলসা, ভরতাদি কোহল নৃত্যক্রিয়ায় নিপুণা মন্দার, আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বিদুষী শালবতীদের উত্তরসুরীরা সাহেবদের অর্থাৎ ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের অঙ্কশায়িনী হয়ে ঘৃণিত জীবন-যাপন করতে লাগল কিম্বা মসলা আর মসলিনের সঙ্গে রপ্তানী হয়ে চলে গেল পশ্চিমের দেশে দেশে। তবুও—

তবুও গভীর পঙ্কে পদ্ম ফোটে। বিদেশীদের সেই সর্বনাশা বীভৎস পাপচারের ক্লেদ পঙ্কিল পরিবেশের ভেতর থেকেই কোন কোন রূপজীবিনী শুধু

---

*Stark Calcutta in Slavery days. দ্রষ্টব্য

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর প্রখর ব্যক্তিত্বের জোরেই ঘটনাজটিল ইতিহাসের অঘটন-ঘটন-পটিয়সী নায়িকা হয়ে গিয়েছে। যেমন—

মতিবেগম।

লক্ষ্ণৌয়ের নগরশোভনা বাইজী মতিবেগম হয়ে গিয়েছিল মিসেস বেনেট। এই মতিবেগম একদিন লক্ষ্ণৌ থেকে সুদূর প্যারিস পর্যন্ত তীব্র আলোড়ন তুলেছিল। আর দিল্লীর মোগল সম্রাট বাদশা শাহ আমলের দরবারের ফরাসী রাজপ্রতিনিধিকে পর্যন্ত বিখ্যাত মারাঠা মন্ত্রী নানাফড়নবীশের কাছে মাথা নত করতে হয়েছিল। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর মারাঠা ও ইউরোপীয় শক্তির সেই প্রচণ্ড সংঘর্ষে ইন্ধন পর্যন্ত জুগিয়েছিল সেই সুন্দরী বারবিলাসিনী।

যেমন বিচিত্র এই নগরসুন্দরী মতিবেগম তেমনি রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চকর তার ইতিবৃত্ত। তার বৃত্তান্ত শুরু করা যেতে পারে প্যারিস মহানগরীর উপকণ্ঠে সাকেসসের সেই সুদৃশ্য রেষ্টুরেণ্ট থেকে যার সাইনবোর্ডে প্রোপ্রাইটারের ফরাসী নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ভারতীয় মুসলমান নাম—

কাউণ্ট আলেকজান্দার বেনেট দ্য বয়জেন (মহম্মদ আলীবক্স); শুরু করা যেতে পারে লক্ষ্ণৌ শহরের এক প্রাসাদোপম অট্টালিকার আলোকজ্জ্বল জলসাঘর থেকে কিম্বা চন্দ্রালোকিত নিশিরাতে গোমতী নদীর বুকে নৌকা বিহার থেকেও আরম্ভ করা যেতে পারে।

ভারত-ইতিহাসের সেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধকালে যখন ক্রমবর্দ্ধমান ইউরোপীয় শক্তি ধীরে ধীরে অক্টোপাসের মত জাল বিস্তার করছিল—সেই যুগসন্ধির সঙ্গে যার বৃত্তান্ত জড়িত, যার ইতিবৃত্ত লক্ষ্ণৌ থেকে সুদূর প্যারিস পর্যন্ত বিস্তৃত তার কাহিনী গুছিয়ে বলা কঠিন। তাই ঠিক যেমন ঘটনার স্রোত গড়িয়েছিল. ঠিক তেমনি বলা হলো—

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আর পাঁচজনের মতই ভাগ্যান্বেষণে এদেশে এসেছিল এক ইউরোপীয় সওদাগর।

চার্লস দ্য বয়জেন।

সুন্দর সুপুরুষ চেহারা। জাতে ফরাসী। হাসিখুশি আমুদে। দিলদরিয়া মানুষ। বুদ্ধিও ছিল ক্ষুরধার। এদেশে এসেই ইংরেজ বেনিয়াদের সঙ্গে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসায় নেমে পড়ল। মালাক্কা, সুমাত্রা ও বোর্ণিও থেকে আমদানী করতো সার্টিন, ভেলভেট, ব্রোকেডস ইত্যাদি বিচিত্র বস্ত্রসম্ভার।

সেই সঙ্গে কর্পূর নিয়ে আসতো বোর্ণিও থেকে, সিংহল থেকে দারুচিনি, আদা আনতো মালবার থেকে। আর এ দেশ থেকে রপ্তানী করতো ভুবনবিখ্যাত মসলিন, গাঙ্গেয় জটামাংসী (একপ্রকার সুগন্ধী দ্রব্য) আর কচ্ছপের খোল। এই আমদানী-রপ্তানীতে তাদের অঢেল লাভ হতে লাগল। কয়েক বছরের মধ্যে যৌথ ব্যবসার ভেতরে থাকতে থাকতেই বয়জেনের ব্যক্তিগত পুঁজির অঙ্কও বেশ ফেঁপে উঠল। তারপর—

তারপর আর কি! টাকা হলেই যা হয়। একটু বিলাসব্যসন আরাম-বিরামের দিকে মন যায়। ভেতরের অবদমিত বাসনাগুলোও মাথা চাড়া দেয়।

বয়জেনের তখন আঠাশ বছরের উদ্দাম যৌবন। কখনো কোন কাজের অবসরে, হয়তো কোন সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে জাহাজে মাল লোড করতে করতে দূরে অস্তমান চাঁদের আলোর দিকে তাকিয়ে তার মনের ভেতরে একটু একটু করে পুঞ্জীভূত ব্যথার ভার জমে উঠতে থাকে। কতদিন—কতকাল যে কোন শ্বেতাঙ্গিনীর কোমল হাতের স্পর্শ পায় নি সে। তার স্বদেশীয় মেয়েদের নিবিড় কবোষ্ণ সান্নিধ্যের জন্য তার দেহ-মন তৃষিত হয়ে ওঠে। কিন্তু—

এদেশের কোন শ্বেতাঙ্গিনী আকাশের তারার মতই সুদূর। যদি বা দু' একজন আসে তাকে নিয়ে খানদানী ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের ভেতরে লোফালুফি হতে হতে শেষ পর্যন্ত শুরু হয়ে যায় ডুয়েল। খুনোখুনি হয়ে রক্তের স্রোত বয়ে যায়। তবে—

হ্যাঁ। ইচ্ছে করলেই সে ইংরেজ কি পর্তুগীজ বা ডাচ সাহেবদের মত দু' একটা 'মেড স্লেভ' রাখতে পারে। নামে মেড স্লেভ। আসলে কন্কুবাইন। দিনের বেলা সাহেবের সেবা যত্ন করে। ফাইফরমায়েজ খাটে। আর রাত্রে সেই হয় সাহেবের শয্যাসঙ্গিনী! আদব-কায়দা জানে না। শিক্ষা সহবতের বালাই নেই—এমন কালো কদাকার মাংসপিণ্ডের মত মেয়েগুলোকে নিয়ে খাটে শোয় কি করে ওরা! এসব কথা ভাবতে ভাবতে ঘেন্নায় থুথু ফেলে বয়জেন।

মোটামুটি গায়ের রঙটা একটু ফরসা হবে। গড়নটা হবে 'স্লিম'। একটু নাচ-গান জানবে আর তার সঙ্গে একটু আধটু কাজ চালানোর মত ইংরেজী যদি জানে তাহলে তো একেবারে সোনায় সোহাগা! এইরকম একটা মেয়ে পেলে সে যে কোন মূল্যে কিনতে পারে।

ব্যবসার সূত্রে দেশদেশান্তরে ঘুরতে ঘুরতে এইরকম একটি মেয়েই পেল

বয়জেন। ক্রসব্রীড। বাপ পর্তুগীজ। মা কেরালার এক নেটিভ ক্রীশ্চানের মেয়ে। তাদের মেয়েটির নাম শুভলক্ষ্মী! চালাকচতুর। দেখতে শুনতে স্মার্ট। তার বাবা যতদিন বেঁচেছিল তখন বুঝি কনভেণ্টে পড়েওছিল দু'এক বছর।

তখনকার দিনে 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' দাসদাসী ক্রয় বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ছাপা হতো। যেমন তেমন একটা মেড স্লেভ। বিলেতী রান্না জানে। চা-কফি তৈরী করতে পারে—তাহলে তার দাম ছিল দশ বারো টাকা। আর সে যদি যুবতী হয় এবং দেখতে শুনতে সুন্দর হয় তাহলে তার দক্ষিণা চড়ে গিয়ে হতো ত্রিশ-চল্লিশ টাকা। তাই বয়জেন বাজার দরের চেয়ে একটু বেশী পঞ্চাশ টাকা দিয়েই শুভলক্ষ্মীকে কিনতে চাইল। কিন্তু তার অভিভাবক মা ও কাকা কিছুতেই রাজী হলো না। বলল, না সাহেব মেয়ে আমরা বিক্রি করবো না। আপনার যদি সত্যিই ওকে পছন্দ হয় তাহলে বিয়ে করে নিয়ে যান—

ম্যারেজ! চমকে উঠল বয়জেন। একটা নেটিভ ক্রীশ্চানের ক্রসব্রীড মেয়েকে বিয়ে করতে হবে! তার দেশের লোক যে থুথু দেবে তার গায়ে আর 'ম্যারেজ' মানেই যে বন্ধন। পায়ে বেড়ী। সে দুনিয়ার দেশে দেশে ভেসে ভেসে বেড়ায। কিন্তু—

কুছ পরোয়া নেই। মনে যখন ধরেছে চার্চে গিয়ে রীতিমত পাদ্রীসাহেবের সুরে সুর মিলিয়ে শপথ আউড়ে বিয়ে করে ফেলল শুভলক্ষ্মীকে। প্রথম দু একটা মাস যেন পাখির মত মনের সুখে ডানা মেলে উড়ে চলে গেল হুঁ হু করে।

কিন্তু—বয়জেন যে ভয়টা করছিল তাই হলো। কাজেকম্মে বাইরে গিয়ে একটু দেরী করে ফিরলেই শুভলক্ষ্মীর মুখ ভারী হয়ে উঠতো। রাগে থমথম করতো। বলতো সারাদিন বাইরে বাইরে কি করো—বলো তো—

বয়জেন কথা বলতো না। তার মনে হতো এটা ইণ্ডিয়ার মাটির দোষ। এখানকার নেটিভ মেয়েগুলো বড্ড বেশী সংসারী আর ঘরকুনো! তাদের দেশের মেয়েদের মত পুরুষের জীবনের উদ্দাম গতিকে তারা বিশ্বাসও করে না; শ্রদ্ধাও করে না। অতএব—

দিন রাত তুচ্ছ ব্যাপারে খিটিমিটি লেগেই থাকতো। আর বয়জেনের মনে হতো, কে যেন তাকে একটা মোটা রশি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এইরকম যখন তার মনের অবস্থা তখন তাকে ব্যবসার কাজে যেতে হলো মসুলিপত্তনে।

মসুলিপত্তনে তখন ফরাসীদের জয়জয়াকার। পণ্ডিচেরীর গভর্ণর ডুপ্লে

সাহেবের কৃতিত্বে সারা দক্ষিণাত্যেই বয়জেনের স্বদেশীয়দের দারুণ প্রতিপত্তি।

হায়দরাবাদের নিজাম খুশি হয়ে মসুলীপত্তন বন্দরটাই দান করে দিয়েছে ফরাসীদের। অতএব সেখানে তাদের ব্যবসা জাঁকিয়ে উঠলো। কিন্তু এখানে এসে তার কাজ শেষ হওয়ার পর সুরাটে শুভলক্ষ্মীর কাছে ফিরে যাবে এমন সময় মহীশূরের শাসনকর্তা হায়দার আলীর সঙ্গে বেধে গেল ইংরাজদের যুদ্ধ। এই হায়দারকে কেন্দ্র করেই তাদের (ফরাসী) সঙ্গেও শুরু হয়ে গেল ইংরেজদের বিবাদ।

ঠিক এই সময় সুদূর ইওরোপের মাটিতেও ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সে যুদ্ধ বাধতেই ভারতের দক্ষিণাপথে সেই বিরোধটা আরও প্রবল হয়ে উঠল। দক্ষিণ সমুদ্রোপকূলের প্রত্যেকটি বন্দরের ব্যবসাবাণিজ্য এবং স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেল। বয়জেনের আর সুরাটে যাওয়া হলো না। সে তার পণ্যবাহী জাহাজে পাড়ি দিল সুমাত্রায়।

এসব ১৭৮১ সালের কথা।

সুমাত্রা থেকে কখনো মালাক্কায় কখনো বর্ণিওতে কখনো জাভায় কখনো বলিদ্বীপে কখনো ব্রহ্মদেশে—ব্যবসার সূত্রেই ঝড়ো বাতাসের মত বয়জেন ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আর মনের ভেতরে পুরানো একটা চিঠির মতই ম্লান আর বিবর্ণ হয়ে গেল শুভলক্ষ্মীর মুখখানা।

তারপর আর কখনো বয়জেন নিজেকে ম্যারেজ-ট্যারেজের হাঙ্গামায় বোকার মত জড়ায়নি। তবে জাভা, বলিদ্বীপ, শ্যাম ইত্যাদি এইসব দেশের মেয়েগুলোর গোল মুখে ছোট ছোট চোখে কেমন একটা হাসি হাসি সরলতা তার মন টানল। প্রায় প্রত্যেকটা মেয়েই একটুআধটু নাচগান জানে। দেশে থাকতে তারও অল্পস্বল্প গানবাজনার দিকে ঝোঁক ছিল। এই দেশেরই গরীব-কূলের দু'একটা মেয়েকে "কেপ্টও" রেখেছিল সে। কিন্তু—

এখানেও ওই একই ব্যাপার। সেই যে কথায় বলে না, লাই দিলেই মাথায় উঠে বসে। কোন মেয়ের সঙ্গে যেই একরাত কি দুইরাত কাটিয়েছো, অমনি ওরা একতাল কাদার মত গায়ে গায়ে লেপ্টে থাকবে। ছাড়াতে চাইলেও ছাড়বে না। হবেই তো, ওদের রক্তের ভেতরেও যে শুভলক্ষ্মীর মানে 'ইণ্ডিয়ান ট্র্যাডিশান' মিশে রয়েছে!

ওদিকে ভারতে ইতিহাসের পটপরিবর্তন হলো। মহীশূরব্যাঘ্র টিপু ইংরেজদের কাছে হেরে গিয়ে সন্ধি করেছে। দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ হচ্ছে

একচ্ছত্র অধিপতি। তখন চলছে লর্ড কর্ণওয়ালীসের রাজত্ব। এই সময় ভারত থেকে আগত আর এক ফরাসী ব্যবসায়ীর কাছে জানতে পারল, আগ্রায় খুব জমে উঠেছে নীলের ব্যবসা! লক্ষ লক্ষ বেল নীল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করে ইংরেজরা প্রচুর লাভ করছে।

ব্যবসাদার মানুষ। টাকার গন্ধ পেয়েই বয়জেন সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে জাভা থেকে চলে এল আগ্রায়। আগ্রা থেকে এল লক্ষ্ণৌতে। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়। লক্ষ্ণৌ-এর উপকণ্ঠে নীল চাষীদের কাছ থেকে সরাসরি মাল কিনে চালান দিতে পারলে প্রফিটের মারজিন একটু বেশী থাকে।

ইতিমধ্যেই একদিন লক্ষ্ণৌ শহর বেশ সরগরম হয়ে উঠল। কী ব্যাপার? বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালীস আসছেন লক্ষ্ণৌতে। তার সম্মানে নবাব বাড়িতে মাইফেলির আসর বসল। বয়জেন খাস খানদানী সাহেব। ডাকসাইটে বেনিয়া। অতএব নেমন্তন্ন পেল সেই জলসায়। সেই আসরে গাইতে এল হিন্দুস্থানী ঘরানাগানের শ্রেষ্ঠ গায়িকা, শহরের সেরা সুন্দরী বাঈজী মতিবাঈ!

দীর্ঘ ক্ষীণ শরীরটা সবুজ রঙের পান্নাহাজরা শাড়িতে পেঁচিয়ে সবুজ প্রজাপতির মতই যেন হাওয়ার ওপরে পা ফেলে আসরে এল সে। বয়জেনের মনে হল, যেন অন্ধ হয়ে গেল তার—তার চোখের দৃষ্টি। নেটিভ মেয়ে এত ফরসা হয়। আলপসের বরফের মত সাদা তার গায়ের রঙ। আর সাগরের জলের মত কেমন নীলাভ দুটো চোখ!

যেমন খুপসুরৎ চেহারা তেমনি গানের গলা। যতক্ষণ শুনছিল, বয়জেনের শুধু মনে হয়েছিল যেন কোন সুদূর স্বপ্নের দেশে নিয়ে চলেছে সেই করুণ-মধুর আর উদাস সেই গানের সুর! আর তার মনে হল ঠিক এইরকম একটা মিষ্টি মেয়ের ছবিই যে আঁকা রয়েছে তার মনে।

গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বয়জেন তাকে দু'হাজার টাকার একটা তোড়া দিয়ে বলেছিল তোমার বখ্‌শিস—দশ বছর ইণ্ডিয়াতে আছি—তোমার মত এরকম গানের গলা আর কখনো শুনিনি—

মতিবাঈ কথা বলেনি।

কালো ডাগর চোখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটেছিল। জাফরাণী রঙের ওড়নাটা মুখের ওপর আর একটু টেনে দিয়ে বলেছিল অনেক ধন্যবাদ সাহেব—তবে টাকাটা আমাকে নয়—ওঁকে দিন বলেই তার তবলচীকে ইঙ্গিত করল। আধময়লা পাজামা পাঞ্জাবী পরা যে লোকটা এতক্ষণ তবলা সঙ্গত করছিল

আর নানা ইঙ্গিত দিয়ে মতিবাঈকে কখনো ভাল বলছিল কখনো তারিফ করছিল, সেই লোকটা জন্তুর মত এগিয়ে এসে যেন ছোঁ দিয়েই তোড়াটা নিয়ে গিয়েছিল।

সেই শুরু।

মতিবাঈয়ের সঙ্গে সেদিনের সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পৌছতে দেরী হ'নি। বয়জেনও কেমন পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। ব্যবসা-ট্যাবসা উড়ে গেল মন থেকে। আলমনগরের মতিবাঈয়ের বাড়িতে পড়ে থাকে। বাঈজী-মহলে মতিবাঈজীর কদর বেড়ে গেল। খাস খানদানী সাহেবের মহব্বতের লোক।—তখনকার দিনে নেটিভরা সাহেবদের কাছে একটু খাতির যত্ন পেলে একেবারে বর্তে যেত।

কোনদিন তারা ইমামবাড়ার পাশ দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে চলে যেত সদতগঞ্জ ছাড়িয়ে গোমতী নদীর দিকে। আবার কোনদিন জ্যোৎস্নাভরা রাতে গো৲মতীর জলে ময়ূরপঙ্খী ভাসিয়ে নৌকাবিহার করতো।

একদিন রাত্রে মতিবাঈ নৌকোয় তার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে বলল, ওই আকাশে যে চাঁদটা দেখছি এই চাঁদ-ই কি তোমাদের দেশের আকাশেও এখন এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে—

কোন কথা বলল না বয়জেন। দেশের কথা বলতেই চকিতে তার বুড়ী-মা-র মুখখানা মনের ভেতরে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। মতিবাঈয়ের উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের দেশে যেতে তোমার খুব ইচ্ছে—না?

তোমাকে তো আমি কতবার বলেছি গো—তোমাদের দেশের গান সম্বন্ধে আমার জানতে ইচ্ছে করে. একটু থামল। আর যেন সাবেক দিনের কোন স্মৃতির ভেতরে মগ্ন হয়ে গাঢ় গলায় বলল, জানো, আমার মা বলতেন, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের রাগরাগিনী সম্বন্ধে জানলে সঙ্গীতবিদ্যা খুব সমৃদ্ধ হয়—

তোমার মা, বিদেশী গান সম্বন্ধে জানলেন কি করে?

বলো কি সাহেব, তুমি তো জানো আমার মা ছিলেন পেশোবা বালাজী বাজীরাও-এর দরবারের সেরা গাইয়ে। একবার এক সাহেব এসে. জানি না তোমার দেশের না বিলেতের সেই দরবারে যে গান শুনিয়েছিল, সেই গান হুবহু গাইতে পারতেন। কমলাবাঈ-এর কথা বলতে বলতে মুখর হয়ে উঠল মতিবাঈ। জানো তো বালাজী বাজীরাও ছিলেন ডাকসাইটে পেশোবা।

ইংরেজদের তুঙ্গভদ্রা নদীর ওপারে হটিয়ে দিয়েছিল—সেই গুজরাট থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত ছিল তার সীমানা। তাই সাহেবসুবোরা নানা উপঢৌকন নিয়ে তাকে খুশি করতে আসতো—সাহেবরা এলে তাদের সম্মানে যে জলসা হতো তাতে দু'একজন বিদেশী খুশি হয়ে কচিৎ তাদের দেশের গানের নমুনা শোনাতো—

এসব তো তুমি আমাকে অনেকবার বলেছো, বয়জেনের কণ্ঠে একটু যেন বিরক্তি ফুটে ওঠে। একটু থেমে আবার হেসে শান্ত গলায় বলে, এবার যখন যাবো, তোমাকে নিয়ে যাবো ডার্লিং—

দেখো, আকাশের নীচে বসে বলছো কিন্তু। হঠাৎ চোখদুটো প্রখর করে তর্জনী তুলে কঠোর গলায় বলল, কথার নড়চড় কিন্তু করো না। তুমি কিন্তু অনেকদিন ধরে নিয়ে যাবো—নিয়ে যাবো করছো। একটু থেমে দূরে বহুদূরে ওপারে চাঁদের আলোয় ঘসা ঘসা ছবির মত অস্পষ্ট কালো দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থেমে থেমে বলেছিল, জানো তো আমি যে শুধু মারাঠী মুসলমানের মেয়ে—তা নয় আমার মা কমলাবাঈজী পেশোবা বালাজী বাজীরাও এবং তার মন্ত্রী—তোমরা যার নাম শুনলে ভয়ে কাঁপো সেই নানা ফড়নবীশের স্নেহধন্যা। আমি এক কথা ঘ্যানোর ঘ্যানোর করে বলতে পছন্দ করি না—

সেইদিনই শেষ রাতে ক্লান্ত দেহ নিয়ে যখন বাড়ি ফিরল সেই তখন তার বুড়ো তবলচী রামদাস পাণ্ডে বলল, তুই বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস বেটী—

চুপ করো, যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল মতিবাঈ—আমার কোন শখ-আহ্লাদ থাকতে পারে না—

তুই ভুলে যাচ্ছিস বেটী, তুই বাঈজী, কোন একজন পুরুষকেই—

তোমার বলতে লজ্জা করে না, আমার মা-র সঙ্গে তোমার তাহলে –

ছিঃ ছিঃ মতি—দুহাতে কান ঢেকে আর্তনাদ করে উঠেছিল দেশপাণ্ডেজী। তার সামনে আর দাঁড়ায় নি। দাঁড়াবে কোন মুখে? দ্রুত পায়ে তার ঘরে চলে গেল।

ভোরের আলোআঁধারীতে আচ্ছন্ন ঘরে দাঁড়িয়ে তার বিক্ষুব্ধ মনের ভেতরে ভেসে উঠল বীণাবাদিনী এক তন্বী রমণীমূর্তি! তার কণ্ঠে ফুটে উঠতো একটির পর একটি বিদ্যুতদীপ্ত রাগরাগিণী—কেদারা, ভীমপলশ্রী, ছায়ানট, নটমল্লার! কিন্তু যখন গাইতো টোড়ী—তখন যেন মনে হতো, বিরহের এক করুণ মধুর সঙ্গীত আকাশ বাতাস বন-বনান্তকে আচ্ছন্ন বিবশ করে দিয়েছে। যেমন ছিল

তার গানের গলা, তেমনি ছিল তার ক্ষুরধার বুদ্ধি। এইজন্যে পেশোবা বালাজী বাজীরাওয়ের মন্ত্রী এবং সর্বজনপ্রিয় মারাঠী নেতা নানা ফড়নবীশ তাকে স্নেহ করতেন। জটিল রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও পরামর্শ করতেন মাঝে মাঝে। বাজীরাও-এর পরবর্তী পেশোবা স্বৈরাচারী ও অপদার্থ রঘুনাথ রাওকে সিংহাসনচ্যুত করার ব্যাপক ষড়যন্ত্রেও সক্রিয় সাহায্য করেছিল। মন্ত্রীজীর মত প্রতাপশালী মানুষের স্নেহধন্যা বুদ্ধিদীপ্ত এবং পুনার অভিজাত উঁচুমহলের কমলাবাইজী তার মত একটা অতি সাধারণ আর নগন্য তবলচির ভেতরে কি পেয়েছিল—কে জানে!

মতিবাঈ যে তারই ভালবাসার ভুল অঙ্ক ফল!

এই ঘটনার দুইদিন পরেই বয়জেন গেল আগ্রায়। একটা বড় কনসাইনমেণ্ট স্পেনে পাঠাতে হবে। যাওয়ার সময় মতিবাঈকে বলে গেল, এক সপ্তাহের ভেতরেই ফিরবো—

দেখ, একদিনও দেরী করো না কিন্তু, কেমন ভয়ে ভয়ে বয়জেনের হাস্যোচ্ছল মুখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, তুমি তো সবই জানো—

ডোণ্ট ওরি ডার্লিং—বলেই তার দুইগালে সশব্দে দুটো চুমু দিয়ে ফীটনে উঠে বসেছিল বয়জেন।

সেই যে গেল আর ফিরল না। ফেরা হলো না বয়জেনের। আগ্রায় পা দিয়েই শুনল তার দেশে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছে। বিদ্রোহীরা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে দুর্ভেদ্য বাস্তিল দুর্গ। সম্রাট ষোড়শ লুই আর রাণী মারী আঁতোআনেৎকে জেলে পুরে রেখেছে। বিপ্লবীরা বড় বড় জমিদার আর অভিজাতদের ধরে ধরে গিলোটিনে মাথা কাটছে। সারা দেশজুড়ে রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে। তার দেশের ব্যবসাদারের কাছে এই দুঃসংবাদ শুনেই মনের ভেতরে ভেসে উঠল—তার মা-র অসহায় আর বিপন্ন মুখখানা।

সেইদিনই দেশে পাড়ি দিল বয়জেন। কে জানে ইণ্ডিয়ার মাটি ছেড়ে যাওয়ার সময় তার মনের ভেতরে মতিবাঈ-সের মুখখানা একবারও উঁকি দিয়েছিল কি না আর দিলেও, তুচ্ছ একটা 'নেটিভ' মেয়েকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার মত মনের অবস্থা তার ছিল না!

মতিবাঈ নিজেই দেশপাণ্ডেকে সঙ্গে করে আগ্রায় এল। আর সেখানকার নীলকর সাহেবদের কাছে যেই শুনল, বয়জেন দেশে চলে গিয়েছে। অমনি—

না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল না। এমন কি তার দেহের ভেতরে যে নতুন

সম্ভাবনার ইশারা পাওয়া যাচ্ছে—সেজন্য আশঙ্কিত পর্যন্ত হলো না। আর পাঁচটা মেয়ের মত। বরং বয়জেনের প্রেমের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষরের আসন্ন আবির্ভাব যেন তার মনে প্রেরণা যোগালো।

আগ্রার রাজপথে দাঁড়িয়ে শান্তগলায় বলল দেশপাণ্ডেকে—পিতাজী আমাকে দেশে নিয়ে চলুন—

দেশ ? পুণা ! তুই বলিস কি বেটী, ওই কলঙ্কের কাঁটা—

দেশপাণ্ডেজী কি বলছে, কাকে বলছে কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছে না মতিবাঈ। তার মনে ভেসে উঠল গম্ভীর আর কঠোর একটা মুখের ছবি। তার কপালে রক্তচন্দনের তিলক। মাথায় গৈরিক পাগড়ী। কানে কর্ণবলী !

নানা ফডনবীশ ! দুর্দ্ধর্ষ মারাঠী নেতা। ইংরেজ-ফরাসী সাহেবদের জন্ম শত্রু। তার মাকে চিনতেন। তাকে স্নেহও করতেন খুব এসব কথা সে তার মার কাছে শুনেছে। ছোটকালে পুণায় দেখেওছে হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে নানা ফড়নবীশের অশ্বারোহী মূর্তি।

কিন্তু তার মনের বাসনাটা খোলাখুলি দেশপাণ্ডেকে বলতেই সে বলল, তুই কি খেপেছিস বেটী—মন্ত্রীজী কি আমাদের চিনতে পারবে ?

বয়জেনের বদলা নিতে হলে আমাকে একবার মন্ত্রীজীর সঙ্গে দেখা করতেই হবে পিতাজী—

দেশপাণ্ডে দেখল, মতির চোখদুটো দুটুকরো আগুনের মত জ্বলছে।

মতিবাঈয়ের পীড়াপিড়ীতে শেষ পর্যন্ত দেশপাণ্ডে তাকে নিয়ে এল পুণায়। কিন্তু কোন লাভ হল না। সেখানে গিয়ে দেখল, শহরে দারুণ উত্তেজনা। ইংরেজদের সঙ্গে যে কোন সময় যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। সারা শহর থমথম করছে। নানা ফডনবীশ চলে গিয়েছেন দাক্ষিণাত্যে। উদ্দেশ্য সেখানে অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটা প্রবল শক্তি গড়ে তোলা ! পুণা শুধু নয়, সমগ্র মহারাষ্ট্রে চলেছে যুদ্ধের প্রস্তুতি। মতিবাঈয়ের কিন্তু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে নানা ফড়নবীশের কুঠীরের অদূরে একটা খোলার ঘরে রাত কাটায়। ভাল করে খায় না। ঘুমায় না। চেহারা হয়ে গেল কালিমাড়া।

তুই যে মরে যাবি বেটী—যা হোক কিছু মুখে দে—

দেশপাণ্ডে অনুনয় করে বলে। তার কথা যেন শুনতেই পেল না মতিবাঈ। বলল, মন্ত্রীজী এলে আপনি আমার লেখা আর্জীটা তাঁকে একবার যেমন করে হোক দেখাতে পারবেন তো ?

দেশপাণ্ডে কথা বলে না। দুরুদুরু কাঁপে বুক। কত বড় মানুষ। সারা দেশের ভবিষ্যতের চিন্তা তার মাথার ভেতরে। তাঁকে এসব নোংরা কথা—তুচ্ছ কথা—কিন্তু খুপুরির মত ছোট অন্ধকার ঘরের কোণে মতির সেই শুকনো কালিমাড়া চেহারাটার দিকে তাকিয়ে তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। মেয়েটা মরেই যাবে। যত কঠিন হোক। করতেই হবে কাজটা। একদিন—

একদিন বেজে উঠল কাড়ানাকাড়া। পুণা শহরের দিকে দিকে জয়ধ্বনি শোনা গেল নানা ফড়নবীশ কি জয়। দর্শনার্থী এবং প্রিয় অনুচরদের ভীড় ঠেলে দেশপাণ্ডে দরখাস্তটা নানা ফড়নবীশের হাতে দিল। সেদিকে চোখ বুলিয়ে বলল, কে এই মতিবাঈজী?

ওই যে হুজুর বালাজী বাজীরাও এর দরবারে গান গাইতো কমলাবাঈজী—

কমলাবাঈজী—প্রত্যেকটি অক্ষর অস্ফুট স্বরে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে যেন পুরানো দিনের কথা মনে করতে চেষ্টা করল নানা ফড়নবীশ। কিন্তু হঠাৎ হয়তো মনে করতে না পেরেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বলল, কিন্তু ওই কুকুরগুলোর সঙ্গে মেলামেশা করেছিল কেন—বিশ্বাস করেছিল কেন? একটু থেমে কঠোর গলায় প্রায় আদেশের মত বলল, কোনও ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের জন্য আমি কিছু করতে পারবো না—

হুজুর কমলাবাঈয়ের মেয়ে—কমলাবাঈজী একদিন আপনাকে—

কমলাকে আমার মনে পড়েছে। সে-ও তো বাঈজী ছিল। সে তো এরকম বোকার মত কাজ করে নি। তার মেয়ে হয়ে সে ওই ম্লেচ্ছকে বিশ্বাস করতে গেল কেন--

আর একটা কথাও বলতে পারল না দেশপাণ্ডে। মুখ কালো করে বেরিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় নানা ফড়নবীশের এক সহকারী তার কানে কানে কি বলতেই তার আবার ডাক পড়ল।

মতিবাঈজী যে সাহেবের সঙ্গে মেলামেশা করতো সে কী ফরাসী?

আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর—

সেই জন্যেই। ইংরেজের বাচ্চা হলে আর এ সব করতো না বলেই তাকে লেখা দিল্লীর মোগল দরবারের স্থায়ী ফরাসী রাজপ্রতিনিধির একটা চিঠির বক্তব্য তাকে বুঝিয়ে বলল—চার্লস দ্য বয়জেন নামে এক সাহেব ফ্রান্স থেকে এদেশের দুটো স্ত্রীলোকের নামে ৮২ (বিরাশী) টাকা করে খোরপোষ দিতে

চায়। রমণী দুইটির একটি থাকে সুরাটে আর একটি লক্ষৌতে। পরের স্ত্রীলোকটি মারাঠী এবং সুরাট আমার এলাকা বলে খোঁজখবর নিয়ে আমাকে জানতে অনুরোধ—

না—না খরপোষ নয়—খরপোষ নয়, মন্ত্রীজী মতি আপনারই স্নেহের কমলাবাঈজীর মেয়ে। সাহেবের সাথে বিলেতে যেতে চায়, ব্যাকুল হযে বলল দেশপাণ্ডে! কযেক মুহূর্ত পরে গলাটা একটু ছোট করে বলল, দেখেছেন তো ওর অবস্থাটা—

হুঁ—হিংস্র একটা বাঘের মত হুম শব্দ করল নানা ফড়নবীশ। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল,তুমি আমার চিঠি আর এই পাঞ্জা নিযে দিল্লীতে ওই সাহেবের সঙ্গে দেখা করো—

এই চিঠির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল। কেননা, এই চিঠিতে মতিবাঈয়ের ইতিবৃত্ত আদ্যপান্ত জানিযে শেষ ছত্রে নানা ফড়নবীশ লিখেছিল—আমার অনুরোধে যদি মতিবাঈজীকে ফ্রান্সে ওই বিশ্বাসঘাতক বযজেনের কাছে না পাঠানো হয, তাহলে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিপন্ন হতে পারে এই সামান্য ঘটনার সূত্রেই—

দিল্লীর ফরাসী প্রতিনিধি এই চিঠি পেযে চিন্তিত হলো। এই অপরিসীম প্রতিপত্তিশালী—মারাঠী জননেতার জন্য ইংরেজরা 'ডেকানে' বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না। মাহে পণ্ডিচেরীতে ইংরেজদের সঙ্গে অনেক লড়াই করে তাদের কলোনী কোনরকমে টিকিযে রেখেছে। এই ইনফ্লুযেনশিযাল লোকটার ডিসপ্লেজার ক্রিযেট করলে তাদের ক্ষতি হতে পারে। অতএব—

অতএব অসম্ভবই সম্ভব হলো। একটা নেটিভ মেযেকে বযজেনের স্ত্রীর মর্যাদার সম্মান দিয়ে ফ্রান্সে পাঠাতে হলো।

এসব—এসব ১৭৯০ সালের কথা।

তারপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। লক্ষৌয়ের মতিবাঈজী ফ্রান্সে যেযে হযে গিয়েছিল মিসেস বেনেট। বয়জেনের মৃত্যুর পরও অনেকদিন বেঁচেছিল সে। আর সেই ছেলেকে প্যারিসের উপকণ্ঠে সাম্রেসে একটি রেষ্টুরেণ্ট করে দিযেছিল যার সাইনবোর্ডে প্রোপ্রাইটারের নামের জায়গায লেখা ছিল—**Count Charles Alexandre Benett De Boigne (Md Ali Bux)**।

একাদশ স্তবক

আঠারো শতকের কলকাতার অভিজাত সাহেব নবাবদের বিলাসের সহচরী ফরাসী সুন্দরী ম্যাডাম গ্রাণ্ড। রাতের অন্ধকারে যার বেডরুমে চলতো ছায়াবাজীর সেই রোমাঞ্চকর লীলা—

শহর কলকাতা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সতের দশকের সেই শহর কলকাতায় যখন কথায় কথায় লাটের বাড়িতে ভোজসভায়, জজের কুঠিতে খানাপিনায় আর ট্যাঙ্ক-স্কোয়ার (ডালহৌসি), লালবাজার কসাইতলা (বেণ্টিক স্ট্রীট) ও বৌবাজার অঞ্চলের ট্যাভার্ণ পাঞ্চহাউসগুলোতে (আধুনিককালের নাইটবারের মত) রাতভোর নাচ-গান হৈ-হল্লার ঢালাও ব্যবস্থায় সাহেবসুবোদের উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া জীবনের উদ্দামতা পরিস্ফুট হয়ে উঠতো; যখন বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস, গভর্ণরজেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এলিজা ইম্পে, জাষ্টিস হাইডের মত অন্যান্য অভিজাত খানদানী সাহেবরাও নেশার ঝোঁকে ডিনার টেবিলে পেলেটিং (pelleting) অর্থাৎ রুটির টুকরো গুলি করে পাকিয়ে পরস্পরের দিকে ছুঁড়ে মেরে উৎকট আনন্দ উপভোগ করতেন, কিম্বা তুচ্ছ কথায় ডুয়েল লড়ে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধাতেন—সেই ইতিহাসবিখ্যাত সম্ভ্রান্ত সাহেবসমাজের মক্ষিরাণী ছিল—

ম্যাডাম গ্রাণ্ড!

দীঘল চেহারা। গায়ে ঝালর দেওয়া মেরুন রঙের সিল্কের ব্লাউজ। পরণে জরির চুমকী বসানো ঢিলেঢালা মাটিতে লুটিয়ে পড়া নীলাভ ভেলভেটের স্কার্ট! ফ্রেঞ্চ হেয়ারপিন দিয়ে আটকানো একমাথা কোঁকড়ানো সোনালী চুল। আর হাসি হাসি দুটো নীলাভ চোখ!

শুধু তার আগুনের মত রূপ নয়। তার হাসিখুসি খোলামেলা সহজ সরল ব্যবহারও কলকাতার বড় বড় সাহেবদের মন চঞ্চল করে তুলতে পারে, হয়তো ওকে নিয়ে কোন জাঁদরেল কর্তাব্যক্তির সঙ্গে অশান্তি হতে হতে শেষপর্যন্ত 'ডুয়েল' মত একটা খুনোখুনি ব্যাপারও হয়ে যেতে পারে—এসব ভেবেই কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারী জর্জ ফ্রান্সিস গ্রাণ্ড তাঁকে ফ্রান্স থেকে বিয়ে করে এনে তুলেছিল গার্ডেনরীচের চারিদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা প্রকাণ্ড বাড়িতে।

বাড়িটার কয়েকগজ দূরেই গঙ্গার জল পুরানো ফোর্ট উইলিয়ম আর কত বড় বড় প্রাসাদের ছায়া বুকে নিয়ে দোল খাচ্ছে। দূরে—বহুদূরে নদীর এখানে সেখানে নোঙর করা জাহাজ আর নৌকাগুলো ঢেউয়ের তালে তালে ডাইনে বাঁয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছে—

সেই মনোরম পরিবেশে সুন্দর সাজানো গোছান বাড়িটা খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল ম্যাডাম গ্রাণ্ডের। ছেলেমানুষের মত খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে কখনো দূরে একটা ধু ধু ফাঁকা মাঠের প্রান্তে কয়েকটা পাকা বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বলে, ওই জায়গাটার কি নাম?

ও মাই গড! ওই তো হলো চৌরঙ্গী। আমাদের কোম্পানীর বিজনেস সেণ্টার—ডার্লিং—

আর ওই যে দুইদিকে লম্বা হাতল লাগানো একটা বিশাল কাঠের বাক্স বয়ে নিয়ে যেতে যেতে নেটিভগুলো গোঙ্গাচ্ছে—

হো হো করে হেসে ওঠে ফ্রান্সিস। হাসির রেশ টেনে বলে, ওটা বাক্স নয় —পালকী—পালকী—এদেশে ওতে চড়েই আমাদের এখানে সেখানে যেতে হয়, একটু থামে সে। আবার ফরাসী সুন্দরীর কেমন বিহ্বল মুখখানার দিকে তাকিয়ে বলে যারা পালকী বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা মোটেই গোঙ্গাচ্ছে না—

তাহলে?

ওরা সর্দার বেয়ারার সঙ্গে সুর মিলিয়ে মিলিয়ে চলার মন্ত্রের মত ধ্বনি উচ্চারণ করছে—

কি রকম?

সামনে মাঠ, হৈ আরে; মাঠ রে ভাই, হৈ আরে, ওই যে গ্রাম, হৈ আরে খাল পেরুবি, হৈ আরে—ফ্রান্সিসের হাত নেড়ে নেড়ে বলার ভঙ্গীতে হাত-তালি দিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে ম্যাডাম গ্রাণ্ড। সুন্দরী বৌকে খুশি করতে পেরেছে দেখে ফ্রান্সিসও মনের আনন্দে হো হো করে হেসে ওঠে।

আর—

সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল একটা অদ্ভুত কাণ্ড। সেই প্রথম জেলখানার মত উঁচু প্রাচীর ঘেরা নিঝুম বাড়িতে গোমড়ামুখো সাহেব আর নতুন মেমের সম্মিলিত কণ্ঠের হাসি শুনে ছুটে এল খানসামা মনুহু। তার পিছু পিছু গুটি গুটি এসে দাঁড়ালো প্রায় জন কুড়ি নেটিভ।

এরা কারা?

ও ডার্লিং—তুমি তো সবে দুদিন হলো এসেছো। তোমাকে বলা হয়নি, এরা তোমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তোমারই ফাইফরমায়েস্ক খাটবে—মানে সার্ভেন্ট আর কি—

এতগুলো সার্ভেন্ট দিয়ে কি হবে?

মনুয়া বুঝিয়ে দাও তো তোমার নতুন মেমসাহেবকে কার কি কাজ—

শুনুন মেমসাহেব, এই তিনজন হলো খিদমৎগার, এই একজন পাচক, এ হলো হুকোবরদার, বলতে বলতে মনুয়া তাদের একে একে মেমসাহেবের সামনে দাঁড় করিয়ে বলতে লাগল, সর্দার বেয়ারা ভিস্তিওয়ালা, দরজি, ধোপা পালকী বেয়ারা, কোচয়ান মুর্গিওয়ালা ইত্যাদি প্রত্যেকের পরিচয়।

বাব্বা! তুমি দেখছি লর্ডের মত এদেশে বাস করছো—

এদেশে সার্ভেন্টের সংখ্যার ওপরে যে ডিপেণ্ড করে আমাদের সোশ্যাল স্ট্যাটাস ডার্লিং—

দামী আসবাবে সাজানো-গোছানো সেই বাড়িতে অসংখ্য দাসদাসী পরিবৃত হয়ে ম্যাডাম গ্রাণ্ড রাণীর মত জীবন কাটাতে লাগল। ভোরে ফোর্ট উইলিয়ম থেকে কামান দাগার শব্দে তার ঘুম ভাঙ্গত। জর্জ তার অনেক আগেই আরবী ঘোড়ায় চেপে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে বেরিয়ে যেত। সে অলস পায়ে উঠে এসে কখনো জানালায় দাঁড়িয়ে দূরে ভোরের কুয়াশাঘেরা গঙ্গার শোভা দেখত—আবার কোনদিন যদি খেয়াল হতো ধীর পায়ে আসত ডাইনিংহলের দিকে। দেখতো কুক-বাবুর্চি আর খিদমৎগাররা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে টেবিলে দামী দামী সিলভার আর চায়না প্লেটে ব্রেকফাস্ট সাজাচ্ছে থরে থরে। রুটি মাখন সিদ্ধডিম শুধু নয়—মাছ মাংস ডিমেরকারি তার সঙ্গে কেক টোস্ট ও কফি!

জর্জ এসে পড়তো ঠিক বেলা ন'টার সময়। ব্রেকফাস্ট সেরে কোম্পানীর কাজে ফোর্ট উইলিয়মে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দারোয়ানকে বলতো—এই পথে কোন বাক্সওয়ালা গেলে তাকে মেমসাহেবের কাছে নিয়ে যেও—

দুপুর খাঁ খাঁ করতো। দূর আকাশে দু'একটা চিল উড়তো। আর সাঁ সাঁ বাতাসে ভর করে একটা হাঁক ভেসে আসতো বহুদূর থেকে—কি—লি—প—কাঁটা হেজলিন চায়ে—পমেটম—চা—য়ে—

মেমসাহেব—বাক্সওয়ালা আয়া—দারোয়ানের পিছু পিছু পিঠে বিরাট বোঁচকা বেঁধে বাক্সওয়ালা হাজির হতো আর পুঁটলীর ভেতর থেকে ছোট বড়

ডজনখানেক বাক্স বের করতো। তাদের ডালা খুলতেই নানারকমের হেয়ার-পিন, হেজলিন ইত্যাদি প্রসাধনের টুকিটাকি ঝলমল করতো। ফেরীওয়ালা হেসে ম্যাডাম গ্রাণ্ডকে খুশি করার জন্যে বলতো—মানি নট ওয়ান্ট, মেমসাহেব সে ওন প্রাইস ('money not Want, mem say own price') —বোলচাল দিয়ে গুচ্ছের জিনিস গছিয়ে দাম না নিয়ে চলে যেত বাক্সওয়ালা। মাসান্তে তার বিল এলে জর্জের চোখদুটো কপালে উঠতো।

সন্ধে হতে না হতে আটঘুড়ির ল্যাণ্ডো গাড়িতে ম্যাডাম গ্রাণ্ডকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়তো জর্জ। গাড়ি চলে যেত পুরানো কেল্লা, লালদীঘি হয়ে চৌরঙ্গী ও সুপ্রীমকোর্ট ছাড়িয়ে একেবারে সোজা উত্তরে চিৎপুর রোডে 'ব্ল্যাক-ডেপুটি' জমিদার গোবিন্দরাম মিত্রের মন্দির পর্যন্ত।

গঙ্গার ধারে সেই পুরানো ফোর্ট উইলিয়মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কোম্পানীর শহর কলকাতার বিচিত্র রূপের দিকে তাকিয়ে ম্যাডাম গ্রাণ্ডের চোখদুটো কেমন উৎসুক হয়ে উঠতো। আর অনবরত নানা প্রশ্ন করতো। কিন্তু বাইরে মুখ বাড়িয়ে যেই কিছু বলতে যেত অমনি জর্জ পরম আদরে তাকে জড়িয়ে ধরে ভেতরে টেনে আনতো। বলতো—উঁহু—উঁহু—কখনো মুখ বের করো না ডার্লিং—কে কোথায় থেকে দেখে ফেলবে—

কেন আমি কি সোনাদানা যে সিন্দুকে ভরে রাখবে? এসব কথা ম্যাডামের মুখে আসতো। কিন্তু বলতো না। জর্জের চটচটে কাদার মত গায়ে গায়ে লেপটে থাকা আর তাকে আগলে আগলে রাখার স্বভাবের জন্য তার মনের ভেতরে একটু একটু করে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতো। কিন্তু—

জর্জ ফ্রান্সিস গ্রাণ্ড যা ভয় করছিল তাই হলো। একদিন সন্ধ্যায় তারা মশালের আলোয় উজ্জ্বল লালবাজারের হারমনিক ট্যাভার্ণের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল—

ওহে গ্রাণ্ড—শুনছো, নতুন বিয়ে করে এলে, পাশ দিয়ে দশফুকারের বগি-গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে যেতে চিৎকার করে উঠল অ্যাটর্নী হিকি সাহেব—তা ম্যাডাম নাকি খুবই সুন্দরী। একটা পার্টিও তো দিলে না—বলতে বলতে গ্রাণ্ডের গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল বগি গাড়ি। আর ম্যাডামের প্রতিমার মত সুন্দর সুডৌল মুখখানার দিকে তাকিয়েই হিকি সাহেবের চোখদুটোর দৃষ্টি মুগ্ধ হয়ে গেল। অস্ফুটস্বরে আপনমনেই বিড় বিড় করে বলল, মিসেস ওয়ারেন হেস্টিংসের চেয়েও সুন্দরী—কয়েক মুহূর্ত পরেই সজাগ হয়ে বলল, এসো না গ্রাণ্ড

হারমনিকে মিসেসকে নিয়ে—আজ খুব ভালো বলনাচের আয়োজন হয়েছে—

না—না—মিঃ হিকি, সন্ত্রস্ত হয়ে বলে উঠল গ্রাণ্ড। ওর শরীরটা মোটেই ভালো নেই, বলে একরকম পালিয়ে যাওয়ার মতই দ্রুত চলে গেল গ্রাণ্ড।

যেতে যেতে ম্যাডাম গ্রাণ্ড বলল, হিকিসাহেব এদেশে কি করেন ?

আরে দূর দূর ওর কথা আর বলো না—বেহেড মাতাল। জমাদারনী নামে একটা সুন্দরী নেটিভ মেয়েকে নিয়ে থাকে—লোকটার মর‍্যালিটি বলতে কিছু নেই—ঘৃণায় মুখ বিকৃত হয়ে উঠল কোম্পানীর হোমড়াচোমড়া খানদানী সাহেব জর্জ ফ্রান্সিসের। কিন্তু—

কয়েকগজ যেতে না যেতেই তাদের কানে এল ব্রাউনবেরি পালকীগাড়ির (জনৈক ব্রাউন লো সাহেব বেয়ারাদের পালকী-ধর্মঘটের সময় পালকীতে ঘোড়া যুতে এই গাড়ি চালু করেছিলেন বলেই তার এই নামকরণ হয়েছিল) বিচিত্র পইস্ পইস্ শব্দ। আর তারা শুনতে পেল, তার কোচওয়ানদের উচ্চকিত কণ্ঠস্বর—খবরদার—খবরদার—সামনেওয়ালা ভাগো—

দেখতে দেখতে ব্রাউনবেরি জর্জের ল্যাণ্ডোকে ধরে ফেলল। আরে মিঃ জর্জ যে! ব্রাউনবেরির আরোহী খাপখোলা তলোয়ারের মত ঝকঝকে চেহারার এক সুদর্শন যুবক বলল, ভর সন্ধে বেলা বাড়ি ফিরছেন কেন? ম্যাডাম গ্রাণ্ডের দিকে নজর পড়তেই তার মনে হলো, যেন বিদ্যুতের আলোর হঠাৎ ঝলকানিতে তার চোখদুটো ধাঁধিয়ে গেল। কয়েকটা ঢোক গিলে থতমত খেয়ে বলল, গুড ইভিনিং মিসেস গ্রাণ্ড—কয়েকমুহূর্ত পরেই নিজেকে সংযত করে জর্জকে বলল, ব্রিটানিয়া জাহাজের ডিনার পার্টিতে যাচ্ছেন না? ইনভিটেশন পান নি?

অপরাধীর মত মাথা নীচু করে রইল জর্জ। আজ সকালেই খোদ গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংসের স্বাক্ষরিত নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছে। কিন্তু চেপে গিয়েছে ম্যাডামের কাছে। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে সেই যুবক গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস তাকে বিশদ বুঝিয়ে বলতে, শুরু করল ওই যে আমাদের কোম্পানীরই জাহাজ ব্রিটানিয়া তাকে রণপোতে কনভার্ট করে হেষ্টিংসসাহেবের উদ্যোগে পণ্ডিচেরীতে ফরাসীদের সঙ্গে লড়াইতে পাঠানো হচ্ছে না—মাদ্রাজ রওনা হওয়ার আগে তার 'কমোডোর' রিচার্ডসন যে ডিনারপার্টি—

আমি জানি স্যার, ইনভিটেশান লেটার পেয়েছি স্যার—কোম্পানীর কর্তা-ব্যক্তিদের একজন এবং প্রতিপত্তিশালী ফিলিপকে মিথ্যা বলল না। বলতে

পারল না গ্রাণ্ড। ফিলিপ উৎসাহিত হযে বলল, তাহলে চলুন—চলুন—মিসেসকে নিয়েই চলুন—

দুটো গাড়িই চলল ডকের দিকে। যেতে যেতে জর্জের ধরাপড়া চোরের মত মুখের দিকে তাকিযে মিটি মিটি হাসিতে ম্যাডামের চোখদুটো জোনাকীর মত জলতে লাগল। ঘোড়ার খুরের একটানা খটখট শব্দকে ছাপিযে ফিলিপ চেঁচিযে বলল, মিঃ গ্রাণ্ড, শুনেছি আপনার স্ত্রী ফরাসী দেশের মেযে—তা এত 'সাই' কেন? পার্টি-টার্টিতে যেতে—

না-না-সা।র—জর্জ এসব পছন্দ করে না—গলাচড়িযে বলল ম্যাডাম গ্রাণ্ড।

কোন কথা বলল না জর্জ। শুধু খরচোখে একবার স্ত্রীর হাস্যপ্রদীপ্ত মুখখানার দিকে তাকালো। আর বাইরের সমস্ত অন্ধকারই যেন চেপে নেমে এল তার মুখে।

অজস্র রঙীন বাতি দিযে সাজানো ব্রিটানিযা আলোকজ্জ্বল বিশাল একটা রাজপুরীর মত ভাসছে গঙ্গার বুকে। বাজছে ড্রাম। বাজছে বিউগিল। সামরিক বাজনার সেই ঐকতানের সুর বাতাসের সওযার হযে ভেসে চলেছে দূরে—বহুদূরে। ডক থেকে ল্যাডার দিযে তারা জাহাজে যেই উঠে এল আর লোকগমগম আলোঝলমল কেবিনে এসে দাঁড়ালো, অমনি চারিদিক থেকে চাপা গুঞ্জন উঠল—রিযেলি এ বিউটি!—অ্যাঞ্জেল—অ্যাঞ্জেল—

লেডী চেম্বার্স, লেডী ওযারেন হেষ্টিংসের মত ডাকসাইটে সুন্দরীরা পর্যন্ত ম্যাঁডাম গ্রাণ্ডের অপরিসীম সৌন্দর্যের দিকে মুগ্ধ বিস্মযে তাকিযে রইল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে হিংসায জলে পুড়ে যেয়ে তাকে অবহেলা করার জন্যই যেন আভিজাত্য আর অহমিকার দুর্গের ভেতরে নিজেদের বন্দী করে রাখল। কিন্তু—

পুরুষদের ভেতরে গম্ভীরস্বভাবের জাষ্টিস হাইড, জাষ্টিস এলিজা ইম্পে ছাড়া আর সকলে এসে এসে গাযে পড়ে নিজেরাই নিজেদের পরিচয় দিযে ম্যাডাম গ্রাণ্ডকে অভিবাদন জানালো। 'বেঙ্গল গেজেট' কাগজের সম্পাদক আধপাগলা জেমস হিকি তো টেবিল চাপড়ে চিৎকার করে বলেই ফেলল—এই-জন্যেই জর্জ ফ্রান্সিস গ্রাণ্ড সাহেবকে বাড়ির বাইরে বড় একটা দেখা যায় না—সকলে হো হো করে হেসে উঠল। আর সেই উচ্চকিত হাসির শব্দটা যেন জর্জের মাথার ভেতরে সূঁচের মত বিঁধতে লাগল।

শুরু হলো খানাপিনা। সেই সঙ্গে চলল মদ্যপান। এক একজনের কণ্ঠনালী দিযে অবিরল ধারায় শ্যাম্পেন আর ক্ল্যারেটের স্রোত বযে যেতে

লাগল। যখন এক একজন টলছে তখন শুরু হলো বলনাচ। লুব্ধ আর মত্ত সরীসৃপের মত এক একটা হাত এগিয়ে চলল সুন্দরী ম্যাডাম গ্রাণ্ডের দিকে। আর শোনা গেল তাদের নেশাজড়ানো বিকৃত আর ব্যাকুল কণ্ঠস্বর—কাম অন ম্যাডাম গ্রাণ্ড—আসুন আমার সঙ্গে নাচবেন—

প্লীজ—ওকে রেহাই দিন আপনারা—ওর শরীরটা—

. জর্জের ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠস্বরটা ডুবে গেল ফ্রান্সিস ফিলিপের উঁচুগলার উচ্ছ্বসিত হাসিতে। হাসতে হাসতেই যেই সে ম্যাডামের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল অমনি জর্জের মুখের দিকে একবারও না তাকিয়ে মিসেস গ্রাণ্ড ফিলিপের কণ্ঠলগ্না হয়ে উদ্দাম বেগে নাচতে শুরু করল। করুণ চোখে জর্জ লক্ষ্য করল, তার স্ত্রীর নরম দুটো কাঁধের পেশীর ভেতরে ফিলিপের লোভী হাতদুটো যেন সাঁড়াশীর মত চেপে বসল। নাচের তালে তালে-ওর উদ্ধত স্তনদুটো থেকে থেকে ওই শয়তানটার বুকে ঠেকে যাচ্ছে। আর স্কাউণ্ড্রেলটা নেশার ঝোঁকে আর সেই সুখস্পর্শে চোখদুটো বুঁজে নেচে চলেছে।

আর—আর পারল না জর্জ। অস্থির পায়ে বেরিয়ে গেল ডেকে। দূরে অতিকায় ঘাতকের মত গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, যে বহুমূল্য সম্পদ সে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিল তার সন্ধান লোভী তস্করেরা পেয়ে গিয়েছে। অসম্ভব!—আর সে রক্ষা করতে পারবে না—তাকে—কিছুতেই পারবে না—

বাইরে থেকেই তার কানে এল ফিলিপের পরে কে তার স্ত্রীর জুড়ি হয়ে নাচবে তাই নিয়ে ছোকরা নিমন্ত্রিতদের গুঞ্জন—

ক্যাপ্টেন থর্ণহিল। মিঃ ফ্রান্সিসের পরে আমি পেযার—

স্ট্যাফোর্ড প্লেডেল। না—মিসেস গ্রাণ্ড কথা দিয়েছেন। এরপরে উনি আমার সঙ্গে—

জাস্টিস হাইড প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বললেন, এই ছোকরারা ছেলেমানুষের মত কি ঝগড়া করছো বলো তো—একটু থেমে আদালতে রায় দেওয়ার মত করে গম্ভীর গলায় বললেন, ম্যাডাম গ্রাণ্ডই বলবেন উনি কার সঙ্গে নাচবেন—

সেই শুরু হলো।

ব্রিটানিয়া জাহাজের পার্টির পর থেকে ম্যাডাম গ্রাণ্ডের আগুনের মত রূপ প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল শহর কলকাতার অভিজাত সাহেব সমাজে। ট্যাভার্ণে, কফিহাউসে, হোটেলে, বাড়িতে, পালকীতে, ফিটনে সর্বত্র ফরাসী

সুন্দরীকে নিয়ে আলোচনা যত বেশি মুখর হয়ে উঠল গার্ডেনরীচের সেই উঁচু প'াচীল দিয়ে ঘেরা বাড়ির চারিদিকে পাহারাও তত কড়াকড়ি হলো। জর্জ তার খানসামা মনুহুকে হুকুম দিল তার অনুপস্থিতিতে কোন সাহেব সে যত বড়ই হোক কেউ যেন মেম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে না আসে—

ওদিকে ব্রিটানিয়া জাহাজে ডিনারপার্টির পর থেকে যেন কেমন হয়ে গেল ম্যাডাম গ্রাণ্ড! দীর্ঘকাল শ্বাসরোধী একটা অন্ধকার কারাগারে থাকতে থাকতে অফুরন্ত আলো বাতাসে ভরা অবারিত পৃথিবীর অস্তিত্ব জানতে পারলে যেমন হয় আর কি! ফিলিপ, থর্ণহিল টিরেটা, প্লেডেল আরও কত সুবেশ সুন্দর সুপুরুষদের কবোষ্ণ সান্নিধ্যে বলনাচের সেই রাত্রিটা তার যেন কোন সুদূর মিষ্টি স্বপ্নের মত মনে হয় আর তার বুকের ভেতরে দাঁড়িয়ে যেন 'তারাই অহরহো আমন্ত্রণের হাতছানি দেয়।

তারা দু'একবার যে তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেনি এমন নয়, কিন্তু সে জানে, জর্জ তাদের কোন না কোন অজুহাতে গেট থেকে ধুলো পায়েই ফিরিয়ে দিয়েছে। লোকটা ভেবেছে কি, তাকে কি সারাজীবন নজরবন্দী করে রাখবে।

একদিন বারুদের স্তূপে আগুন লাগল। জর্জ দুপুরে লাঞ্চ খেয়ে কাজে বেরুবে এমন সময় ম্যাডাম গ্রাণ্ড বলল, আজ আমি দুপুরে একটু বেরুবো—

কেন—কেন—কোথায়?

তোমার কোন ভয় নেই, আমি লেডী হাইডের বাড়িতে—

না—না—ডার্লিং—কোন ডুবন্ত মানুষকে যেমন জোর করে আঁকড়ে ধরে আসন্ন সর্বনাশ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে তেমনি করে তাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বলল জর্জ—তুমি একা একা কোথাও যেও না। আমি যে তোমাকে—তোমাকে আজ ধর্মতলায় কাশীনাথবাবুর বাগান বাড়িতে গেরার্ড সাহেবের আতসবাজী দেখাতে নিয়ে যাবো—

আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না,তাকে সরিয়ে দিয়ে—ক্ষিপ্ত হয়ে বলল ম্যাডাম গ্রাণ্ড, তুমি গাড়ি দেবে কিনা জানতে চাই—

নো—গর্জে উঠল জর্জ—আই সে—নো, বলেই আগুনের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে বেরিয়ে যাওয়ার সময় মেনগেটে তালা লাগিয়ে তার চাবি পকেটে করে নিয়ে গেল।

ঠিক সেই দুপুরেই ঘটে গেল কাণ্ডটা। ম্যাডাম গ্রাণ্ড যখন নির্জন ঘরে

বসে নিঃশব্দে দাবদাহের মত জ্বলে যাচ্ছিল তখন সেই ঘরের ভেতরে একটা শব্দ হলো—ঠক্—

রাস্তার দিকে জানালা দিয়ে মেঝেতে কী একটা পড়ল—

না। ম্যাডাম গ্রাণ্ড কৌতূহলী হলো না। বিস্মিতও হলো না। এইরকম একটা কিছু হবে, হতেই হবে—এটা সে জানতো। আত্মঘাতী হওয়ার জন্য যেমন মানুষ বিষের পাত্র মুখের কাছে তুলে নেয় ঠিক তেমনি করে পুরানো বেঙ্গল গেজেট কাগজে মোড়ানো ছোট সুদৃশ্য মেহগিনি কাঠের তৈরী একটা ছোট কাসকেড বাক্সটা তুলে নিল। আর সেটা খুলতেই দেখল একটা চিঠি! চিঠি পড়েই অনাস্বাদিত একটা সুখের শিহরণ যেন বয়ে গেল তার মেরুদণ্ড বেয়ে। আর তীব্র উত্তেজনায়, আশঙ্কায় তার বুকের ভেতরে যেন খট-খট-খট শব্দ তুলে চলতে লাগল দশফুকারের ক্রুহ্যাম গাড়ি!

ঝাঁ ঝাঁ করছে নিশিরাত। অন্ধকারে একটা ভোঁতা ছুরির মত ঝিকমিক করছে গঙ্গার জল। কালো পোষাক পরে অন্ধকারের সঙ্গে নিজেকে মিশিযে গাডেনরীচের সেই বাড়ির পিছনে উঁচু প্রাচীরের সামনে এসে দাঁড়ালো এক ছায়ামূর্তি। তার কাঁধে মই। মই বেয়ে পাঁচিল টপকে সে ভেতরে এল। সোজা চলে এল সে সেই ঘরে যেখানে তার চিঠির সঙ্কেত অনুযায়ী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল ম্যাডাম গ্রাণ্ড। নিঃশব্দে ম্যাডামের গালে একটা চুমু এঁকে দিযে ফিসফিস করে বলল,তোমার হাজব্যাণ্ডের ঘর বাইরে থেকে আটকে—

ডোণ্ট ওরি—ডার্লিং—সে ড্রিঙ্ক করে বেহুঁস হয়ে ঘুমুচ্ছে—তার গালে আদর করে একটা টোকা দিযে বলল, এই বুদ্ধিটা আরও আগে—কেন

ম্যাডামের কথা শোনার সময় নেই তার। তার মাথার ভেতরে যেন আগুনের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সে দ্রুত হাতে তাকে আনড্রেস করতে লাগল। খুলে ফেলল ব্লাউজ, খুলল কাঁচুলী, অনাবৃত বক্ষোদেশের অপরূপ সৌন্দর্য তার স্নায়ুকে মাতাল করে তুলল। তারপরেই কশাই যেমন ছাল ছাড়ায়, তেমনি করে টেনে খুলে ফেলল স্কার্ট! সেই অন্ধকার ঘরে তার সম্পূর্ণ নিরাভরণ দেহরেখা স্থির বিজুরীর মত ঝিকমিক করতে লাগল। তারপরেই তাকে বুকের ভেতরে জাপটে উদভ্রান্ত আর মত্ত একটা মানুষের মত বিড়বিড় করে বলল, ক্যাপ্টেন থর্ণহিল নাউ লাই ডাউন—ডার্লিং—প্লীজ—ল-ই ডাউন—

বাইরে নিশীত রাত্রির আকাশ থেকে একটা উল্কা ঝরে অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল।

শুধু একদিন নয়। রাত গভীর হলেই গার্ডেনরীচের সেই বাড়ির উঁচু প্রাচীরের আড়ালে ছায়াবাজীর খেলা শুরু হয়ে যায়। আর ক্যাপ্টেন থর্ণহিল উদার মনের মানুষ। তাই তার খুব ইন্টিমেট ফ্রেণ্ডসার্কেলের কেউ কেউ পালা করে আসে। একদিন আসে থর্ণহিল তো তার পরের রাত্রির নাগর হয়ে আসে স্ট্যাফোর্ড প্লেডেল কি মেজর চার্লস মারস্যাক!

এই অস্বাভাবিক ও দুঃসাহসিক যৌথ অভিসারলীলা সম্ভব হয়েছিল দুটো কারণে। প্রথমতঃ বাড়িটার পজিশান। এই চকমিলানো বাড়িটার পিছনের উঁচু প্রাচীরের পরেই ঝোপঝাড়, আগাছায় ভরা একটা সরু রাস্তা। দিনের বেলাতেও বড় একটা কেউ যায় না সেদিকে। তখনকার কলকাতায় রাত্রে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা কল্পনাই করা যায় না। তারপরেই গঙ্গা! আর দ্বিতীয়তঃ সেই বারোবাসরের নায়িকার মনের গঠন। ফরাসী মেয়ে। তার রক্তের ভিতরে ছিল ইট ড্রিঙ্ক অ্যাণ্ড বী মেরীর অর্থাৎ জীবনটাকে উদ্দামভাবে উপভোগ করার সহজাত বাসনা! কে জানে, ভারতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী যাদের সাহেবনবাব বলা হতো তাদের নারী সুরা বিলাসের সেই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কথা জানতো বলেই জর্জকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু এসে পড়েছিল বিধিনিষেধের এক কারাগারের ভেতরে। আর রূপের মত বিরাট একটা ঐশ্বর্য যার যৌবনের মূলধন সে সুযোগ পেলেই দেউলিয়া হবেই। কিন্তু তাতে আরও ইন্ধন জুগিয়েছিল জর্জের কড়াকড়ি।

কিন্তু থর্ণহিল, প্লেডের মারস্যাক যত নাগরই তার রাত্রির গোপন বারো-বাসরে আসুক না কেন বিশেষ একজনের সেই অ্যাপোলোর মত ধারালো সুন্দর মুখের ছবি তার মনের ভেতরে থেকে উঁকি দিয়ে যায়। কিন্তু থর্ণহিলদের বলতে পারে না তার কথা। যদি কিছু ভাবে! তার মনে হয়, সে এদের মত মই বেয়ে পাঁচীল টপকে আসতে পারে না কেন? তবে বেশ বুঝতে পারে, কোন না কোন চেষ্টা সে করছে নিশ্চয়ই।

অবশেষে ম্যাডামের বহু আকাঙ্খিত সেই প্রণয়ীর আগমন সঙ্কেত এল। সেই সঙ্কেত না এলে রাত্রির অন্ধকারে সেই ছায়াবাজীর লীলার কাহিনী অন্ধকারেই থেকে যেত। তাহলে আর ম্যাডাম গ্রাণ্ড অষ্টাদশ শতাব্দীর সাতের দশকের কলকাতার সাহেব নবাবদের ভোগবিলাসের সহচরী হিসেবে ইতিহাসের পাতাগুলোকে কলঙ্কিত করতো না। রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে সম্ভ্রান্ত এক ইংরেজ পরিবারের চার দেওয়ালের ভেতরের সেই গোপন নারকীয়

ব্যভিচার কেমন করে ইতিহাস হয়ে গেল, আর সে-ই কেচ্ছা কেমন করে সুপ্রীম কোর্টের মামলার নথিভুক্ত হয়ে গেল জানতে হলে যেতে হবে— আবার যেতে হবে দিনের আলোয় গঙ্গার ধারে গার্ডেনরীচের সেই জেল-খানার মত বাড়িতে—

রাত্রে যা-ই হোক। বলাবাহুল্য দিনে সেখানে চলে খুব সুখী আর সম্পন্ন দুটো স্বামী-স্ত্রীর ভাবে ভালবাসায় ভরা জীবনের নিখুঁত অভিনয়! পুরানো কেল্লার কামানের শব্দে ম্যাডামগ্রাণ্ডের ঘুম ভাঙ্গে। জর্জ প্রাতঃ ভ্রমণ থেকে ফিরে এলে দু'জনে ঘনিষ্ঠ হয়ে পাশাপাশি বসে টুকরো টুকরো কথা বলতে বলতে ব্রেকফ্রাষ্ট খায়। লক্ষ্মী প্রতিমার মত যেমন সুন্দরী তেমনি শান্ত তার সুবাধ্য স্ত্রী। আর ট্যাভার্ণে—কফি হাউসের বলনাচের আসরে কেন যেন যেতে চায় না বলেই জর্জ তাকে শহরের নানা চাঞ্চল্যকর খবর দেয়।

জানো ডার্লিং এদেশে ভালো কাজেও কত বাধা। এই তো দেখ না, কর্ণেল ওয়াটসন খিদিরপুরে ডক তৈরি করবে বলে জমি দখল করেছিল—

তারপরে—

তারপরে আর কি জমির মালিক গোকুল ঘোষাল মামলা করে দিয়েছে সুপ্রীমকোর্টে—

মন দিয়ে শোনে ম্যাডাম গ্রাণ্ড। তারও কিছু বলা দরকার বলেই বলে, তুমি যে মহারাজ নন্দকুমার—না—কার একটা কেসের কথা একদিন বলছিলে—

ওঃ মাই গড! দুহাতে খেতে খেতেই বুকে ক্রুশ চিহ্নের মুদ্রা করে জর্জ চোখ বুঁজে বলল, অ্যামেন! তোমাকে বলি নি ডার্লিং তার ফাঁসীর হুকুম হয়ে গিয়েছে—

যত গল্পই করুক ব্রেকফাষ্টের পর কাজে বেরিয়ে যাওয়ার সময় জর্জ কিন্তু দারোয়ানকে বাক্সওয়ালা ডেকে দেওয়ার কথা বলতে ভুলতো না।

ঠিক ভরদুপুরে সেদিনও 'মানি নট ওয়াণ্ট'—মেম সে ওন প্রাইস—হাঁক দিয়ে বাক্সওয়ালা এসে দাঁড়ালো। দারোয়ান তাকে ডেকে মেমসাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিল। রোজ যেমন দেয়। কিন্তু—

পাঙ্খাওয়ালার নজরে পড়ল, সে বরাবরই মেমসাহেবের বেডরুমের বারান্দা পর্যন্ত যায় বটে; কখনো তাকে ঘরের ভেতরে যেতে দেয় না। কিন্তু এই বাক্সওয়ালাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে যেয়ে দরজা বন্ধ করল কেন মেমসাহেব। তার কানে এল চাপাস্বরে ফিসফিস কথা। সে খবর দিল খিদমৎগারদের,

খিদমৎগারেরা জানালো সর্দার বেয়ারাকে, সর্দার বেয়ারা ডেকে নিয়ে এল খানসামা মনুহুকে ! তারা সলাপরামর্শ করে ঠিক করল, মেমসাহেবকে তাদের কিছু বলা শোভা পায়না ; আর কাজ থেকে সাহেবের ফিরে আসার সময়ও হয়ে এসেছে, অতএব তখন তিনি এলে যা হওয়ার হবে—কিন্তু—

জর্জ ফিরে আসার আগেই বাক্সওয়ালা তার বোঁচকা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তীক্ষ্ণচোখে ভৃত্যরা তাকেলক্ষ্য করল,বেশ লম্বা চওড়া। সুপুরুষ চেহারা।

জর্জ কাজ থেকে ফিরে এলে মেমসাহেবের আড়ালে এক ফাঁকে সব বৃত্তান্ত বলল খানসামা মনুহু। শুনেই গম্ভীর হয়ে গেল জর্জ। কিন্তু মনের দুর্ভাবনা চেপে প্রেষ্টিজের জন্যেই নিপুণ অভিনেতার মত বলল, জর্জ তোমরা ভুল দেখেছো—হয়তো মেমসাহেবের ঘরে কোন 'ঘোষ্ট-টোষ্ট' দেখেছো—

পরদিনও দুপুরে বাক্সওয়ালা এল। আর ম্যাডাম গ্রাণ্ডের বেডরুমের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। একটু পরেই খোয়া বিছানো রাস্তায় অসময়ে জর্জের সেই দশফুকারের ল্যাণ্ডোর আওয়াজ বেজে উঠল ! মনুহুরা রুদ্ধশ্বাসে দেখল তাঁদের প্রভু উন্মত্তের মত ঝড়ের বেগে গেল মেমসাহেবের ঘরের দিকে।

খট্—খট্—খট্—সজোরে কড়া নাড়ল। স্পষ্ট শুনতে পেল জর্জ, ভেতরে ছুটোছুটি, দাপাদাপির শব্দ।

কী করছো—দরজা খোলো—গর্জন করতে থাকে জর্জ।

খট্—দরজা খুলল। ঘুমজড়ানো চোখদুটো রগড়ে বলল ম্যাডাম গ্রাণ্ড —কি হয়েছে, বাড়িতে ডাকাত পড়েছে নাকি ?

তাকে ঠেলে ভেতরে এল জর্জ। কোথায় সেই বাক্সওয়ালা আর কোথায়ই বা তার বোঁচকা ! কোথাও তার কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। রাগে ক্ষোভে চিৎকার করে বলল, জর্জ, মনুহু—কোথায় সেই স্কাউণ্ড্রেল বাক্সওয়ালা—

আমরা নিজের চোখে মেমসাহেবের ঘরে ঢুকতে দেখেছি হুজুর—

হঠাৎ জর্জের নজরে পড়ল, গঙ্গার দিকের গরাদহীন জানালাটার দিকে। সেই জানালার কাছে ঝুঁকে নীচে তাকাতেই দেখতে পেল, একটা বোঁচকা পড়ে রয়েছে জঙ্গলের ভেতরে। আর ঘরের ভেতরে তন্নতন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে দেরাজের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বাক্সওয়ালাকেও টেনে বের করে ফেলল জর্জ। একটানে তার হলদে রঙের পাগড়ী, নকল গোঁফ দাড়ি খুলে ফেলতেই ঘরের ভেতরে যেন বাজ পড়ল।

বাক্সওয়ালা আর কেউ নয়, গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য সেই

তরুণ রূপবাণ যুবক ফিলিপ ফ্রান্সিস।

তারপরের ঘটনা আছে বহুল প্রচারিত গ্রন্থে 'Memories of Willam Hickey, 1749-1809'; আছে কেরীর লেখা 'Good old Days of John company'. আর একথাও কারো অজানা নেই যে জর্জ সুপ্রীমকোর্টে মামলা রুজু করেছিল। জাস্টিস হাইড, জাস্টিস রবার্ট চেম্বার্স এবং চীফ জাস্টিস এলিজা ইম্পের মত ধুরন্ধর বিচারকরা ফিলিপকে পঞ্চাশ হাজার সিক্কা টাকা জরিমানাও করেছিল। কিন্তু সেসব বড় কথা নয়—

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, আঠারো শতকের শহর কলকাতার সেই আদিকালে যে ইংরেজ ডক তৈরি করছে, প্রতিষ্ঠা করছে এশিয়াটিক সোসাইটি, হাতুড়ি ছেনি দিয়ে কেটে বাংলার বর্ণমালা তৈরি করছে, তাদের সেই আলোকজ্জ্বল ভূমিকার পাশাপাশি তাদের উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল জীবনের সেই গ্লানিকর অধ্যায়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে নগরশোভনা ফরাসী সুন্দরী ম্যাডাম গ্রাণ্ডের বিচিত্র ইতিবৃত্তের ভেতরে।

দ্বাদশ স্তবক

পাইনবীথি আর পাহাড় দিয়ে ঘেরা সিমলা থেকে উনিশ শতকের কলকাতার চীনা বাজারের 'কেষ্টদত্তের পাঞ্চহাউস' পর্যন্ত চাঞ্চল্য তুলেছিল যে নগরসুন্দরী তার রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত—

লোলা মন্তাজ।

যেমন রূপসী, তেমনি নৃত্যগীতপটিয়সী আর এক শ্বেতাঙ্গিণী নগরসুন্দরী। কিন্তু তার বিচিত্র কাহিনী শুনতে হলে যেতে হবে সেই উনিশশতকের শহর কলকাতায়—যেতে হবে তখনকার দিনের নেটিবদের ব্যবসাকেন্দ্র চীনাবাজারের গলির ভেতরে কেষ্টদত্তের পাঞ্চহাউসে।

কেষ্টদত্ত ওরফে শ্রীকৃষ্ণদত্তের পাঞ্চহাউস। লালবাজারের হারমনিক ট্যাভার্ণ যেমন ছিল কোম্পানীর অভিজাত সাহেবদের এবং কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট ও ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের (ডালহৌসি) মোড়ে ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ কফিহাউস যেমন বিদেশী বণিকদের এবং এদেশী ধনশালী ব্যবসায়ীদের মিলনকেন্দ্র অর্থাৎ ক্লাব বা নাইটবার, তেমনি চীনাবাজারের কেষ্টদত্তের পাঞ্চহাউস ছিল পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ, টঁ্যাস ফিরিঙ্গি, বাঙ্গালী, বিহারী ইত্যাদি পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক জাতের নাবিক, সৈনিক, সাধারণ ব্যবসায়ী প্রভৃতি হল্লাবাজদের আন্তর্জাতিক তীর্থস্থান। শুধু তাই নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভাব বিনিময়ের কেন্দ্রও বলা যায়।

সেদিন কেষ্টদত্তের পাঞ্চহাউসের চারিদিকে ঝাঁপিয়ে নেমে আসছিল সন্ধ্যার অন্ধকার। চীনাবাজারের দোকানে দোকানে কারবাইডের গ্যাসের আলো জ্বলছে। পাঞ্চহাউসের ভেতরে পায়াভাঙ্গা নড়বড়ে কালো কালো টেবিলে টেবিলে শোভা পাচ্ছে কেষ্টদত্তের তৈরি উৎকৃষ্ট পচাই-মদের ভাঁড়। আর তার চারিদিকে কাপ্তেনদের আড্ডা জমে উঠেছে। কলকাতার সেরা সেই পচাই সুরার আকর্ষণ ছাড়াও আরও একটা দুর্বার আকর্ষণে ভীড় এত বেশি হয়েছে যে পাঞ্চহাউসের দরজা বন্ধ করে দিতে হয়েছে।

কৈ দত্তমশাই, কোথায় আপনার মেমসাহেব নর্তকী—খদ্দেরদের মদের রসে ভেজা ভেজা গলায় চিৎকার শোনা গেল। দূরে হলঘরের শেষপ্রান্তে একটা ছোট তক্তপোষের ওপরে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছে মেদবহুল চেহারার কেষ্টদত্ত। সে ফুলো ফুলো গালের ভেতরে একসঙ্গে তিনচারটি পান পুরে দিয়ে

গুজ গুজ করে হেসে বলল, আরে সবুর করুণ মশাইয়েরা—ভালো জিনিস দেখতে হলে একটু ধৈর্য ধরতে হয়।

বলতে বলতেই বেজে উঠল অর্কেস্ট্রা। আর কেষ্টদত্তের গদির সামনে তিনচারটি চৌকির ওপর আধময়লা চাদর বিছানো মঞ্চের ওপরে মরালীর মত ভেসে ভেসে এল খরযৌবনবতী নর্তকী লোলা মস্তাজ। থেমে গেল অধৈর্য খদ্দেরদের গুঞ্জন! মস্তাজের প্রায় নগ্ন দেহের ওপরে স্বচ্ছ আর হাল্কা কমলা রঙের গাউন। বাজনার তালে তালে উদ্দাম বেগে নাচছে সে। তার সোনালী চুলের ঢেউ আছড়ে পড়ছে তার উত্তুঙ্গ বুকের ওপরে। আবার পর মুহূর্তেই সেই ঢেউ যেই সরে যাচ্ছে অমনি বিদ্যুতচমকের মত ঝলসে উঠছে রঙীন কাঁচুলীর আড়ালে সেই দুটো বিচিত্র বিভ্রমের ছবি—

বাহবা—বাহবা—পৈশাচিক উল্লাসে চিৎকার করে উঠল পাঞ্চহাউসের কাষ্টমাররা। তার অপ্রতুল ও অস্বচ্ছ বেশবাসের আড়ালে তার দেহের অনাবৃত যৌবনশ্রী, ওর দ্রুত আন্দোলিত সুপুষ্ট নিতম্বের ছায়াময় লোভানি দেশ-দেশান্তরের নাবিক, সৈনিক, ফাটকাবাজ, বেনিয়া, দালালদের স্নায়ুকে বিকল করে দিল। আর কেমন অভিভুত আচ্ছন্নতা ও নেশার ঘোরে তারা উঠে দাঁড়িযে কেউ ছুঁড়ে দিতে লাগল সিক্কাটাকা, কেউ দিল হাতের আংটি, কেউ দিল গলার হার! মস্তাজের পাযের কাছে বৃষ্টির মত পডতে লাগল মুগ্ধ দর্শকদের প্রীতি উপহার।

মস্তাজের কিন্তু সেইদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সে জানে, ওই মাংসলোলুপ দর্শকদের চোখে আদিম রক্ত তরঙ্গের ভাষা ফুটে উঠেছে। আর এই প্রত্যেকটা উপহারের সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে বিষধর সাপের মত পাকে পাকে জড়ানো রয়েছে ওদের আবিল কামনা। সে মর্মে মর্মে জানে, তার নৃত্যের শিল্পকুশলতার চেযে তার রূপযৌবনের দিকেই ওদের অনেক বেশি আকর্ষণ।

আরে কেষ্টদত্ত একে জোগাড করল কোথায থেকে—খানদানী মেমসাহেব মনে হচ্ছে—

খাস মেম, হারমানিক ট্যাভার্ণ কি স্পেনেসেস হোটেলে না গিয়ে কেষ্টদত্তের পচাইখানায় মরতে আসবে কেন?

খুব উৎসাহী দু'একজন আবার কেষ্টদত্তের কাছে টলতে টলতে যেয়ে জড়িতস্বরে বলল, নাচ শেষ হলে আপনার ড্যান্সারের সঙ্গে একটু আলাপ—

খবরদার, ও কাজটি করতে যাবেন না মশাইরা, একেবারে পয়জেনাস

স্নেক—কুকুরের কান্নার মত অদ্ভুত একটা শব্দ করে হাসল কেষ্টদত্ত। গোল গোল কঁাচের মার্বেলের মত চোখদুটো নাচিয়ে বলল, পার নাইট দুই-দুইশোটি সিক্কাটাকা দিতে হবে,আর কেউ তার সোনার অঙ্গটি স্পর্শ করতে পারবে না—এই দুটো কণ্ডিশানে রাজী করিয়ে তবে এনেছি আমি—

নিশি রাত থম থম করছে। শ্রীকৃষ্ণদত্তের অস্থিচর্মসার দুই ঘোড়ায় টানা কেরাঞ্চি গাড়িতে করে চলেছে নগরশোভনা বারাঙ্গনা লোলামস্তাজ! গাড়ি চলেছে চীনাবাজারের এবড়ো খেবড়ো খোয়াওঠা রাস্তা ছাড়িয়ে কসাইতলা (বেন্টিক স্ট্রীটের) দিকে। মস্তাজের গাড়ির পাশ কাটিয়ে নেটিববাবুদের ল্যাণ্ডো কি ব্রুহাম যাচ্ছে চিৎপুর অঞ্চলে সোনাগাছির অভিমুখে। সে তার ল্যাণ্ডলেডী মিসেস মিডলটনের কাছে শুনেছে, কলকাতার বাবুরা নাকি এই সময় অভিসারে বেরোয়। ঘৃণায় তার মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়! সুখী ও সম্পন্ন সংসারের গিন্নী মিডলটন কি জানে, রাতের অন্ধকারে প্রস্টিটিউটদের বাড়িতে যাওয়ার ভেতরে আর যাই থাক, প্রেম-ভালাবাসা অভিসারের নাম গন্ধ পর্যন্ত নেই! ক্ষুধার্ত মানুষ যেমন গোগ্রাসে আহার করে, তেমনি নেহাতই জৈব-তাগিদে পথে বেরিয়েছে ওরা! তাই মস্তাজের মনে হল—মনে হল, শহর কলকাতা নয়, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য এটা। হিংস্র মাংসাশী পশুরা বেরিয়েছে মাংসের খোঁজে!

পাঞ্চহাউসের কেরাঞ্চি চলছে। ঘোড়ার খুরে খুরে শব্দ বাজছে-খট্-খট্-খট্। হঠাৎ মস্তাজের নজরে পড়ল, চারিদিকের তরল অন্ধকারের ভেতরে আরো এক ছোপ নিকষকালো একটা ছায়ার মতই আর একটা দশফুকারের ব্রুহামই যেন অতি দ্রুত তার কেরাঞ্চি লক্ষ্য করে আসছে। তার মনের ভেতরে ভয় শিউরে উঠল। তাহলে কি সেই দুর্বৃত্ত—সেই মুর্তিমান শয়তানটা যে তার সুখের জীবন বিষাক্ত আর দুর্বিসহ করে দিয়েছিল সে আবার কোন ধূর্ত অভিসন্ধি নিয়ে এই শহরে এসেছে। কিন্তু—সিমলা যে এখান থেকে অনেক—অনেক দূর!

কলকাতা থেকে সিমলা অনেক দূর। কিন্তু সেই সিমলাকে কেন্দ্র করেই সাবেকদিনের দুস্মৃতি তার চেতনার ভেতরে বিষাক্ত একটা ঘায়ের মত দগদগ করে। তার মা পাঞ্জাবের এক নেটিব মেয়ে। বাবা খাস ইংরেজ। সেনা-বিভাগের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী। স্বচ্ছল সংসার। অতএববাবা মায়ের আদরে ভালবাসায় আর সেই পাহাড় ও পাইনবনের ছায়ায় ছায়ায় একটা বল্লুলতার

মতই বড় হয়ে উঠেছিল। সুদূর সেই কৈশোরেই কোন একটা ঘটনায় সে উপলব্ধি করেছিল, মেয়েদের রূপযৌবন, সঙ্গীত এবং নৃত্যকুশলতা অভিশপ্ত কতগুলো সম্পদের মত তাদের জীবনে নিদারুণ সর্বনাশ ডেকে আনে।

গ্রীষ্মের এক নির্জন দুপুরে তরল সোনার মত রোদ যখন পাইনের সবুজ বনদেহে ঝরে ঝরে পড়ছিল তখন সে নিঃশব্দ পায়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আর দূরে একটা পাহাড়ী ঝরণায় চারিদিকের আদিম ও অবারিত পৃথিবীর মতই নিঃসঙ্কোচ এবং নগ্ন হয়ে সে মনের আনন্দে স্নান করেছিল। তার সেই নিরাবরণ তন্বী দেহের ষোল বছরের উদ্দাম যৌবনের সেই অপার্থিব বিচিত্র রূপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার নিজেরই কেমন একটা মুগ্ধ তন্ময়তা নেমেছিল। পাইনবনের মর্মর যেন অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণের মত তার কানের কাছে বলতে লাগল, লোলা তুমি সুন্দরী—ভীষণ সুন্দরী। তার বুকের রক্ত তীব্র উল্লাসের কলধ্বনি বাজতে শুরু করল। আর ঝরণার কলোল্লাস পাইনবীথির বাতাসের ঐকতান নাচে অভ্যস্ত সুঠাম দুটো পায়ে নৃত্যের ছন্দ ফুটিয়ে তুলল। সে নাচছিল- বিজন সেই অরণ্যে, উদার আকাশের নীচে আত্মমগ্ন একটা শিল্পীর মতই বিভোর হয়ে নেচে চলেছিল—

খুট—অদূরে একটা বড় পাথরের আড়ালে একটা সন্দেহজনক শব্দ হতেই সে নাচ থামিয়ে দৌড়ে তার পোষাকটা যেই আনতে গেল অমনি যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল তাদেরই বাড়ির বোকাসোকা রাখাল ছেলেটা। তারই সমবয়সী হবে। যে সাতচড়ে কথা বলে না সেই ছেলে তার পথরোধ করে কাঁপতে কাঁপতে তার পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, দিদি—কি যে সুন্দর তোমাকে লাগছিল, ঠিক বনদেবীর—একটু থেমে শুকনো বেগুনি ঠোঁট দুটো চেটে নিয়ে আবার বলল, যেমন নাচছিলে নাচো না দিদি, এখানে ধারে পাশে কেউ তো কোথাও নেই। আর আমি কাউকে কখনো বলবো না—

তার সেই ভিখারীর মত করুণ আকৃতির সুরে বলার ভঙ্গী দেখে সে হেসে ফেলল। বলল, ঠিক—কাউকে বলবি না তো?

তোমার পা-দুটো ধরেই তো বলছি দিদি—

আবার নাচতে শুরু করল সে। নাচতে নাচতেই হঠাৎ তার নজরে পড়ল, ছেলেটির বিস্ফারিত দুটো চোখ ক্ষুধার্ত বাঘের মত জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে তার দেহের যৌবন চিহ্নগুলোকে যেন লেহন করছে।

যেই সে নাচ থামিয়ে চিৎকার করে উঠল, কি রে, তুই অমন করে—তার

কথা আর শেষ হলোনা। সেই রোগা দুর্বল ছেলেটি মত্ত হস্তীর মত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কঠিন দুটো হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বুকের ভেতরে নিষ্পেষিত করতে লাগল। তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে বলল, শয়তান এই তোর নাচ দেখা—পাজী বদমায়েস—এই বলে কামড়ে ছিঁড়ে আঁচড়ে রক্তারক্তি করে ফেলল। তবুও তাকে নিরস্ত করতে পারল না। পারা যায় না।

পরে তার বহু তিক্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সে জেনেছে কামনামোত্ত পুরুষ হিংস্র সিংহের চেয়েও শক্তিশালী।

বিপুলব্যপ্ত আকাশ দিগন্তপ্রসারী সেই সবুজ পাইনবনের সেই অবারিত প্রকৃতির পটভূমিতে তার অনাবৃত দেহের অপার্থিব রূপ যেমন সেই ছেলেটিকে মুগ্ধ করতে পারেনি, নৃত্যের ছন্দে তরঙ্গায়িত দেহের সৌন্দর্যকে এড়িয়ে যেমন শকুনের মত তার দৃষ্টি পড়েছিল তার দেহের মাংসস্তূপের দিকে তেমনি তার স্বামী জেমস ডুকারেল। সে-ও অমনি সিমলায় এক পার্টিতে তার চেহারা আর নাচ দেখেই মোহিত হয়েই তার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল। ডুকারেল কোম্পানীর রাইটার হয়ে এদেশে এসেছিল। তারপর ধাপে ধাপে প্রোমোশান পেয়ে হয়েছিল শ্রীহট্টের কালেক্টার। গভর্ণর জেনারেল মারকুইস কর্ণওয়ালিশের নির্দেশে কালেক্টারদের কনফারেন্সে বুঝি এসেছিল। ডুকারেল খাস খানদানী ইংরেজ। সেধে একটা ক্রশব্রিড অর্থাৎ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছে। বাবা তো হাতে স্বর্গ পেলেন। হয়ে গেল বিয়ে। ডুকারেল তাকে সোজা নিযে গিযে তুলল জঙ্গল আর পাহাড়ের দেশ শ্রীহট্টে।

প্রথম প্রথম দু'একমাস খুব ভাব-ভালোবাসা। তার মানেই প্রমত্ত নিশিযাপন। আর তার কর্মজীবনের নানা বাহাদুরীর গল্পের ফাঁকে ফাঁকে তার এই দেহটাকে নিযে লোফালুফি। এছাড়া আবার কি?

না—না—পুরুষমানুষ যে ভালবাসতে পারে—তা সে বিশ্বাস করে না।

কিছুদিন পরেই হলো কি—ওকে একটা অদ্ভুত নেশায় পেয়ে বসল। শহর থেকে দূরে কোন নেটিব এক জমিদারের জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে হাতী শিকার করতে সুরু করল। আর সেইসব হাতী কলকাতায় কোম্পানীর বড কর্তাদের কাছে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ রোজগার করতে লাগল। দৈহিক কামনার মতই অর্থলোভও মানুষকে করে তোলে হিংস্র পশু। সারাদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতো নিশিরাতে মদে চুর হয়ে বাংলোয় ফিরে এসেই তার সঙ্গে একটিও কথা না বলে

শুধু ওর পাশবিক খিদেটা মিটিয়ে নিত। প্রতিবাদ করলে অকথ্য অত্যাচার করতো। বলপ্রয়োগ করেই তাঁর দেহটাকে উপভোগ করতো। মাঝে মাঝে তার আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে হতো। কোথায়—কতদূরে সেই পাহাড় আর পাইনবনে ঘেরা সিমলা, মা-বাবার স্নেহ ভালবাসায় ভরা সেই নিশ্চিন্ত সুখী আর অবারিত জীবন—যেন পালকী বেয়ারাদের একটানা দূরাগত ধ্বনির মত মিলিয়ে গিয়েছে।

একদিন ওই শয়তান ডুকারেলটা ভরদুপুরে অসময়ে বাড়ি এল। কেন যেন খুব খুশি। হাসি হাসি মুখ। চুমু খেল। খুব আদর করল। হঠাৎ তার বুকে মাথা রেখে নরম গলায় বলল, আমি তোমার ওপর খুবই অবিচার করেছি লোলা—তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি—

কী ব্যাপার মদের মাত্রাটা বুঝি বেশি হয়েছে, ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে সে বলেছিল। কিন্তু ডুকারেল তাকে বুকের ভেতরে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমাকে আর কখনো দুঃখ দেব না—যীশুর নামে প্রমিজ করছি—তার কথাগুলোর ভেতরে কান্নার আভাস ফুটে উঠল। সে ভাবল, হয়তো বা ওর সুমতি হয়েছে। যীশু মুখ তুলে তাকিয়েছেন। তার অন্ধকার জীবনের ভেতরে যেন রামধনুর ঝিলিমিলি ফুটে উঠল।

ডুকারেল আর সেদিন বাইরেই গেল না। সর্বক্ষণ তার সঙ্গে ছায়ার মত রইল। হঠাৎ খুশির উচ্ছ্বাসেই একটা প্রস্তাব করে বসল। বলল, চলো আমার সঙ্গে হান্টিং-এ। তোমার একটা ওয়াণ্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স হবে—

সঙ্গে সঙ্গে সে রাজী হয়ে গেল।

শ্রীহট্ট শহর থেকে অনেক-অনেক দূর সেই 'ফরেষ্ট।' রাস্তার দুপাশে নিবিড় জঙ্গল। হাতীর পিঠে সুসজ্জিত হাওদায় চেপে ডুকারেলের সঙ্গে সে চলেছে। তার মনের ভেতরে খুশির ঢেউ উথালপাতাল করছে।

বিকেলে যেই সেই সবুজ বনদেহে রোদ পড়ল বাঁকা হয়ে অমনি তাদের নজরে পড়ল, সেই গহণ বনের ভেতরে ইন্দ্রপুরীর মত সদৃশ্য একটি বাংলো! ডুকারেল বলল, এই জঙ্গলের মালিক রাজাবাহাদুর রুদ্রপ্রসাদের হান্টিংবাংলো! একটু থেমে কয়েকমুহূর্ত কি চিন্তা করে আবার বলল, তুমি তো স্পটে যেতে পারবে না— হান্টিং শেষ করে শহরে ফেরার সময় তোমাকে নিয়ে যাবো— ডার্লিং, বলেই সশব্দে একটা চুমু খেয়েই তার দলবল নিয়ে নিবিড় অন্ধকারে অদৃশ্য

হয়ে গেল।

রাত গভীর হলো। ডুকারেল ফিরে এল না। চারিদিকের অন্ধকারে ঝিঁঝিঁগুলো যেন তার মাথার ভেতরে ডাকতে লাগল। থেকে থেকে অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছে—শাল-সেগুনের পাতায় পাতায় উঠছে মৃদু মর্মর। কখনো কখনো ডাকছে বনমুরগী, দূর থেকে ভেসে আসছে ক্ষুধার্ত বাঘের গর্জন! তার মনে হলো, ওই গভীর ভয়ঙ্কর অরণ্যের ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রাণীগুলো যেন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাকে লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছে। এখনো—এখনো আসছে না কেন ডুকারেল! সে কি জানে না, এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের ভেতরে এই একটা ঘরে একেবারে সে একা? তার মনের ভেতরে বিষধর সাপের মত ফণা তুলে ধরল অশুভ একটা আশঙ্কা—তাহলে কি তাকে এখানে নিয়ে আসার আড়ালে কোন ধূর্ত অভিসন্ধি আছে ডুকারেলের!

প্রহরে প্রহরে রাত গড়িয়ে চলল। আর সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে একটা ভয়ঙ্কর কোন মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই বারান্দায় পায়ের শব্দ শোনা গেল। দুলে উঠল তার বুকের ভেতরটা—যাক তাহলে শেষপর্যন্ত এসেছে—খট্—খট্—খট্—দ্রুত কড়া নাড়ার আওয়াজ হলো। সে দরজা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকল দৈত্যের মত অতিকায় চেহারার একটা মানুষ। পরণে মিহি ধুতি। গায়ে চুরিদার পাঞ্জাবী। তার দুই বগলে দুটো স্কচ হুইস্কীর বোতল। লোকটা—আশ্চর্য—একটি কথা বলল না। এক ফুঁয়ে সেজবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে তাকে দু' হাতে বুকের ভেতরে জাপটে ধরল। তাকে কঠিনভাবে নিষ্পেষণ করতে করতে ফিস ফিস করে বলল, ভয় পেও না ডার্লিং—সাহেবকে হাতী শিকারের জন্য জঙ্গল ইজারা দিয়েছি যে তোমারই মূল্যে—

রাজাবাহাদুর রুদ্রপ্রসাদের বুকের ভেতরে একেবারে পাথর হয়ে গেল সে! একটি কথাও বলল না। প্রতিবাদও করল না। নিতান্ত অসহায় মানুষ যেমন সর্বনাশা বন্যায় ডুবে যায়, তেমনি করে রাজাবাহাদুরের লালসার স্রোতে কুটোর মত ভেসে গেল সে।

দিন কাটে। মাস যায়। নির্জন সেই আরণ্যক পরিবেশে হান্টিং-বাংলোতে রাজাবাহাদুরের বিলাসের সহচরী হয়ে সে দিনযাপন করে। না, জমিদার রুদ্রপ্রসাদ আর পাঁচটা কামুক পুরুষের মত বেরসিক নন। কোনদিন খাঁটি মুক্তোর হার, কোনদিন আবার বহুমূল্য কোন স্বর্ণালঙ্কার উপহার নিয়ে এসে সযত্নে পরিয়ে দিয়ে বলতো, আজ শুধু দুচোখ ভরে তোমাকে দেখবো ডার্লিং—

সেদিন আর তার দেহটা নিয়ে রাজাবাহাদুর লোফালুফি করতো না। সে বিস্মিত হতো, নির্জন ঘরে জ্যান্ত একটা মেয়েমানুষের দেহ পেয়েও কোন পুরুষ মানুষ আবার তার হিংস্র জৈব ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করে না, এমনও হয় না কি? যাহোক, রাজাবাহাদুরের আদরে ভালোবাসায় দিনগুলো বেশ কেটে যাচ্ছিল। 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান' মেয়ে বলে ডুকারেলের মত তাকে কমোডিটির মত ব্যবহার না করে মানুষ হিসেবেও কিছু মূল্য দেয়, এই অভিজ্ঞতাও তার মনটাকে একটা প্রশান্তিতে ভরিয়ে তোলে। কিন্তু—

তার জন্মলগ্নে আছে অভিশাপ। সুখ আর স্বস্তি তার কপালে ছিল না। আবার তাকে একদিন অনিশ্চয়তার স্রোতে ভাসতে হলো।

অসময়ে একদিন হান্টিং বাংলোর সেই সুদৃশ্য কক্ষের কড়া বেজে উঠল। দরজা খুলতেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। অপরূপ সুন্দরী সুঠামতনু এক নারী। সঙ্গে দুইজন পরিচারিকা। কয়েকমুহূর্ত তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আর সে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করল, তার কালো চোখের তারায় ঘনবর্ষার মেঘের মত কি যেন টলমল করছে। অস্ফুটস্বরে বলেছিল সে, তুমি আমার কপাল পুড়িও না ভাই—যতদিন তুমি এখানে থাকবে ততদিন রাজাবাহাদুর আমার দিকে ঘুরেও তাকাবে না—

কি করতে হবে বলুন? তার সেই করুণ ব্যথিত মূর্তির দিকে তাকিয়ে তার বুকটা অবরুদ্ধ ব্যথায় ভারী হয়ে উঠেছিল।

তোমার জন্যে বাইরে পালকী প্রস্তুত আছে—সঙ্গে আমার বিশ্বস্ত লোক আছে—তোমাকে এখুনি এই মুহূর্তে চলে যেতে হবে শহরে—

আর দেরি করেনি। সেও তো মেয়ে। রাজাবাহাদুরের স্ত্রী-র মনের ভেতরের সেই দুবিষহ যন্ত্রণাটা সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল বলেই চলে এসেছিল।

কিন্তু শ্রীহট্ট শহরে কার কাছে ফিরে যাবে সে? যে স্কাউণ্ড্রেলটা তাকে বিক্রি করেছে তার কাছে গিয়ে তো দাঁড়াতে পারে না। অতএব শহরে ফিরে এসে ডুকারেলের যে দু'একজন কর্মচারী তার ওপর সহানুভূতিশীল ছিল তাদেরই সাহায্যে সোজা চলে এল শহর কলকাতায়।

খট্-খট্-খট্—ঘোড়ার খুরে খুরে শব্দ বাজছে। কেরাঞ্চি চলছে। এখনও সেই-গাড়ির ছায়াটা তাকে অনুসরণ করছে। হয়তো ফরেষ্ট লীজ দেওয়ার মূল্যটা খোয়া গিয়েছে। তাই শয়তানটা আর হাতী শিকার করতে পারছে

না। লাভের অঙ্কে টান পড়েছে বলেই দুর্বৃত্তটা এসেছে তাকে খুঁজতে। তার মাথার ভেতরে আগুন জ্বলে উঠল। অসহ্য অস্থিরতায় নিশপিশ করে উঠল তার হাতদুটো, অব্যক্ত যন্ত্রণায় চিৎকার করে বলল—কোচওয়ান জলদী চলো—

কসাইতলায় মিসেস মিডলটনের বাড়ির সামনে লোলা মন্তাজের কেরেঞ্চি দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে সেই রহস্যময় গাড়িটাও থামল। নামল এক সুদর্শন যুবক। বড় বড় ভাসা ভাসা দুটো কালো চোখ। একমাথা ঘন কোঁকড়ানো সোনালী চুল!

গুড ইভিনিং মিস মন্তাজ। আমি আর্টিস্ট-ড্যানিয়েল। সপ্রতিভ যুবক বলল, পাঞ্চহাউসে আপনার অপূর্ব নাচ দেখে চামর্ড হয়েছি—অনুগ্রহ করে ওই নাচের কয়েকটা পোজে আমার কাছে সিটিং দিতে হবে—আমি ছবি আঁকবো—

লোলার ক্লান্ত মুখাবয়বে বিষন্ন হাসি ফুটল। তার মনে হলো, শুধুই সৌন্দর্যের টানে তার কাছে এসেছে, এমন মানুষও আবার হয় নাকি! অস্ফুটস্বরে বলল, আপনি আগামীকাল পাঞ্চহাউসের গ্রীনরুমে আসবেন স্যার—

কিন্তু ম্যাডাম, আপনি ড্যান্সের 'পোজ' করে সিটিং দেবেন—আমি আঁকবো—পাঞ্চহাউসে কি ভালো হবে?

লোলা কথা বলে না। মাথা নীচু করে। সঙ্কোচের ছায়া পড়ে তার প্রতিমার মত সুডৌল মুখে। কি বলবে—কেমন করে বলবে, পাঞ্চহাউসের প্রোগ্রাম শেষ করে ফেরার পরই গভীর রাতের অন্ধকারে তার বাড়ির সামনে মাংসলোলুপ মানুষদের মিছিল শুরু হয়ে যায়—আচ্ছা ম্যাডাম—আমি পাঞ্চ-হাউসেই যাবো—আপনার প্রোগ্রামের সাফিসিয়েন্টলি আগে যাবো—বলেই আর্টিষ্ট ড্যানিয়েল তার বুটজুতোয় খট্‌-খট্‌ শব্দ তুলে চলে গেল। লোলার মনে হল, তরল অন্ধকারে কোন দেবদূতের জ্যোতির্ময় মূর্তি অপসৃত হয়ে গেল।

নির্জন ঘরের সেই অন্ধকারে আচ্ছন্নের মত বসে রইল লোলা। কিছুক্ষণ পরে ধীর পায়ে জানালায় এসে দাঁড়ালো। শেষ রাতের গাঢ় নিস্তব্ধতায় থম থম করছে রাস্তাটা। না আজ আর বিলাসী উচ্ছৃঙ্খল কোন বাবু তার অপেক্ষায় নেই। হয়তো ড্যানিয়েল সাহেবকে আসতে দেখেছে বলেই ক্ষুন্নমনে বিদায় নিয়েছে। তার নজরে পড়ল আকাশে জ্বলছে সপ্তর্ষি; জ্বলছে ক্যাসিওপিয়া! কোথায়—কতদূরে সেই সিমলা!—সেই ঘনসন্নিবদ্ধ পাইনবিথীর ওপরে

আকাশেও হয়তো রাশি রাশি নক্ষত্র জ্বলছে! হু হু করে হাওয়া এল। বাতাসটা যেন তার রুক্ষ ঊষার জীবনভূমির ওপর দিয়েই বয়ে এল। তার মনে হলো, কত সামান্য ছিল তার আকাঙ্খা! স্বামীর ভালোবাসা আর শিশুর কলকণ্ঠ দিয়ে ঘেরা একটি সংসার। আর স্বামী শিল্পী না হোক—শিল্পী মনের মানুষ হবে! সে তার গান শুনবে। নাচ দেখবে। তারিফ করবে। তার নৃত্যগীত উপভোগ করতে করতে তার মুগ্ধ দুটো চোখের দৃষ্টি অপলক হয়ে উঠবে! শুধু নির্জন ঘরে তাকে পেলে পাশবিক উল্লাসে মত্ত হয়ে উঠবে না। তার সেই সামান্য বাসনাই বারে বারে তাকে এক সর্বনাশ থেকে আর এক সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

পরদিন থেকে ড্যানিয়েল শহর কলকাতার রূপসী নগরসুন্দরীর ছবি আঁকতে শুরু করল। ক্যানভাসের ওপর নিপুণ তুলির টানে নৃত্যরতা লোলার তন্বী সুঠাম মূর্তি ফুটিয়ে তুলল কোথাও তার দ্রুত আন্দোলিত পুষ্ট নিতম্বের ছায়াময় মরীচিকা আবার কোথাও চক্রাকারে তার ঘূর্ণায়মান মূর্তির ভেতরে মূর্ত হয়ে ওঠে তার উদ্দাম প্রাণের আবর্ত। মুদ্রার পর মুদ্রা। ছবির পর ছবি। লোলা মন্তাজ নিজেই নিজের প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে বিভোর হয়ে যায়। আর—

আর তার চোখে স্বপ্ন নামে। তার অন্ধকার জীবনের শ্বাসরোধী কারাগার থেকে এই মানুষটি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে এক অবারিত আলোর রাজ্যে। কিন্তু—

স্বপ্ন সত্যে রূপায়িত হয় না। একটা ক্ষ্যাপা ঝড়ের মত আসে ড্যানিয়েল। আসে কসাইতলা স্ট্রীটে সেই মিসেস মিডলটনের বাড়িতেই। এসেই হয়তো কোনদিন বলে—লোলা—চলো বারাকপুরে—আজ বারাকপুর-কলকাতা ট্রাঙ্ক রোড ওপনিং হচ্ছে—খুব ধুমধাম হবে—একটু থেমে কয়েকমুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে লোলার হাস্যপ্রদীপ্ত স্নিগ্ধ সেই মুখাবয়বের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমাকে নৌকো করে নিয়ে যাবো মাঝ গঙ্গায়—বাতাসে উড়বে তোমার চুল, উড়বে তোমার স্কার্ট—আমি আঁকবো তোমার সেই ছবি—

আবার হয়তো আর একদিন এসে বলল—লোলা—চলো এখুনি রওনা হবো সাগরদ্বীপে। সেখানে লর্ড কর্ণওয়ালিশ স্বয়ং লাইটহাউসের ফাউণ্ডেশান স্টোন বসাবেন—

ড্যানিয়েলের এই উদ্দামতা দেখে তার সন্দেহ হয়, বুঝি বারাকপুরের গঙ্গা

কি সাগরদ্বীপের বিশাল জলরাশির পটভূমিতে একটা পছন্দসই মডেলের চেয়ে বেশি আকর্ষণ তার ওপরে নেই। তাই লজ্জা সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়ে ড্যানিয়েলকে কিছু বলে না। বলতে পারে না। কিন্তু—

এমন একটা কাণ্ড ঘটল যে তাকে ড্যানিয়েলের কাছে যেতেই হলো। একদিন পাঞ্চহাউসের প্রোগ্রাম শেষ করে যেই বাড়িতে ফিরেছে অমনি আট-ফুকারের একটা সুদৃশ্য ব্রুহাম গাড়ি থেকে নামল এক বাবু। পরণে ফিন ফিনে কালো পেড়ে শান্তিপুরী মিহি ধুতি। গায়ে মসলিনের বেনিয়ান। গলায় চুনট করা পাকাশে উড়নী। বলল, এক রাত্তিরের জন্যে তোমার দক্ষিণা কত মস্তাজ—

আমি বেশ্যা নই—আপনাদের দেশী বেশ্যা অনেক আছে—

হো হো করে অট্টহাসি হাসল মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর। টেনে টেনে বলল, কেষ্ট দত্তের পচুইয়ের দোকানে বেহেড মাতালগুলোকে তুমি নাচ দেখাও—আর সুন্দরী তুমি বলছো—তোমাকে ওরা উচ্ছিষ্ট করেনি, বলেই মস্তাজকে জড়িয়ে ধরল। রাজকৃষ্ণের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে উঠল মস্তাজ। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল, আপনি জবরদস্তি করছেন কেন?

কী! জানো আমি কে—আমি লর্ড ক্লাইভের দেওয়ান মহারাজ নবকৃষ্ণের পুত্র—আমি চাইলে আপত্তি করে এমন কোন মেয়েমানুষ নেই শহর কলকাতায়, বুঝলে সুন্দরী, একটু থামল উত্তেজিত বিক্ষুব্ধ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর তাকে পঞ্চাশটা সোনার মোহর দিতে গেল। অমনি মোহরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মর্মান্তিক যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল মস্তাজ—এ কী করছেন আপনি—বলছি তো আমি বাজারের মেয়েছেলে নই—ইচ্ছে হলে দুটো ভালো কথা বলুন; আমার নাচ দেখুন—

সুন্দরী, ওসব পানসে লাগে—আমার চাই আসল জিনিস—বলেই বদ্ধ একটা উন্মাদের মত ফর ফর করে ছিঁড়ে ফেলল তার স্কার্ট! খুলে ফেলল তার কাঁচুলী। আর তার অনাবৃত বুকের ওপরে ক্ষুধার্ত একটা পশুর মতই লোলুপ উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উদগ্র লালসা চরিতার্থ করতে শুরু করল। ওদিকে মস্তাজ সমানে কামড়ে ছিঁড়ে বাধা দিয়ে চলেছে আর আর্তকণ্ঠে চিৎকার করছে—

আঃ, ভদ্রলোকের বাড়িতে এসব কী হচ্ছে—রাগে কাঁপতে কাঁপতে এল মিসেস মিডলটন। রুদ্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলতে লাগল—চিৎকার করছো

কেন লোলা ? কে ট্রেসপাচ করেছে তোমার ঘরে—

দরজা খুলল।

কামুক পশুর মতই আহারান্তে পরিতৃপ্ত হয়ে বেরিয়ে গেল ক্লাইভের দেওয়ান মহারাজ নবকৃষ্ণের পুত্র রাজকৃষ্ণদেব বাহাদুর। আর মিসেস মিডলটন খর চোখে লোলার দিকে তাকিয়ে বলল, ও তুমি আমার বাড়িতে বসে এই বিজনেস করছো ? এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে—

নিশি রাতে লোলা মস্তাজ পথে নামল। নামতে হলো।

ড্যানিয়েল সব বৃত্তান্ত শুনল। ব্যথিতকণ্ঠে বলল, তুমি ড্যান্সার—তুমি আর্টিস্ট—স্বাধীনভাবে রোজগার করো তাই তোমাকে বলতে সাহস করি নি লোলা—কিন্তু আমি তোমাকে—

তার কথা আর শেষ হলো না। উন্মত্ত একটা বন্যার মত ঝাঁপিয়ে পড়ল লোলা তার বুকে। চোখের জলে আর হাসিতে অন্ধ হয়ে এল তার দৃষ্টি।

ছয়মাস পর। শহর থেকে দূরে বারাকপুরে রিভারসাইড রোডে একটা সুদৃশ্য বাড়িতে থাকে ড্যানিয়েল আর লোলা। বলাবাহুল্য খুব সুখে আর শান্তিতে তাদের দিন কাটছিল। লোলার মনে হয় একটা নিবিড় সুখস্বপ্নের রাজ্যের ভেতর দিয়ে যেন সে চলেছে। কেন যেন, কোন অজানিত আশঙ্কায় তার বুকের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠতো—তার ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনে এই সুখ কি সইবে ?

ইংল্যাণ্ড থেকে খবর এল, ইংরেজ ওয়াটার্লু যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। নেপোলিয়নের মত চিরশত্রু নিপাত হয়েছে। শুরু হলো বিজয়োৎসব। কলকাতা মহানগরীর মত বারাকপুরও আলোকমালায় সজ্জিত হলো। উৎসবমুখর শহরের হর্ষোৎফুল্ল জনতার সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে লোলা আর ড্যানিয়েলও বেড়াতে বেরিয়েছে !

খট্-খট্-খট্—হঠাৎ কোথা থেকে ধূমকেতুর মত ঘোড়া ছুটিয়ে এল প্লেভডীলার কেনেডী। তাদের পথরোধ করে দাঁড়ালো। ঘোড়া থেকে ড্যানিয়েলকে বলল, আপনার এই ক্রসব্রীড কেপ্টটাকে কতটাকা হলো বিক্রি করতে পারেন—

ইউ সাট আপ—রাস্কেল, রুদ্ধ আক্রোশে জ্বলে উঠল ড্যানিয়েল, ভদ্রলোকের ওয়াইফ সম্বন্ধে বলতে হলে যে কার্টসি দরকার—

ওয়াইফ ! পাগলের মতো হো হো করে হেসে বলল কেনেডী। আপনি

খাস ইংরেজের ছেলে হয়ে একটা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে বিয়ে করেছেন—এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন মিঃ ড্যানিয়েল, বলেই চোখের কোণা দিয়ে লোলার যৌবনপুষ্ট দেহটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, দিন না গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিচ্ছি—জাঞ্জিবারের স্লেভমার্কেটে এই মালের খুব দাম—

কেনেডী—ইউ আর গোয়িং—টু ফার, বলেই ড্যানিয়েল খিমচে ধরল কেনেডীর গলা। কেনেডী পকেট থেকে পিস্তল বের করে উঁচিয়ে ধরে যুদ্ধ ঘোষণা করার মত করে বলল, কাম অন মিঃ ড্যানিয়েল—ডুয়েল হয়ে যাক—

ইয়েস—স্টার্ট ডুয়েল ড্যানিয়েলও পিস্তল বের করে তৈরি হলো—

আপনারা কি করছেন—কী করছেন, তাদের দুইজনের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে বদ্ধ উন্মাদিনীর মত দুহাতে বুক চেপে ধরে হতভাগিনী লোলা মন্তাজ আর্তনাদ করতে শুরু করেছিল। কেনেডীর পাদুটো জড়িয়ে ধরে বলল, আপনি আমাকে নিয়ে যান—ড্যানিয়েলকে প্রাণে মারবেন—না—

লোলা মন্তাজের সকাতর অনুরোধেও যে সেই সর্বনাশা ডুয়েল বন্ধ হয় নি। তার প্রমাণ গভর্ণমেণ্ট গেজেটের এই খবর—**A most distressing event took place at Barrackpore on Saturday last. A young artist Daniel having been shot dead in a due**
(Calcutta Gazette, 16th July, 1814).

তারপরের ঘটনা যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি শোকাবহ।

সেই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার পরদিন সর্বসাক্ষী আকাশে সূর্য উঠল। আর বারাকপুর রিভারসাইড রোডের বাসিন্দারা সবিস্ময়ে দেখল গঙ্গার শানবাঁধানো ঘাটের সিঁড়িতে আড়াআড়িভাবে পড়ে রয়েছে লোলা মন্তাজের মৃতদেহ। গলাটা ক্ষুর দিয়ে পুচিয়ে কাটা! কেউ বলে, ওর স্বামী সেই জেমস ডুকারেল যে হন্তে হয়ে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল—সে-ই খুন করেছে তাকে। আবার কেউ বলে, যে সমাজে মেয়েরা শুধুই পুরুষের লালসার সামগ্রী এবং কমোডিটি অর্থাৎ পণ্য ছাড়া কিছু নয়—সেই সমাজে বেঁচে থাকতে চায় নি দুর্ভাগিনী লোলা মন্তাজ! তাই—

তদানীন্তনকালের বিখ্যাত পত্রিকা বেঙ্গল হারকুরু লিখেছিল—**Her strange career was like a romance, Lola Montez wife of James Ducarel, collector of Syllete, who made a sensation**

from the hills of Simla, down to the Punch house of Sri Krishna Dutta at chinabazar Calcutta, died at the age of 38. (Bengal Harkuru, 19th July, 1814) অর্থাৎ লোলা মন্তাজের বিচিত্র জীবন রোমান্টিক উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক। যে একদিন সুউচ্চ পাহাড় ঘেরা সিমলা থেকে শুরু করে সদর শহর কলকাতার চীনা বাজারের শ্রীকৃষ্ণ দত্তের পাঞ্চহাউস পর্যন্ত প্রবল চাঞ্চল্য জাগিয়েছিল তার জীবনাবসান হলো, মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে।

ত্রয়োবিংশ স্তবক

সাহেব নবাব ম্যারিয়েট আর নগরসুন্দরী নেটিব সাঁহেবপুঁটির নিবিড় প্রেমের বিস্ময়কর পরিণতি—

ইউ রাস্কেল—নেটিব—ডার্টি প্যাগ্নানস ! বদমায়েস-বেতমিজ—

অ্যাংলো-বাংলা-হিন্দি ভাষায় গালাগাল করছে সাহেব নবাব উইলিয়ম ম্যারিয়েট তার নেটিব বাঙ্গালী কর্মচারীদের। আর প্রকাণ্ড একটা চাবুক দিয়ে থেকে থেকে আঘাত করছে মেঝেতে। ভয়ে চমকে চমকে উঠছে তার বশংবদ দেশীয় ভৃত্যরা। তারা কেউ হাতজোড় করে বলছে—

হুজুর স্যার—আর এরকম হবে না—

সাহেব, ইউ ফাদার—গ্র্যাণ্ড-ফাদার সাহেব—

স্যার, আপনিই ফাদার-মাদার বোথ—

শপাং—মেঝেতে আবার সশব্দে চাবুক মেরে চিৎকার করে বলল সাহেব—দেখো কোভি অ্যায়সা মাত করো—

ভৃত্যকুলের শাসনপর্ব শেষ করে কৌচে বসল ম্যারিয়েট। হেঁকে ডাকল হুঁকোবরদারকা বোলাও—

ছুটতে ছুটতে হুঁকোবরদার সুদৃশ্য আলবোলা নিয়ে এল। তার সুন্দর রূপালী জরিবসানো সুদীর্ঘ নলটা সাহেবের মুখগহবরে গুঁজে দিল। ম্যারিয়েট চোখ বুঁজে অবিরাম টানতে শুরু করল। আর হুঁকোবরদার মৃদু বাতাস দিয়ে কল্কের আগুনটাকে উদ্দীপ্ত করে রেখে যেতে লাগল। খানসামার ইঙ্গিতে এল হেয়ার ড্রেসার। তারা ম্যারিযেটের পিছনে দাঁড়িযে কেউ নিঃশব্দে তার সোনালী চুল আঁচড়াতে লাগল, কেউ আবার চুলের ভেতরে বিলি কাটতে শুরু করল। অদূরে ছবির মত দাঁড়িয়ে রইল প্রধান খিদমৎগার। তার চোখে তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রভুর আরামের যেন কোন ব্যাঘাত না হয়—আর—

বাংলোর বারান্দার দূর কোণে হুকুমের প্রতীক্ষায় বসে রইল বাঙ্গালী সরকারবাবু!

আবার এই ম্যারিয়েট সাহেবেরই বাংলোর বাইরে আর এক রাজকীয় রূপ। সাহেব মর্ণিংওয়াকে অর্থাৎ প্রাতঃভ্রমণে বেরোবে। সহিস সুদৃশ্য আর্বী স্ট্যালিয়ন ঘোড়ায় জীন চাপিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। সাহেব ধীর পায়ে রেকাবীতে পা দিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে। বাতাসে চাবুক আন্দোলিত করতেই টগবগিয়ে ছুটতে থাকে তেজী ঘোড়া। আর দুইপাশে সেই দ্রুত ধাবমান বলশালী

অশ্বের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে ছোটে হতভাগা নেটিব সহিসের দল। আর—

রাত্রে যখন দশ ঘুকায়ের সুদৃশ্য ল্যাণ্ডো হাঁকিয়ে সাহেব কোন ট্যাভার্ণে কি হোটেলে কোন পার্টিতে যায় তখন নেটিব মশালচীরা তার গাড়ির দুইপাশে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ছুটতে থাকে। অন্ধকার পথে চলতে যেন প্রভুর কোন বিঘ্ন না হয়। প্রায় সারারাত ধরে সুরাপান আর নাচগান হৈ-হল্লা করে শেষরাত্রে ক্লান্ত আর অবসন্ন দেহ নিয়ে কোনরকমে বাংলোতে ফিরে আসে।

শুধু কাশীমবাজার কুঠির সহকারী উইলিয়ম ম্যারিয়েট নয়—আঠারো কি উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা প্রত্যেকে বিলাসব্যসনের এই আমেরী জীবনে এত বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে তাদের সাহেব-নবাব বলা হতো।

সাহেব নবাব উইলিয়ম ম্যারিয়েটের ডিঙ্গাভাঙ্গা খালের ধারে (বর্তমান ক্রীকরো) সংলগ্ন বিশাল বাগানবাড়ি। শুধু কোম্পানীর চাকরি নয়, ব্যক্তিগত ব্যবসা আর দেশীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে উৎকোচ এবং উপঢৌকন নিয়ে অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়েছে সে? কিন্তু তার মনে সুখ নেই—

তার ঘর শূন্য মনে হয়।

মনে হয়, বহুদিন বহুকাল যেন সে একটা নির্জন কারাগারে বন্দী হয়ে আছে! তার মনের ভেতরে নিরাকার একটা অস্থিরতা ছটফট করে। বিলেত থেকে কোম্পানীর বড় কর্তারা তো ফরমাস দিয়েই খালাস—concubinage is regarded as a matter of ordinary necessary and advice given as to the female establishment—a youngman should set up ··অর্থাৎ ভারতবর্ষে কোম্পানীর কাজে কর্মরত যুবকদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে তারা ইচ্ছে করলে নেটিব মেয়েকে উপপত্নী হিসেবে রাখতে পারে—একটি তরুণের নারীসঙ্গের প্রয়োজনও আছে—

বেশ, ভালো কথা। কিন্তু তার শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে এমন 'কন্কুবাইন' সে এখন পায় কোথায়? ম্যারিয়েটের মাথার ভেতরটা জ্বলে যায়! কাশীমবাজার এবং কলকাতার আশেপাশে গ্রাম গ্রামান্তরে সে অনেক খুঁজেছে। এক একটা এমন রূপসী মেয়ে দেখেছে যে চোখ চোঁধাঁধিয়ে যায়। হয়তো স্নান করে কাঁখে কলসী নিয়ে মন্থর পায়ে চলেছে তার বাড়ির দিকে। পিঠ পর্যন্ত ছাপিয়ে পড়া চুল থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে। ভিজে শাড়ির আড়ালে তার

অপূর্ব যৌবনশ্রী যেন বিদ্যুতের রেখার মত ঝিকমিক করছে। এককথায় সেই সব 'ইণ্ডিয়ান বিউটি' একেবারে অ্যাঞ্জেল! কিন্তু তারা আকাশের নক্ষত্রের মতই সুদূর! এত বেশি পর্দানশীন আর এমন ধর্মভীরু যে লক্ষ টাকার বিনিময়েও তারা কোন ম্লেচ্ছর ঘরে আসবে না! একেবারে নীচজাতীর স্ত্রী-লোকদের সাধ্যসাধনা করেও আয়ার কাজে রাজি করানো যায় না!

তবে হ্যাঁ, চিৎপুরের স্লেভ গোডাউনে গিয়ে সে একটা উঠতি বয়সের মেড স্লেভ কিনতে পারে। কিন্তু তারা বেশির ভাগই এমন কালো কদাকার আর হতকুচ্ছিৎ যে তাদের নিতান্তই স্থূল মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তার সহকর্মীদের কারো কারো কুঠিতে ওরকম দু'একটা মেয়ে আছে বটে! মেয়েগুলো তাদের অঙ্কশায়িনীও হয়। কিন্তু—

তার বন্ধুদের রুচির সঙ্গে তার মেলে না। আরে 'কম্বুবাইন' যে জৈবক্ষুধা নিবৃত্তির শুধু একটা উপকরণই হবে তা তো নয়—তাকে তো তার মনের সঙ্গীও হতে হবে। এসব কথা কোম্পানীর বড় কর্তারা সাত সমুদ্দুর তের নদী পারে বসে তলিয়ে ভাবে—না ভাবতে পারে। চিন্তা করতে করতে তীব্র উত্তেজনায় অস্থির হয়ে হেঁকে ডাকল—সা—ট—কৌ—ড়ি—ই—ই—

আজ্ঞে যাই স্যার—হাতদুটো জোড় করে ছুটতে ছুটতে এল সরকারমশাই সাতকড়ি মিত্তির! লম্বা সিড়িঙ্গে। দড়ির মত পাকানো চেহারা। জটপাকানো গুলিসুতোর মত রেখাজটিল মুখাবয়ব।

শোন সা-ট-কৌড়ি-তোমার খোঁজে কোন ভালো মেয়ে আছে—

মেয়ে! আই মীন স্যার মেয়েছেলে?

হ্যাঁ-হ্যাঁ—ইয়ং অ্যাণ্ড বিউটিফুল গার্ল—বিরক্ত হয়ে ম্যারিয়েট সাতকড়ির কাঁচামাটির রাস্তার মত এবড়ো খেবড়ো মুখের দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকালো। সাতকড়ির ধূসর চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। অস্ফুটস্বরে বলল, স্যার সেদিনই তো একটা আয়া—

ইউ-স্কাউণ্ড্রেল—ফুল—ইডিয়ট গর্জে উঠল উইলিয়ম, তোমাকে আয়ার কথা কে বলেছে? ইয়ং বিউটিফুল মেয়ে কেন চাইছি বুঝতে পারছো না হাঁদারাম—ইডিয়ট্ কোথাকার—

ও ইয়েস স্যার—আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড স্যার—সাতকড়ির ধূসর চোখদুটো কৌতুকের হাসিতে জোনাকীর মত মিটমিট করতে লাগল।

কোন কথা বলল না সাতকড়ি। কিন্তু তার মনের ভেতরে ভেসে উঠল

এক তন্বী রমণী মূর্তি। যেমন দীঘল চেহারা তেমনি দুধে আলতা মেশানো গায়ের রঙ। সাহেবের সঙ্গে যা মানাবে—

কি ভাবছো সাটকড়ি—তোমার খোঁজে কোন ফেয়ার কমপ্লেকশান এবং গুডলিকিং—

হ্যাঁ—ইয়েস স্যার—আছে স্যার—করজোড়ে বলে সাতকড়ি। মাথা চুলকায়। আর কেন যেন অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে তার মুখে। ভয়ে ভয়ে বলে, স্যার আপনার চেয়ার পালকীটা আর বেশ কিছু টাকা দেবেন—দেখবো চেষ্টা করে—

চেয়ার পাল্‌কী কেন তুমি আমার চৌঘুড়ির বগিগাড়িটা নিয়ে যাও না? আর আমার খাজাঞ্চিকে বলে—

না—না স্যার—বগি নিয়ে গেলে তো সে বুঝে ফেলবে কোন সাহেবের বাড়ি থেকে—

তাহলে যাতে ভালো হয় সেটা করো—

ছায়ার মত সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে শহর কলকাতার বুকে। সোনাগাছিতে রাত্রির অপ্সরীদের ঘরে ঘরে শুরু হয়েছে প্রসাধন পর্ব!

ওলো সাহেবপুঁটি—তুই আর গুচ্ছের পাউডার কেন মাখছিস মুখে—ধবধবে ফরসা আর লম্বা চেহারার মেয়েপুঁটি ওরফে সাহেবপুঁটির চিবুক আলতো করে ছুঁয়ে বলে মালতী—ইস কী তোর গায়ের রঙ মাইরী। আমি মাগী না হয়ে মিন্সে হলে ঠিক তোর—

হ্যাঁ—রে সাহেবপুঁটি, কী গজালি করছিস তুই ছুড়ীগুলোর সঙ্গে, বাড়িওয়ালী মাসী হুঁকোয় টান দিতে দিতে তাড়া দেয়। ·ল, একটু হাত চালিয়ে সাজগোছ কর বাছা—একটু থেমে নিজের মনেই বলে তোর রোজগারটাই তো আমার ভরসা—

মাসী তাই বলে এক রাত্তিরে তোমার দু' তিনজন মক্কেল আমার ঘরে পাঠিও না—আমার গা-গতরের গতিক ভালো নয়—ঝাঁঝিয়ে ওঠে সাহেবপুঁটি।

মাসীর হুকোর গুড়ুক গুড়ুক শব্দ থেমে যায়। চিলের মত চিৎকার করে বলে, তা আমি কি করবো বাছা, হাটখোলার জমিদার মদনমোহন দত্তের ব্যাটা তনুবাবু, চোরবাগানের মিত্তিরের ছেলে, নকুধরের নাতি সুখময়, শোভাবাজারের নবকৃষ্ণের ছেলে রাজকৃষ্ণ—আর কত বল.বা—কলকাতার বড় বড় বাবুরা সবাই যদি এসে বলে সাহেবপুঁটির ঘরে যাবে—তাহলে আমি কি করবো বল?

সাহেবপুঁটি কথা বলে না। বেলজিয়ান কাঁচের আয়নায় নিজের দেহাবয়বের সেই সর্বনাশা আগুনের মত রঙের দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে জ্বলে যায়। এই গায়ের রঙটা যেন নিদারুণ একটা অভিশাপের মত জর্জরিত করে দিয়েছে তার জীবন—

ডাঁয়ে ঝটকি বাঁয়ে ঝটকি হিপ্পো।

হকুম্মা।

ঠিকরিতলা রয় হিপ্পো,

হকুম্মা।

উইলিয়ম ম্যারিয়েটের সুদৃশ্য পালকীচেয়ারের বাহকরা এসে থামল সাহেবপুঁটির দরজার সামনে। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল মাসী। সাতকড়ি কোন কথা না বলে তার হাতে তার পঞ্চাশ সিক্কাটাকা গুঁজে দিল। আর খুব চাপাগলায় ফিস ফিস করে বলল কতগুলো কথা। মাসীর রেখাজটিল মুখে খুসীর আলো জ্বলে উঠল। কয়েক মুহূর্ত কি ভাবল। অস্ফুটস্বরে বলল, কিন্তু ছুঁড়ী বেশ্যা হলে কি হয় ধম্মকম্মে যে খুব মন—

খুক খুক করে হাসল সাতকড়ি। বলল, সেখানেও তো কোন অসুবিধা নেই—

মাসী সাহেবপুঁটির ঘরের বন্ধদরজার দিকে কেমন করুণ আর অসহায় চোখে তাকালো। ভয়ে ভয়ে বলল, আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে বাবু—চারিদিকে তাকিয়ে আবার গলা নামিয়ে বলল, তনুবাবু রয়েছেন ওর ঘরে—পিচ্ করে একদলা থুথু ফেলে আবার বলল, একবার সাহেবপুঁটির ঘরে ঢুকলে আর সহজে বেরোতে চায় না—

অপেক্ষা-টপেক্ষা চলবে না, সাতকড়ির শুকনো মুখে চোয়ালদুটো খিলের মত এঁটে বসল। গলায় জড়ানো চাদরের খুঁটটা দুহাতে টেনে ধরে চিৎকার করে বলল, কাশীমবাজার কুঠির ইনচার্জ সাহেব-নবাব উইলিয়ম ম্যারিয়েটের সরকার সাতকড়ি মিত্তির এসেছে—গিয়ে বলো—

খট্—খট্—খট্—মাসী ভীত হয়ে জোরে কড়া নাড়ল।

কি করছো মাসী আমার ঘরে যে বাবু রয়েছে, ভেতর থেকে সাহেবপুঁটির ক্লিষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

তোর পায়ে পড়ি একবার বেরিয়ে আয় পুঁটি—না হলে খুব বিপদ হবে —জাঁহাবাজ আর দজ্জাল বাড়িওয়ালীর গলায় আওয়াজও কেমন নরম আর

ভিজে ভিজে শোনার।

খুট—দরজা খুলল। কবাটের আড়াল থেকে অশেষক্লান্ত একটা মুখাবয়ব উঁকি দিতেই সাতকড়িমিস্ত্রিরের মনে হলো—মনে হলো যেন চাটাইয়েবেড়ার ওপরে মাটি দিয়ে নিকানো ঘরের ছায়া ছায়া অন্ধকারে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল।

বেরিয়ে আয় না একবার বাছা—তোর সঙ্গে কথা আছে। বাইরে এল সাহেব-পুঁটি।

শিথিল বেশবাস। নগ্ন দেহের ওপরে কোনরকমে শাড়িটা জড়িয়ে এসেছে। প্রায় স্বচ্ছ রেশমী শাড়ির আড়ালে উদ্ধত স্তনযুগল যেন থমকে রয়েছে। সাতকড়ির মাথার ভেতরটা ঝিম ঝিম করে উঠল।

ওলো পুঁটি তোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ম্যারিযেত না কি এক সাহেব পালকী পাঠিয়েছে—

ও মা আমাকে যে বাগবাজারের রাধা মদনমোহনের ঠাকুরবাড়ির রাস-যাত্রায় নিতে আসবে গোকুল মিত্তিরের পালকী, উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সাহেব-পুঁটি না—না মাসী আমি কোন মেলোচ্ছো সাহেব-টাহেবের বাংলোতে যেতে পারবো না—

তুমি না গেলে তোমাদের এই বস্তি পুড়িযে দেবে, কর্কশকণ্ঠে বলল, সাত-কড়ি, তুমি আমার সাহেবকে চেনো না—খুব দুঁদে সাহেব—কাশীমবাজারে ম্যারিয়েট সাহেবের নামে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়—

পুঁটি তোর পায়ে পড়ি বাছা—তুই আর আপত্তি করিস না মা। আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে, তুই তীব্র আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল সেই বহুদর্শী বৃদ্ধা বারাঙ্গনার। চোখ দুটো জলে ভরে এল।

আর কিছু বলল না। বলতে পারল না সাহেবপুঁটি। তার চোখের পাতায় ঘন হয়ে নেমে এল দূরকালের দুঃসহ স্মৃতি! কলকাতায় নিয়ে যেয়ে কালীঘাটে মা কালীকে দর্শন করাবে। তারপর বিয়ে করে সংসার পাতবে—এইসব বলে গঙ্গার ওপারে বর্দ্ধিষ্ণুগ্রাম বেতোড় থেকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল যে পাপিষ্ঠ সে মন্দিরে নিযে যেযে মা-কে সাক্ষী রেখেই সিন্দুর দিয়েছিল মাথায় ঠিকই।

কিন্তু দিনকতক মজা লুটে তাকে ছেঁড়া জুতোর মত এই শহরের পথে যখন ফেলে চলে গিয়েছিল এই মা-টিই তখন অনাহারে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচিযেছিল! আর তার জেদের জন্তেই সংসারের ঘাটে ঘাটে ঘা

খাওয়া হতভাগিনী মেয়েগুলো আবার এক সর্বনাশের ভেতরে পড়বে। তাই অস্ফুটস্বরে বলল সাহেবপুঁটি, আমি যাবো মাসী—যাবো—তোমার কথা—তীব্র কান্নার ভেতরে তার কথাগুলো তলিয়ে গেল!

ছয়মাস পর।

উইলিয়ম ম্যারিয়েটের ডিঙ্গাভাঙ্গা খালের অর্থাৎ ক্রীক রোর সেই বাংলো বাড়িতে আর চাবুকের শব্দ শোনা যায় না। শোনা যায় না সাহেবের ক্রুদ্ধ কণ্ঠের সেই হিন্দী ইংরাজী বাংলা মেশানো অশ্রাব্য গালাগাল। এখন সেই বাড়িতে সন্ধ্যাসমাগমে শাঁখ বাজে। আর ভোরের নিস্তব্ধতাকে সচকিত করে আরতির ঘণ্টাধ্বনি বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে দূরে মিলিয়ে যায়। পাড়া-প্রতিবেশীরা ফিস ফিস করে বলে, বেশ্যা মাগীটার পাল্লায় পড়ে সাহেবটা বোষ্টম হয়ে গিয়েছে রে—

সত্যিই সাহেবপুঁটির সান্নিধ্যে ভানুমতীর কুহকের মত ম্যারিয়েট সাহেবের আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছিল। প্রথম রাত্রিযাপনের পরই ম্যারিয়েটের মনে হয়েছিল—মনে হয়েছিল সে যেন জীবনের একটা নতুন স্বাদ খুঁজে পেয়েছে। বিচিত্র একটা প্রশান্তিতে ভরে গিয়েছিল তার মন। মধুপানে পরিতৃপ্ত মৌমাছির মত তার কানের কাছে গুন গুন করে বলেছিল আমাকে ছেড়ে যাবে না পুঁটি—

শোন সাহেব, আমি তোমার কাছে বাঁধা হয়ে থাকতে পারি—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—তুমি গয়না নেবে তো। সুন্দরী আমি তোমার সারা গা—

গয়না! তীব্রকণ্ঠে বলল পুঁটি, কে তোমার গয়না চায়—

তাহলে? বিস্মিতআর মুগ্ধ চোখে পুঁটির প্রতিমার মত সুন্দর আর সুডৌল মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ম্যারিয়েট। পরম আদরে পুঁটির সেই দীপ্ত যৌবন-পুষ্ট তন্বী দেহবল্লরীকে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, ডার্লিং,—কি করতে হবে বলো—তোমার জন্য আমি সব—সব করতে পারি—

কোন কথা বলল না পুঁটি। তার চোখের দৃষ্টি কেমন সুদূর হয়ে উঠল। যেন অনেক—অনেকদূর থেকে সে বলল, তুমি তো জানো না—কালীঘাটে মা-কে দর্শন করবো আর গঙ্গাস্নান করবো এই লোভেই একদিন ঘর ছেড়েছিলাম, একটু থেমে বলল, রোজ ভোরে আমাকে গঙ্গায় ডুবিয়ে স্নান করার ব্যবস্থা করে দিতে হবে—

নিশ্চয়ই দেব—

আর পোস্তার রথযাত্রায় কালাজমিদার গোবিন্দ মিত্তিরের আর জয় মিত্তিরের বাড়ির দুগ্গাপুজোয় আহীরিটোলার নিমু গোঁসাইয়ের বলরামের রাসযাত্রায়—মোটের ওপর শহর কলকাতার প্রত্যেক পালে পার্বণে—

আমি তোমাকে নিজে নিয়ে যাবো ডার্লিং—

সাহেবপুঁটি।

উইলিয়ম ম্যারিয়েট।

উনিশ শতকের চারের দশকের শহর কলকাতার প্রধান আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। কেন হবে না?

উইলিয়ম ম্যারিয়েট সাহেবপুঁটির প্রভাবে পুরো নেটিব হয়ে গিয়েছিল। জানবাজারের মাড়েদের কি গরাণহাটার লালাবাবুদের সেই সুদৃশ্য পতাকা ঝালরওয়ালা ছাতা বড় বড় হাত পাখা আর কাপড়ের মশাল, নারিকেল শাঁসের মশাল দিয়ে সাজানো রথের দড়ি ধরে টানতো। জয়রাম মিত্তির বাড়ির বিখ্যাত দুর্গাপূজার মহানবমীর দিনে বলির রক্ত গায়ে মেখে মহাউল্লাসে নেটিবদের সঙ্গে নৃত্য করতো; গঙ্গাস্নান করতে যেত জন্মাষ্টমীর দিনে দধি আর কাদা সর্বাঙ্গে মেখে। চৈত্রমাসে নিমু গোঁসাইয়ের বলরামের রাসযাত্রার সারারাত জেগে কবিগান শুনতো।

শুধু তাই নয়।

সাহেবপুঁটিকে সঙ্গে করে কালীঘাটে গিয়ে তার প্রাইভেট ট্রেডে আরও লাভের আশায় মানত করতো। কালীশঙ্কর ঘোষের বাড়ির তান্ত্রিকমতে শ্যামাপূজায় একান্ত ভক্তদের মত সারাদিন উপোষ করে থেকে শেষরাতে কারণ-বারি আর মহাপ্রসাদ খেত! তাকে লক্ষ্য করে তখনকার দিনের বিখ্যাত কাগজ বেঙ্গল হারুকুরু লিখল—William Marriot is the finest example of cultural contact between east and west...

তিন তিনটি গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত সাহেবপুঁটির জীবনে যেন সুখস্বপ্নের মত কেটে গেল। কিন্তু—

নির্মল আকাশে একটু একটু করে মেঘ জমতে লাগল। প্রথম প্রথম নতুনত্বের স্বাদে এবং সাহেবপুঁটিকে হয়তো খুশী করার জন্যেই ম্যারিয়েট চড়কের গাজনে সন্ন্যাসী সেজে ভক্তদের সঙ্গে নাচতো অর্থাৎ তাদের ভাষায় 'সুপারষ্টিশাচ' ডার্টি প্যাগানদের মত আচরণ করতো! সে-সবের আড়ালে

তার কোন অন্তরের প্রেরণা ছিল না। তাই একটু একটু করে তার নেশা কেটে যেতে লাগল।

কি গো এখন বেরুচ্ছো ?

কেন ? সবসময়ই তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি ? অভিমানে ভারী হয়ে ওঠে সাহেবপুঁটির মুখ। অস্ফুটস্বরে বলে, তুমি যেন আজকাল কেমন হয়ে যাচ্ছো গো। একটু থেমে আবার ম্যারিয়েটের হাতদুটো জড়িয়ে ধরে বলে, আজ আমাকে নিয়ে দর্জীপাড়ার কবরেজ রামকমল সেনের বাড়ির জগদ্ধাত্রীপুজো দেখতে যাওয়ার কথা ছিল না ?

পালকী রেডী আছে তুমি যাও। আমার কাজ আছে—বলেই বেরিয়ে গেল ম্যারিয়েট। তার ভারী জুতোর মস মস আওয়াজটা সাহেবপুঁটির বুকের ভেতরে বাজতে লাগল।

সাহেবপুঁটি আর ম্যারিয়েট।

দুজনে যেন দুর দুটো গ্রহ। সাহেপুঁটি থাকে তার পূজাঅর্চনা আর গঙ্গা-স্নান নিয়ে। আর ম্যারিয়েট সারাদিন কাজের ছুতো নিয়ে বাইরে বাইরে থাকে। সন্ধ্যায় হারমনিক ট্যাভার্ণে প্রচুর পরিমাণে মদ খেয়ে বেহেড মাতাল হয়ে অনেকরাত্রে কুঠিতে ফিরে এসেই মত্ত পশুর মত সাহেবপুঁটির দেহটাকে উপভোগ করে।

কিন্তু তারপরেই সাহেবপুঁটি যেই আব্দার করে কোন কথা বলতে যায় অমনি খেঁকিয়ে ওঠে ম্যারিযেট। বলে, জেনে রাখবে, তুমি একটা নেটিব 'কন্কুবাইন' ছাড়া আর কিছু নও—

এখানে উল্লেখযোগ্য, উইলিয়ম ম্যারিয়েটকে কোম্পানী ইতিমধ্যে জুনিযর থেকে সিনিয়র মার্চেন্টে প্রমোশন দিয়ে তার ওপরে জমিদারী বিলি ব্যবস্থার ভার দিয়েছিল। দেশীয় জমিদাররা তাদের জমিদারী রাখার জন্ত প্রচুর পরিমাণে উৎকোচ আর উপঢৌকন দিত। যেমন বর্ধমানের জমিদারকে খনি থেকে কয়লা তোলার সুযোগসুবিধা তথা অনুমতির বিনিময়ে ম্যারিয়েট ২৮ হাজার টাকা ঘুস নিয়েছিল। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের রেকর্ডসে আছে তার উৎকোচ গ্রহণের আরও কত দৃষ্টান্ত।

একদিন ভরদুপুরে উইলিয়ম ম্যারিয়েট সাহেবের ডিঙ্গাভাঙ্গা খালের বাংলো বাড়িতে এল এক ব্রাহ্মণ বিধবা মহিলা ! রাজেন্দ্রানীর মত তার রূপ। কোন ভূমিকা না করেই সাহেবপুঁটির হাতদুটো জড়িয়ে ধরে করুণকণ্ঠে বলল, ভাই,

একটি শিশুসন্তান ছাড়া আমার আর কেউ নেই, একটু থেমে কান্না অবরুদ্ধ গলায় আবার বলল, টাকীতে আমার স্বামীর একটা ছোট জমিদারী আছে। বছরে ষাট হাজার টাকার মত তার আয়—

সাহেবপুঁটি তার হাতটা ছাড়িয়ে নিল। হাজার হোক ব্রাহ্মণের বিধবা আর সে একটা বেশ্যা! নরম গলায় বলল, বলুন, আমি আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি—

তোমার সাহেব বলেছে, ত্রিশহাজার টাকা ঘুস না দিলে কোন নাবালকের নামে জমিদারী দেবে না—বলতে বলতে সেই বিধবা মহিলার চোখদুটো জলে ভরে এল।

আমি বলবো—যথাসাধ্য চেষ্টা করবো, দিদি—

রাধামাধব তোমার মঙ্গল করবেন ভাই, সাহেবপুঁটির মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে চলে গেল টাকীর জমিদারিণী।

যথারীতি নিশিরাতে মাতাল হয়ে কুঠিতে এল ম্যারিয়েট সাহেব। সাহেবপুঁটিকে নিয়ে যেই নিত্যদিনের মত তার লালসা চরিতার্থ করতে গেল অমনি নেটিব কঙ্কবাইন ক্রুদ্ধ সাপিনীর মত ফুঁসে উঠে বলল, তুমি টাকীর জমিদার বিধবা ভদ্রমহিলার কাছ থেকে ত্রিশহাজার টাকা ঘুস চেয়েছো কেন? একটু থেমে ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে বলল, ছিঃ ছিঃ তোমার এত আছে—তাও তুমি টাকার লোভে একটা অনাথা স্ত্রীলোকের এতবড় সর্বনাশ করছো—

কী! ম্যারিয়েটের নেশার মিষ্টি মৌতাতের আচ্ছন্নতা কেটে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে আহত বাঘের মত গর্জন করে বলল, তুমি একটা কেপ্ট হয়ে তোমার এত বড স্পর্ধা—

আমি জানি সাহেব আমি একটা কেপ্ট বা কঙ্কবাইন; না কি যেন বলো তোমরা—তার মানে তোমার ভোগের জিনিস, কান্নায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল সাহেবপুঁটি, কিন্তু আমি যে তোমাকে অনেক—অনেক বড় করতে চেয়েছিলাম সাহেব—একটু থামল সে। বুকের পাঁজর বিদীর্ণ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার অস্ফুটকণ্ঠে যেন একটা দুঃস্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করে বলল, দেবদ্বিজে তোমার ভক্তি দেখে আমি যে বড় আশা করেছিলাম এদেশের আর পাঁচটা সাহেবের মত তুমি উচ্ছৃঙ্খল, বিলাসী, অত্যাচারী না হয়ে তুমি হবে অনেক মহৎ, উদার আর ধর্মপরায়ণ—শেষের দিকের কথাগুলো কান্নার ভেতরে তলিয়ে গেল। জলভরা দুটো চোখের করুণ দৃষ্টি ম্যারিয়েটের

মুখের ওপর রেখে বলল, আর যাই করো—বিধবার সর্বনাশ করো না—

একটা কথাও বলল না উইলিয়ম ম্যারিয়েট।

অদ্ভুত একটা বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সাহেবপুঁটির দিকে। সে দৃষ্টিতে ছিল আক্রোশ, ছিল ঘৃণা আর ছিল হীন কুটিলতা। সর্বনাশা কোন ধূর্ত অভিসন্ধির হাসি তীক্ষ্ণধার ছবির মত ঝিকমিক করতে লাগল তার ভারী আর মাংসল মুখের রেখায় রেখায়। কেমন জড়িত কণ্ঠে শুধু বলল, আমার সব কাজে ইণ্টারফিয়ার করার জন্য—বাজারের একটা প্রস্টিটিউট হয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করার জন্য এমন এমন পানিশমেণ্ট তুমি পাবে যা সারা জীবনেও তুমি ভুলতে পারবে না—বলেই মধ্যরাত্রেই সেই যে বেরিয়ে গেল ম্যারিয়েট আর এল না।

এল না পরদিনও।

হয়তো কোন ট্যাভার্ণে কি হোটেলে আছে মনে করে সাহেবপুঁটি প্রধান খিদমৎগারকে বলল, তুমি পালকী রেডি করতে বলো—আমি সাহেবকে খুঁজতে যাবো—

আপনার বাইরে যেতে নিষেধ আছে মেমসাহেব—

ধক্ করে উঠল সাহেবপুঁটির বুকের ভেতরটা। তাকে বন্দী করে রেখে গেল কোথায় ম্যারিয়েট। খিদমৎগার, খানসামা, বাবুর্চি, হুঁকোবরদার থেকে শুরু করে চাপরাশি, দারোয়ান, পালকীবেয়ারা, কোচওয়ানদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করল—সাহেব কোথায় গিয়েছে তোমরা জানো ?

তারা মাথা নাড়ল।

দিন কাটে।

ঝড়ের পূর্বাভাসের মত থম থম করে ডিঙ্গাভাঙ্গা খালের বাংলো বাড়িটা। সাহেবপুঁটি লক্ষ্য করল, খানসামা, খিদমৎগারের ভেতরে কিসের যেন গুঞ্জন চলছে।

যেদিন সকালে উঠে সাহেবপুঁটি দেখল, সমস্ত বাড়িটা অভিশপ্ত পোড়ো কোন বাড়ির মত খাঁ খাঁ করছে আর ভেতরের ও বাইরের মোট আঠাশটি ভৃত্যের একজনও নেই। এমন কি তার আয়াটা পর্যন্ত নেই। শুধু তাকে পাহারা দেওয়ার জন্যই বোধ হয় হিন্দুস্থানী দারোয়ানটা আছে গেটে। সেইদিনই দুপুরে ঘোড়ার খুরে খুরে খট্-খট্ শব্দে সর্বনাশের করতাল বাজিয়ে এল দশকুকারের একটা ব্রুহাম গাড়ি। নামল এক খানদানী সাহেব।

টমাস হেঞ্চম্যান। কোম্পানীর সিনিয়ার মার্চেন্ট এবং কলকাতা রেভিনিউ কমিটির চীফ! দারোয়ানকে একটা হলদে রঙের কাগজ দেখিয়ে কি যেন বলেই মস মস শব্দ তুলে এল সাহেবপুঁটির ঘরে—

কে আপনি? ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল সাহেবপুঁটি!

ভয় পেও না নেটিব সুন্দরী—আমি তোমার মাষ্টার মানে প্রভু—প্রভু—বলেই হেঞ্চম্যান সেই হলদেটে কাগজ আর বাংলো ক্রয়ের কবলাটা তাকে দেখালো। সে সব ইংরেজীতে লেখা। সাহেবপুঁটি একবর্ণও বুঝল না। কেমন অসহায় আর দিশেহারা দৃষ্টিতে সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সেই হলদেটে কাগজটা আর কিছুই নয়—উইলিয়ম ম্যারিয়েটের প্রদত্ত তার ডিঙ্গাভাঙ্গা খালের এই বাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন—তাতে লেখাছিল—

A garden house and ground situate at Dingabhanga khal near Taltola Bazar, equipped with a very beautiful and young maid slave, will of course, be found a most desirable purchase—

হেঞ্চম্যান বুঝিয়ে বলল পুঁটিকে—তোমার ম্যারিয়েট সাহেব এই বাড়িটার সঙ্গে তোমাকেও আমার কাছে বিক্রি করে গিয়েছে ডালিং—

তুমি—তুমি আমার মেড স্লেভ বা কঙ্কুবাইন—

মেডস্লেভ! দুহাতে বুক চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল সাহেবপুঁটি। তার সেই করুণ বুকফাটা আর্তনাদে নিস্তব্ধ বাড়িটা যেন আড়ষ্ঠ ব্যথায় শিউরে উঠল।

চতুর্দশ স্তবক

কলকাতা শহর হয়ে উঠেছিল বেশ্যাশহর। বেশ্যাবাজী বড়মানুষদের এলবাত পোশাকের মত গণ্য হলো। সেই প্রবল বেশ্যা-আসক্তিরই ভয়াবহ করুণ পরিণতি—

নগরসুন্দরী।

বারবিলাসিনীদের ইতিহাস হবে যাবে অসম্পূর্ণ যদি উল্লেখ না করা হয় আঠারো কি উনিশ শতকের কলকাতার বাবুদের গণিকাদের প্রতি তীব্র আসক্তির বিচিত্র সেই ইতিবৃত্ত।

বাবুদের বেশ্যা এবং বাঈজী সংসর্গ রীতিমত একটা কালচারের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে গিয়েছিল। তাই শহর কলকাতায় প্রাচীন ইতিহাসের গবেষকরা বলেছেন—গণিকাচর্চা হলো বাবু কালচারেরই একটা অঙ্গ—

কিন্তু কারা এই বাবু? (১)

পলাশীর যুদ্ধের আগে থেকে শহর কলকাতা বিরাট ব্যবসাকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বসাকরা ব্যবসা করে বড়লোক হওয়ার আশায় হুগলী পেরিয়ে সপ্তগ্রাম থেকে যে শেঠ-বসাকরা সুতানটিতে চলে এসেছিল, তারা দেওয়ানি, বেনিয়ানি, দালালি এবং নানাবিধ ব্যবসা করে এত বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেছিল যে তারা ইংরেজদের টাকাও ধার দিত অর্থাৎ ব্যাঙ্কারের কাজ করতো। বিপুল বিত্তের জোরেই যে তারা শহর কলকাতার জনজীবন নিয়ন্ত্রিত করতো প্রাচীন-দিনের এক অজ্ঞাত ছড়াদারের ছড়ার ভেতরে তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে—

বনমালী সরকারের বাড়ি।
গোবিন্দরামের ছড়ি।
নকুধরের কড়ি॥
উমিচাঁদের দাড়ি॥

এই নিয়ে কলকাতার যত জারিজুরী।

কুমোরটুলীর ধনকুবের বনমালী সরকার, ইংরেজ জমিদারের নায়েব অথবা ডেপুটি জমিদার ইংরেজদের ভাষায় 'ব্ল্যাক ডেপুটি জমিদার' গোবিন্দরাম মিত্র, কর্ণেল ক্লাইভ এবং অন্যান্য গভর্ণরদের বানিয়া (বেনিয়া বা ব্যাংকার) লক্ষ্মীকান্ত ধর ওরফে নকুধর ইত্যাদি এইসব কৃতী এবং অসাধারণ বিত্তবান ব্যবসায়ীদের বংশ থেকেই 'বাবু'দের উদ্ভব। বলাবাহুল্য, এদের অগাধ অর্থের প্রাচুর্যের হাত ধরে অনিবার্যভাবে এসেছিল উৎকট আমোদ-প্রমোদ, বিলাসীতা; এসেছিল

(১) টাউন কলকাতার কড়চা—বিনয় ঘোষ—পৃঃ-৭৬

ব্যভিচার আর উচ্ছৃঙ্খলতা! এদের লক্ষ্য করেই স্বয়ং বিশ্বনাথ শাস্ত্রী মশাই লিখলেন (২)

বাবুমহাশয়েরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণা প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি গান, ফুল আখড়াই, হাফ আখড়াই পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রিকালে বারাঙ্গনাদিগের গৃহে গৃহে গীতবাদ্য ও আমোদ-প্রমোদ করিযা কাল কাটাইত এবং খড়দহের ও ঘোষপাড়ার মেলা এবং মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে সঙ্গে লইযা দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত......

এই সময়ে বাঈজী আর গণিকাদের আদর বেড়ে গিয়েছিল হু হু করে। কে কত বেশি সুন্দরী আর গুণী বাঈজীকে রক্ষিতা করিতে পারে তাই নিয়ে বাবুতে বাবুতে চলতো প্রচণ্ড প্রতিযোগীতা। বাবুরা অপরিমিত অর্থব্যয়ে দেশদেশান্তর থেকে আনতো নৃত্যগীত পটিয়সী বারাঙ্গনা।

এই গণিকাচর্চার ব্যাপারে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন 'তনুবাবু'। পুরো নাম রামতনু দত্ত। হাটখোলার ধনীব্যবসাযী, লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক মদনমোহন দত্তের ছেলে। এই তনুবাবুর বিলাসের সহচরী ছিল লক্ষ্ণৌয়ের বাঈজী থেকে শুরু করে শত শত ইউরোপীয় আর্মেনীয় পর্তুগীজ বারাঙ্গনা। সেই জোড়াবাগান পার্কের দক্ষিণ দিকে (এখন যেখানে বস্তি) সেইখানে তনুবাবু তার শ্বেতাঙ্গিনী রক্ষিতাদের প্রত্যেকের জন্য বাংলো বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলেন।

অভিনব ছিল সেই বিলাসিনীদের প্রমোদ ভবনের [illegible]ন! শনের খড দিয়ে ছাওয়ানো চাল। সেগুন কাঠের দেওয়াল। কোন দেওয়ালের আকাশী নীলরঙের পটভূমিতে আঁকা নিবিড় কুঞ্জবনের স্নিগ্ধ ছায়াভাস; আবার কোন বাড়ির রং সবুজ তার ওপর লতাবিতানের সুদৃশ্য কারুকার্য— প্রত্যেকটি বাংলোকে দূর থেকে মনে হতো যেন লাল নীল সবুজ রঙের এক একটা সুন্দর পাখি—যে কোন মুহূর্তে ডানা মেলে উড়ে চলে যেতে পারে বিপুলব্যপ্ত আকাশে!

সে যুগে আটফুকারের ল্যাণ্ডো কি ব্রুহাম গাড়ি, ওয়েলার ঘোড়া যেমন ছিল বিলাসীবাবুদের আভিজাত্যের নিদর্শন তেমনি রূপসী নৃত্যগীত নিপুণা বারাঙ্গনা বা বাঈজী পোষা ছিল বাবুদের সম্মান প্রতিপত্তি অর্থাৎ প্রেস্টিজের

(২) আত্মচরিত শিবনাথ শাস্ত্রী—দ্রষ্টব্য

পরিচায়ক। সুন্দরী বিদেশিনী বারাঙ্গনাদের রক্ষিতা করে রাখার ব্যাপারে অগ্রগণ্য ছিলেন তনুবাবু। সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। তাই লোকে ছড়া কাটতো—

বাবু তো বাবু তনুবাবু।
কলকাতাতে বাড়ি।

এই তনুবাবুর দুটো চোখ যে শুধু অন্বেষণ করে বেড়াতো সুযৌবনা সুখ সহচরী তা নয়, তার সৌখীনতাও ছিল মোগল বাদশাদের তুল্য। সুগন্ধের প্রতি তার অনুরাগ ছিল প্রবল। জোড়াবাগানে তার রক্ষিতাদের সুদৃশ্য নিকেতনগুলোর মেঝে প্রতিদিন সুগন্ধী আতর দিয়ে ধোয়া মোছা হতো। আর তার দশফুকারের বারুচ-ল্যাণ্ডোলেট কি আটফুকারের চ্যারিয়ট গাড়ির ঘোড়াগুলোর উৎকট দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারতো না তনুবাবু, তাই নিয়মিত ঘোড়াগুলোর গায়ে তীব্র সুগন্ধী বিলেতী আতর মাখানো হতো।

তনুবাবুর সহচরীদের প্রমোদ ভবনের শয়নমন্দিরে থাকতো ল্যাভেণ্ডারের শিশি। স্নান ঘরে শোভা পেত গসনেলের সাবান। আর বাবুমহাশয় অভিসারে এসে বারবিলাসিনীকে নিয়ে শয্যায় যাওয়ার পূর্বে যে কোচে বসতো তার নাম ক্লিওপেট্রা কোচ! কাশ্মিরী গালিচায় নয়, ঘরের মেঝে মোড়া থাকতো ফরাসী কার্পেট দিয়ে। আর রাতের অন্ধকারে সেই বেশ্যানিকেতনগুলো ঝলমল করতো অসলারের ঝাড়বাতিতে। (৩)

শুধু তনুবাবু নয়। আরও সাতবাবু ছিলেন। তাদেরও বিলাসীতা আর প্রবল বেশ্যা আশক্তি ছিল কিংবদন্তীর মত। ক্লাইভের দেওয়ান রাজা নবকৃষ্ণের ছেলে রাজকৃষ্ণ, বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের উর্দ্ধতন পুরুষ হুইলার সাহেবের দেওয়ান, অগাধ বিত্তশালী দর্পনারায়ণ ঠাকুর, নকুধরের দৌহিত্র রাজা সুখময়, কোম্পানীর রসদের ঠিকাদার লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক গোকুলচন্দ্র মিত্র, পাটনার চীফ মিঃ মিড্লটন ও স্যার টমাস রামবোল্ড সাহেবের দেওয়ান জোড়াসাঁকোর ছাতুসিংহ, বিখ্যাত জমিদার নীলমনি হালদার, আর চোর-বাগানের মিত্তির বাড়ির জেষ্ঠ্য পুত্র। প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়ের লেখক শেঠ বলছেন (৪)। বাবুদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজেকে অন্য বাবুদের অধিকতর অমিতব্যয়ী প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন......এই বাবুরা

(৩) Foreign Department Miscellaneous Records S. No 131

(৪) প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়, হরিহর শেঠ—৫৮৩-৮৪

স্বর্ণ রৌপ্য ভিন্ন পিতল কাঁসার তৈজসাদি ব্যবহার করিত না......

বাবুরা অভিসারে যেতেন তাদের রাঁড়ের কাছে ছয় ঋতুতে ছয় রকম পোষাক পরে। বসন্ত কালে অঙ্গে চাপাতেন হলুদ রঙের চাপকান জরির টুপি দিতেন মাথায় আর যদি তার বিলাসের সহচরীটি লক্ষ্ণৌয়ের খানদানী বাঈজী হতো—তাহলে পরতেন লক্ষ্ণৌ ফ্যাশানের চুড়িদার পায়জামা, গায়ে রামজামা, কোমরে দোপাট্টা আর মাথায় থাকতো বাঁকা টুপী।

হুতোম বলেছেন আবার তাদের কেউ কেউ বারাঙ্গনা গৃহে গমনের সময় পরতেন—ইংরেজ জুতা, শান্তিপুরী ডুরে উড়নী আর সীমলের ধুতি—

হুতোমে যেমন পাওয়া যায় বাবুদের বিচিত্র বিলাসীতা এবং তাদের পোষাক আসাকের কথা তেমনি নব বিবি বিলাসে(৫)পাওয়া যায় বাবু .গৌরবের সেই কলকাতার বারাঙ্গনাদের সাজপোষাক এবং বিচিত্র আচরণের বিশদ ইতিবৃত্ত। নগরসুন্দরীদের ইতিহাসে, বলাবাহুল্য সে-সবও উল্লেখযোগ্য বলেই এখানে সংক্ষেপে বলা হলো—

"কলিকাতার রাঁড়মহলে হিন্দুবিবিরা মুছলমানীর চলন বলন সকল ধরিত। তাহারা পছন্দমত চুল কাটিয়া জুলপী বাহির করেন এ ং মেশী দাঁতে দিয়া দোকের করিয়া কাপড় পরিয়া পাছার বাহার দেখান এবং আপন পছন্দ মত পোষাক বিবিধ প্রকার প্রস্তুত করে যথা পাজামা, আঙ্গিয়া, কুরতি দোপাট্টা আস্তিন, জালি কুরতি,কাটোয়া জালি এবং আন্নিদার জোড়া ·তদ্ভিন্ন রং সাফ হইবার জন্ত সাবান ও বটান মাখিয়া টিপটাপ করিয়া ছাতের উপরে ডিলডোল দেখাইয়া বেড়ান! কেহ কেহ সার্টিনের পায়জাম' গোটা বন্নট লাগান, আঙ্গিয়া তদুপযুক্ত, কুরতি পাঠ দোপাট্টা,কেহ পায়জামা প্রভৃতি সকলি সাদা কাপড় পরে এবং বাঙ্গালি রকম পোষাক কেহ কেহ ঢাকাই ধুতি কল্‌-কাদার, কেহ বা রঙিন থানচেরা বসমাদার, কেহবা দেশী ধুতি বিবিধ প্রকার পাড়িদার অর্থাৎ তাবিজপেড়ে, মরিচপেড়ে, কস্তাপেড়ে, ভোমরাপেড়ে, কোকিলপেড়ে, দাঁতেমেশীপেড়ে, ঠোঁটে হাসিপেড়ে, হাতিপেড়ে, মহারাষ্ট্র পেড়ে, কুঁচপেড়ে, দোরাখাপেড়ে, সৌরপেড়ে, সখীপেড়ে, রুমালপেড়ে, খড়কে পেড়ে, এবং আহ্লাদে প্রহ্লাদে রাজাপেড়ে ইত্যাদি।

রাঁড়েরা যেসব অলঙ্কার পরে দিবাবসানে বাবুগণের মনোমীন ধরিবার নিমিত্ত ছাত হইতে টোপ ফেলিত তার তালিকা—মুড়কি মাদুলি, ধানি মাদুলি

(৫) নব বিবিবিলাস—ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৪৫

সোনালি, পৈঁচে, তাবিজ, স্বর্ণ পঞ্চনরি, পাসা, ঝুমকা, দমদম, গৌদানি, বোল্দা দোলড়া, ছলনা, মুক্তার লচ্ছা দেওয়া কর্ণফুল, কানবালা, হীরাপান্না, ধুকধুকি, মুক্তার সাতনরি, ডায়মনকাটা চিক তাবিজ, বাজু. হাতের কড়া স্বর্ণ গোট, চাবির শিকলি, চন্দ্রহার, গোলমল, পাঁওজর ইত্যাদি নানাস্থানে নানা অলঙ্কার যেমন সাজে তাহাই বিবেচনা মতে পরিয়া থাকেন রাঁড়েরা…

সালঙ্করা এইসব বারবিলাসিনীদের কাছে সন্ধ্যাসমাগমে অভিসারে যাওয়ার অপরূপ ছবিও এঁকেছেন হুতোম—(৬) "শহরে সন্ধ্যাসূচক কাঁশর ঘণ্টার শব্দ থামলো—সকল পথের সমুদয় আলো জ্বালা হয়েছে। 'বেলফুল', 'বরফ', 'মালাই' চিৎকার শোনা যাচ্ছে। ক্রমে অন্ধকার গা ঢাকা হয়ে এল। এসময় ছোটলোক ভদ্দরলোক আর চেনার যো নেই! তুখোর ইয়ারের দল, হাসিরগর্‌রা ও ইংরাজী কথার ফর্‌রার সঙ্গে বেশ্যাদের দরজায় দরজায় ঢু মেরে বেড়াচ্ছে—

আর বাবুরা তাদের রাঁড়েদের বাড়িতে যেতেন কিসে? তা'ও বলতে বাকি রাখেননি হুতোম (৭) শহরের বাবুরা ফেটিং, সেলফ ড্রাইভিং বগী ও ব্রাউহামে (ব্রুহাম) করে অবস্থাগত ফ্রেণ্ড, ভদ্রলোক বা মোসাহেব নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন বা বাগানে যেতেন।

বিলাসী এই বাবুদের ভেতরে দুইরকমের আচরণ দেখা যেত। বেশ্যাবাড়ি যাচ্ছে পাছে লোকে জানতে পারে এই ভয়ে কেউ সে গাড়ির সহিস, কোঁচম্যানকে তকমা নিতে বারণ করতো। আবার আর একদল লোক বাবুগিরি জ্ঞান করে বেশ্যাবাজীকে বাহাদুরীর কাজ মনে করতো—

দেড়শো বছর আগের কলকাতার বেশ্যা অধ্যুষিত অঞ্চলের নামও পাওয়া যায় ইতিহাসে (৮) মেছোবাজারের হাঁড়িহাটা, চোরবাগানের মোড় জোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকানের আশপাশের অঞ্চল, নতুনবাজার, বটতলা সোনাগাছির গলি, আহেরীটোলার চৌমাথা—সন্ধ্যাবেলায় এইসব অঞ্চল লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত। কামুকীরা কেউ মুখে মাথায় চাদর জড়িয়ে ঘুর ঘুর করতো বারবধূদের দুয়ারে দুয়ারে, মনে কচ্ছেন—কেউ তাকে চিনতে পারবেনা। আবার অনেকে চেঁচিয়ে কথা কয়ে, কেশে, হেঁচে—লোককে জানান দিচ্ছে যে, তিনি সন্ধ্যার পর দুদণ্ড আয়েস করে থাকেন

---

(৬) হুতোম প্যাঁচার নকসা—হুতোম (কালীপ্রসন্ন সিংহ) প্রণীত—পৃঃ-৪
(৭) ঐ ঐ পৃঃ-৫
(৮) ঐ ঐ পৃঃ-৫-৬

উনিশশতকের বিশ দশকের সেই বাবু-গৌরবের কলকাতায় রাজারাজড়া রাত্রে কখনও বিয়ে করা স্ত্রীর মুখ দেখত না! কোন কোন বুদ্ধিমান বিলাসী পুরুষের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের কথাও লিখেছেন হুতোম (৯)। বাড়ির প্রধান আমলা দেওয়ান, মুচ্ছুদ্দি যেমন হুজুরের হয়ে বাবুদের বিষয়কর্ম ভাখেন—স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাঁদের উপর আইনমত বর্তায়—সুতরাং তারা ছাড়বেন কেন?

এই ভয়ে কোন বুদ্ধিমান স্ত্রীকে বাড়ির ভেতরের ঘরে পুরে চাবি বন্ধ করে বাইরের বৈঠকখানায় সারা রাত্তির রাঁড় নিয়ে আমোদ করেন। তোপ পড়ে গেলে ফরসা হওয়ার পূর্বে গাড়ি বা পালকী করে বিবিসাহেব বিদায় হন—বাবু বাড়ির ভেতরে গিয়ে শয়ন করেন। স্ত্রীও চাবি হতে পরিত্রাণ পায়।

আবার নবীন বয়সের কোন কোন বাবু মা-বাবাকে এড়িয়ে বেশ্যাসংসর্গ করার যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি সর্বনাশা চিত্র পাওয়া যায় শহর কলকাতার প্রাচীন ইতিহাসে—(১০)

ছোকরাগোছের কোন কোন বাবুরা বাপ-মার ভয়ে আপনার শোবার ঘরে একজন চাকর বা বেয়ারাকে শুতে বলে আপনি বেরিয়ে যান। স্ত্রী তুলসী-পাতা ব্যবহার করে খাটে শুয়ে থাকে চাকর দরজায় খিল দিয়ে মেজের শুয়ে থাকে; মধ্যরাত্রি কেটে গেলে বাবু আমোদ লুটে ফেরেন—ও বাড়িতে এলে চুপি চুপি শোবার ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বেরিয়ে যায়। বাবু শয়ন করেন—বাড়ির কেউ-ই টের পায় না, বাবু রাত্তিরে ঘরে থাকেন না—এদের সম্বন্ধে হুতোমের মর্মান্তিক খেদোক্তি উল্লেখযোগ্য— পাঠকগণ ছেলে-বেলা থেকে ধর্ম যে কার নাম তা শোনেনি, হিতাহিত বিবেচনার সঙ্গে যাদের সুদূর সম্পর্ক, কতগুলো হতভাগা মোসাহেবই যাদের হাল, তারা যে এইরকম পশুবৎ কদাচারে রত থাকবে—এ বড় আশ্চর্য নয়। হুতোমের এই কথাগুলোর ভেতরে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, বাবুদের গণিকার্চ্চার সর্বনাশা পরিণতি—স্ত্রীকে চাকরের কাছে উৎসর্গ করে তারা বেশ্যাবাজী বজায় রাখতেন—

দেড়শো বছর আগে শহর কলকাতার শুধু বাবুদের জীবন যাত্রাই যে দুর্নীতি আর ব্যভিচারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল তা নয়। বাবু-কলকাতার নগর সুন্দরীদের জীবনধারার মানও যে কেন অত্য* নেমে গিয়েছিল,তারা শুধুই কেন

(৯) হুতোম প্যাঁচার নকসা—হুতোম প্রণীত—পৃঃ-১১৩

(১০) ঐ —পৃঃ-১১৩-১১৪

বাবুদের ভোগের উপকরণ হয়ে গিয়েছিল তারও আভাস আছে তদানীন্তন কালের বেশ্যাসংবাদের আকরগ্রন্থে যার নাম পত্রেই আছে নববিবিবিলাস অর্থাৎ কুলটাবন্ধে কুলকামিনীর দুঃখপ্রকাশ যথা অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী মধ্যে ভবতি কুট্টিনী সর্বশেষে সর্বনাশে সারং ভবতি টুক্‌কনী।

যে নগরসুন্দরীদের সামাজিক মর্যাদা ছিল শীর্ষস্থানীয়, যাদের ভেতরে কেউ ছিল ভরতের নাট্যশাস্ত্রে পারদর্শী, কেউ ছিল মুরজ, মুরলী আর বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে পারঙ্গমা, সেই মন্দার কি প্রখর বুদ্ধিশালিনী সুলসা, আয়ুর্বেদবিশেষজ্ঞা শালবতী যাদের কথা আগে বলা হয়েছে তাদেরই উত্তরসূরীরা হয়ে গেল রাঁড —হয়ে গেল বাজারের বেশ্যা। কেন ?

কেন হবে না ? বেশ্যাবৃত্তির ভেতরে তার ব্যবসাগত দিকটাই প্রবল হয়ে উঠল কেন তার আভাস পাওয়া যাবে এই আলোচ্য কালের এক বৃদ্ধ বারাঙ্গনার নবীনা এক রূপোপসারিনীর প্রতি উপদেশের বিচিত্র কথাগুলোর ভেতরে—শোন বাছা, প্রাচীন সংগ্রহকারের সংগৃহীত বচন—আছে একটা—

কসবী কেসকি জরু আর ভেড়ুয়া কেসকা শালা।

অর্থাৎ বেশ্যা—বেশ্যাই—বেশ্যা কার স্ত্রী হয়, আর বেশ্যার ভাই বা কার সম্বন্ধী হয়—বাছা আমাদিগের প্রেম যাহা হইতে অধিক টাকা পাওযা যায় তাহাদিগেরই সহিত প্রেম হয়···সব কোর্টের বড় বড় কোর্ট যেমন সুপ্রেম কোর্ট তেমনি আমারদিগের সুপ্রেম কোর্ট হলো অর্থ—

সেই প্রাচীন যুগে বারাঙ্গনাদের শেখানো হতো চতুষষ্ঠী কামকলা! সেই পুরানোকালের শিল্পমণ্ডিত কামকলার নগ্ন রূপ প্রকটিত হয়ে উঠলো পরবর্তীকালের বেশ্যাদের বাবুকে কাবুতে আনিবার ছলাকলার ভেতরে। বয়স্কা বেশ্যা বলছে—বাবুকে বশে আনতে হলে ছয় "ছ"-এর শিক্ষা নাও। ছলনা, ছেনালি, ছেলেমি, ছাপান, ছেমো, ছেচড়ামি—(১২)

ছলনা, ছেলেমি—সবই তো বুঝলাম— কিন্তু ছেনালি কি মাসী ?

হা ভগমান তাও বুঝলি-নি। প্রাচীনা বেশ্যা বলে, শোন বাছা প্রাচীন এক কবি বলেছে—

> ফচকে রাঁড়ের চুলবুলনি, জোয়ান রাঁড়ের ছাতা,
> বুড়া রাঁড়ের পুরাণা কথা আধবয়সীর মাথা—

একটু থেমে বুড়ি আবার বলে, "প্রথমত যে রাঁড়েদের বয়স অল্প তাঁহারদিগের

(১২) নববিবিবিলাস—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৫৩

চলন স্বভাবত হুড়াহুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, গালাগালি, খেলাখেলি ইত্যাদি যত করিবে ততই শোভা পাইবে ; দ্বিতীয়তঃ যৌবনাবস্থা হলে তাহাদিগের ধন কেবল দুই স্তন তাহাকেই ছাতা করিয়া প্রাচীন কবি ব্যাখা করেন, সেই মনোহর ছাতা দেখাইয়া যুবতীরা বাবুদিগের মন হরণ অর্থাৎ ছাতা দিয়ে মাথা রাখেন—

হয়েছে—হয়েছে আর তোমাকে বলতে হবে না—তরুণী রূপোপজীবিনী তাকে থামিয়ে দেয়।

এই বিবেকহীন, নিষ্ঠুর হিতাহিতজ্ঞানশূন্য বাবুরা আর হীনা এই বার-বিলাসিনীরা শহর কলকাতাকে নরককুণ্ড করে তুলেছিল। তাই তদানীন্তন-কালের বুদ্ধিজীবিদের অগ্রগন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ আক্ষেপ করে বলেছেন কল্‌কেতা শহর এই মহাপুরুষদের জন্য বেশ্যাশহর হয়ে পড়েছে। এমন পাড়া নেই যেথায় দশ ঘর বেশ্যা নেই…শুধু এই প্রসঙ্গে তিনি তদানীন্তকালের লেজিসলেটিভ কৌন্সলে যে আবেদন করেছিলেন, সেই আবেদনটি তখনকার দিনের বিখ্যাত দৈনিক সংবাদ প্রভাকরে ছাপা হয়েছিল—সেই আবেদন পত্রের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো—(১৩)

মহামহিম ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়গণ সমীপেষু। সবিনয় নিবেদন।

বারযোষাকুল সমস্ত রাত্রি মদ্যপান দ্বারা গীতবাদ্যাদির কোলাহলে এত উৎপাত আরম্ভ করে যে ভদ্রলোকমাত্রেই উক্ত পল্লীতে শয়নাগার ত্যাগ করণে বাধ্য হন…বঙ্গদেশীয় ধনবান্‌গণ স্বীয় স্বীয় বসত বাটীতেও অধিক ভট্টালোভী হইয়া ভদ্রপল্লী মধ্যে বেশ্যাগণকে স্থান দান করিয়া অতুল সু প্রাপ্ত হইতেছেন। তদ্বারা একঘর বেশ্যাবৃদ্ধি হইবার সেই ভদ্রপল্লী একেবারে অভদ্র নিয়মে পরিপূর্ণ হইতেছে। অতি নির্মল নিষ্কলঙ্ক ধনবান্ মান্য বংশের প্রাসাদের নিকটেই বেশ্যানিকেতন ভয়ানক ব্যবহার প্রদর্শিত হইতেছে। অতএব হে সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা মনযোগী হইয়া বেশ্যাগণকে নগরের প্রান্তে একত্রে নিবসতির আজ্ঞা করুণ…

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার সম্পাদক, হুতোম প্যাঁচার নক্সার লেখক, চিন্তাশীল ও সমাজসচেতন মনীষির এই ব্যাকুলতার ভেতরে বাবু গৌরবে গরবিনী কলকাতার সর্বনাশা অবক্ষয়ের চিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

---

(১৩) সাহিত্যসাধক চরিতমালা—কালিপ্রসন্ন সিংহ—প্রথম খণ্ড পৃঃ-২০

কিন্তু কোথায় গেল বাবুরা? কোথায় গেল তাদের সেই অতুলনীয় বৈভব আর অপরিমেয় ঐশ্বর্যের বিষময় পরিণতি—তাদের সেই বিচিত্র বিলাসীতা আর লজ্জাজনক ব্যভিচার। কালের নিয়মেই তাঁরা বিস্মৃতির অতলে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। হুতোমের ভাষাতেই বলতে হয়, নদীর স্রোতের মত, বেশ্যার যৌবনের মত ও জীবনের পরমায়ুর মত একদিন তাদের সব আড়ম্বড় কোথায় হারিয়ে গেল। কিন্তু তাদের কি রইল?

বেড়ালের বিয়েতে লাখটাকা খরচ করা, ঘুড়ি উড়ানো, বুলবুলির লড়াই করানো আর বেশ্যাবাজীর বিলাসীতা ছাড়া এমন কোন কালজয়ী কীর্তি তারা রেখে যায় নি যে অনাগত কালের মানুষ তাদের মনে রাখবে।

তবে হ্যাঁ—তাদের একটি জিনিস আজও আছে এই শহর কলকাতার বুকে এবং তার উপকণ্ঠে। সেটা হলো—বাবুদের বিলাসের সহচরীদের সুদৃশ্য প্রাসাদোপম সৌধগুলো। তাই হুতোম বলেছেন, 'অনেক বড় মানুষ বহুকাল হলো মরে গ্যাচেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের বাড়িগুলি আজও মনুমেণ্টের মত তাঁদের স্মরণার্থ রয়েছে—সেই দোতলা কি তিনতলা বাড়িটি ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর এমন কিছু কাজ হয়নি, যা দেখে সাধারণে স্মরণে রাখে—'

শুধু হুতোম নয়, তখনকার দিনের বাউলগানেও আছে এই বেশ্যানিকেতনগুলোর উল্লেখ—

> আজব শহর কলকেতা।
> রাঁড়ি, বাড়ি, জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।
> খ্যামটা খানকির খাসা বাড়ি, ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা।

কলকাতা থেকে নৈহাটি পর্যন্ত গঙ্গার ধারে ধারে ভগ্ন বিলুণ্ঠিত অনেক সৌধের ধ্বংসাবশেষই বাবুদের বিলাসিনীদের স্মৃতি বহন করছে। এইসব জীর্ণ বিধ্বস্ত প্রাসাদগুলোর সরু সরু ইটের পাঁজায়, তাদের খিলানে, কার্নিশে অদৃশ্য কালিতে যেমন লেখা আছে বাবুদের প্রমত্ত নিশিযাপনের সুখস্মৃতি তেমনি আছে সুন্দরী বাঈজীকে কেন্দ্র করেই তাদের কত রেষারেষি, খুন-জখমের ভয়াবহ আর লোমহর্ষক ইতিবৃত্ত।

"নগরসুন্দরী"র এই বাবু-কলকাতার পর্বের উপাদান খুঁজতে খুঁজতেই একদিন হাজির হয়েছিলাম খড়দহে গঙ্গার ধারে এই রকম একটি ভগ্ন আর জীর্ণ প্রাসাদে। আর সেই একদা সুদৃশ্য সৌধের মালিক এক বিলাসী 'বাবু'র ওয়ারিশের কাছে জেনেছিলাম—সেই বাড়িটি নাকি এমন অসাধারণ

এক সুন্দরী বাঈজীর, যার অপরূপ রূপলাবণ্য দেখে তদানীন্তনকালের সুপ্রীম কোর্টে ইংরেজ জজ সিটন বলেছিল, এই সুন্দর মুখখানার জন্য একটা কেন ; আমি দুশোটা মানুষ খুন করতে পারি—জেনেছিলাম সেই বেশ্যানিকেতনের এক রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত—

এই গঙ্গার পাড়েই লাটাগাছ আর কাটাঝোপে ছেয়ে থাকা ধ্বংসজীর্ণ একটি বিশাল অট্টালিকার সামনে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পড়তে হল।

ভাঙ্গা বাড়িটার একটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ল। সেকালের মত সরু সরু ইটের তৈরি চকমিলানো দালান নয়। রীতিমত রক্তবর্ণ পাথর দিয়ে গেঁথে গেঁথে গঙ্গার ভেতর থেকে তোলা হয়েছে বাংলো ধরনের সুদৃশ্য সেই প্রাসাদ হয়তো সুপ্রাচীনকালের কোন বাবু অর্থাৎ ধনী-বিলাসী জমিদার মহারাজার প্রমোদভবন ছিল ওই বাড়ি।

কিন্তু আজ মহাকালের চিহ্ন পড়েছে তার সর্বাঙ্গে। চারদিকের প্রাচীরগুলো ভেঙ্গে চুরে গড়িয়ে গিয়েছে নদীর খাদের ভেতরে। ভাঙ্গা ইট-পাথরের স্তূপের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে গঙ্গার জলে রোদ আর কুয়াশার খেলা। প্রায় সবটাই ভেঙ্গে গিয়েছে। কোনরকমে কাত হয়ে শুধু দাঁড়িয়ে রয়েছে সম্মুখের দুটো ঘর। তাদেরও দেওয়ালে সবুজ শ্যাওলার পুরু আস্তরণ পড়েছে। মেঝেজুড়ে বনতুলসী আর বিছুটির ঝাড়! নদীর ওপর দিয়ে বয়ে আসা শোঁ শোঁ বাতাস শুধু প্রেতিনীর কান্নার মত বেজে চলেছে বাড়িটির চারিদিকে! জনমানবহীন নির্জন শ্মশানের মত নিস্তব্ধ সেই নদীতীরে একদা মনোরম সেই বিলাসকুঞ্জের অন্তিম ভগ্নদশা যেন স্মরণ করিয়ে দেয় সেই অমোঘ সত্য—ঐশ্বর্য, বৈভব, দম্ভ, রূপ, যৌবন, থাকে না—কিছুই থাকে না—

কিন্তু কার এই প্রমোদ ভবন? কবে—কবে কত শত বছর আগে সেই বিলাসী পুরুষ আর তার প্রেয়সীর মিলিত গলার উচ্ছ্বসিত হাসিতে মুখরিত হয়ে থাকত এই বাড়ি; কবে তারা গবাক্ষে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে গঙ্গার নিস্তরঙ্গ শোভা দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে যেত?

সাবেক দিনের কত নিজন দুপুরে, নিশি রাত্রে, ধূপছায়া সন্ধ্যায় তাদের উদ্দাম প্রেমের ছন্দোসুরভিত সেই মুহূর্তগুলোর ইতিহাস যদি জানা যেত! সেই বিচিত্র বাড়িটির ভগ্ন-স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে হাজারো প্রশ্ন আর অনেক কৌতূহল আমার মনে ভিড় করে এল।

কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। এখনও গেটের দুটো স্তম্ভ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

যদিও সে পড়েছে তার পলেস্তারা, এখানে সেখানে বেরিয়ে পড়েছে ইঁট—তবুও ডানদিকের পিলারের মাঝখানে শ্বেত-পাথরের ফলকে কি একটা নাম লেখা আছে বলে মনে হল। বহুবছরের বর্ষার জলে, রোদে কেমন ঝাপসা আর অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে তার অক্ষরগুলো। ক্ষীণ আলোয় যেমন করে পুঁথি পড়ে তেমনি করে নামটা পড়েই চমকে উঠলাম।

সৈকত!

এ কী সেই সৈকত যেখানে বসে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য কবি কান্তি চন্দ্র ঘোষ ওমর খৈয়ামের রোবোয়াৎ-গুলোর স্বচ্ছন্দ আর অনবদ্য অনুবাদ করেছিলেন। আমার মনের ভেতরে গুন-গুন করে উঠল কালজয়ী সেই রোবাইয়াৎ—

'উর্ধে অধে, ভিতর বাহির, দেখছো যা সব মিথ্যা ফাঁক
ক্ষণিক এসব ছায়ার বাজী, পুতুল নাচের ব্যর্থ জাঁক।'

না কি, 'সৈকত' নামে অন্য কোন বাড়ি? কিন্তু এই তো খড়দার গঙ্গা, তাহলে?

কি দেখছেন? এক বৃদ্ধ সামনে এসে দাঁড়াল। মাথার চুলে কাশ ফুলের রঙ ধরেছে। চোখে-মুখে আভিজাত্যের ছাপ।

'আচ্ছা বলতে পারেন, এ কী সেই 'সৈকত' যেখানে ওমর খৈয়ামের কবি কান্তি ঘোষ—'

হ্যাঁ ঠিকই অনুমান করেছেন, ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে একটা অতিকায় প্রেতচ্ছায়ার মত সেই বাড়ির ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে সে বলল, 'আজ থেকে ছাপ্পান্ন বছর আগে এই বাড়িতে বসেই কান্তি ঘোষ সুরা আর সাকীর গন্ধে মাতানো কবিতাগুলোর তর্জমা করেছিলেন, হঠাৎ থেমে গেল সেই বৃদ্ধ। কেমন গম্ভীর ও সুদূর হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টি। ঘুরে তমসাস্তীর্ণ গঙ্গার দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে দুঃস্বপ্নের ঘোরে বিড় বিড় করে বলার মত করে বলল, 'কান্তি ঘোষ তো ইন্‌স্পিরেশান পাবেই, এ বাড়ির প্রতিটি পাঁজরের পাথরে, খিলানে, কার্নিশে যে সুরা আর সাকীর উগ্র স্পর্শ মাখানো রয়েছে।'

কি রকম? আপনি কি এ বাড়ি সম্বন্ধে কিছু জানেন নাকি?

সে যেন আমার কথাটা শুনতেই পেল না। গঙ্গার ওপারে নিবিড় অন্ধকারে এক-একটা আগুনের ফুলের মত ফুটে থাকা কলকারখানার আলোগুলোর দিকে

তাকিয়ে সে একটু হেসে বলল, কান্তি ঘোষ মদ খেতেন না। কিন্তু লেখার সময় টেবিলে সাজিয়ে রাখতেন সারে সারে বিলেতী মদের বোতল আর রাখতেন অপরূপ এক সুন্দরীর ছবি।

সে কি!—কেন? কার ফটো? তার স্ত্রীর? আমি তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগলাম। তীব্র কৌতূহলে জলে যেতে লাগল আমার মাথার ভেতরটা।

আরে না—না মশাই, স্ত্রীর ছবি হবে কেন? বৃদ্ধ যেন একটু বিরক্ত হয়েই বলল, ওমর খৈয়ামের সুরা আর সাকীর সিম্বল—

সুরা তো বুঝলাম। সাকীটা কে? কার ফটো? সে কোন সুন্দরী?' তীব্র উত্তেজনায় আমার মাথাটা ভারী হয়ে উঠল। সেই অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ঘৃণায় আর বিরক্তিতে কেমন কঠিন হয়ে উঠল বৃদ্ধের মুখখানা। বিড়-বিড় করে বলল, আবার কার—সেই রাক্ষুসী রাঁড়ের, যার মোহে পড়ে বৈঠকখানার জমিদার বৈষ্ণবচরণ শেঠ আর এই খড়দার কোটিপতি অম্বিকে বিশ্বাস—ওই সৈকতের মালিক একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল—

হঠাৎ আমি ব্যাকুল হয়ে বললাম, আপনি 'সৈকত' সম্বন্ধে যেটুকু জানেন বলুন না?

যেটুকু কি মশাই? দপ করে জলে উঠল বুড়োর চোখদুটো, আমি স্বয়ং সেই অম্বিকে বিশ্বেসের বংশধর—আমি সবই জানি। একটু থেমে মাথা নীচু করে বলল, এ বাড়ির নারকীয় কাণ্ডকারখানা, সৈকতের পাটরাণীর সঙ্গ-সুখে বাধা দিয়েছিল বলে বিশ্বাসমশাই মানুষ খুন—

বলছেন কি মশাই! আমি চমকে উঠি। বৃদ্ধ গম্ভীর য় বলল, সুপ্রীম কোর্টের রেকর্ডেও আছে সৈকতের ইতিহাস—

থাক, আপনি অনুগ্রহ করে বলুন দাদু। তার হাত দুটো ধরে অনুরোধ করলাম।

সে বলেছিল। বলতে বলতে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে, কখনো তারার ভরা আকাশের দিকে হাত ছুড়ে ছুড়ে সে যে বৃত্তান্ত বলেছিল তা যেমন ভয়াবহ তেমনি দীর্ঘ। তার ভেতরেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে গণিকাচর্চার সর্বনাশা পরিণতি। এখানে সংক্ষেপে সেই ইতিবৃত্ত দেওয়া হল।

খড়দার সৈকতের বৃত্তান্ত শুনতে হলে যেতে হবে সেই দেড়শো বছর

আগেকার বাবু কলকাতায়—সেই যখন মেঝে জুড়ে কড়াপাকের সুগন্ধী সন্দেশ প্রায় দেড় হাত উঁচু করে বিছিয়ে তার ওপর সুদৃশ্য গালিচা পেতে মাইকেলের আসর বসানো হত, যখন ক্লাইভের মুন্সী রাজা নবকৃষ্ণ একাই দুর্গোৎসব উপলক্ষে সাহেব সুবোদের খানাপিনা করিয়ে এক লক্ষ টাকা খরচ করত, যে বাবু গৌরবের কলকাতার কথা বিশদ আলোচিত হয়েছে। সেই সময়ের কলকাতার স্বনামধন্য বিলাসী জমিদার বৈঠকখানার বৈষ্ণবচরণ শেঠ। জগৎ শেঠের বংশধর। অতএব অঢেল টাকা। ছাদের ওপরে রোদে শুকোয় কাঁচা টাকা। টাকা ছাড়াও কিন্তু বৈষ্ণবচরণের আর একটা নেশাও ছিল।

রূপের নেশা। সেকালের জমিদার মহারাজাদের মত তার জলসাঘরেও যে দু' একটা বাঈজীর আনাগোনা ছিল না তা নয়। কিন্তু তাদের যেমন মেদবহুল চেহারা তেমনি 'ম্যরি ছাঁইয়া' বলে যে কী কালোয়াতী ধরে শুনলে গা জ্বালা করে। বৈষ্ণবচরণের রুচি ছিল উঁচুদরের শিল্পীর মত। পশ্চিমের দেশ-দেশান্তরে মোসায়েব-অনুচরদের পাঠিয়ে খোঁজ আনতে বলত এমন এক বাঈজীর যার গায়ের রঙ হবে শেষ রাতের আকাশের মত। আর রজনীগন্ধার শীষের মত দীর্ঘ হবে তার দেহরেখা। সাধারণ বাঈজীদের মত গান জানলেই হবে না, গাইবে মিঞাকী মল্লার কি বিলাসখানী টোড়ী। সে গানের মধুর করুণ সুরের অনুরণনে তার স্নায়ু মাতাল হয়ে উঠবে।

পেয়েছিল। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেনারস, বেরিলী পশ্চিমের শহরগুলো ঢুঁড়ে খুঁজে আগ্রায় তার পছন্দমত যাকে পেয়েছিল তার নাম হীরাবাঈ। সত্যিই ভোরের আকাশের মত কালচে ছায়া ছায়া নীলাভ রঙ, রজনীগন্ধার সবুজ ডাটার মতই দীঘল আর তন্বী দেহসৌষ্ঠব। বৈষ্ণব-চরণের মনের ভেতরে যে ছবি আঁকা ছিল অবিকল সেইরকম। তবুও—

একটা কারণে তার মনটা খুঁত খুঁত করে। এখন থাক সেসব কথা।

হীরাবাঈ কলকাতায় পৌছানোর দিন দুয়েক পরেই বৈষ্ণবচরণের জলসা-ঘরে জ্বলে উঠল হাজার ঝাড়বাতির আলো। মেঝে জুড়ে পাতা হলো ইস্পাহানের পশমে রেশমে বোনা বিচিত্র কারুকার্য করা কার্পেট। আর ঘরের কোণে কোণে সোনার ধূপদানী থেকে গন্ধ ধূপের ছোঁয়ায় ভারী হয়ে উঠল বাতাস।

এল হীরাবাঈ। এল ধীর পায়ে। সাধারণ বাঈজীদের মত চটুলতা নেই, নেই সুর্মা টানা কালো চোখের কটাক্ষে আমন্ত্রণের হাতছানি। দীর্ঘ দেহ

পেঁচিয়ে পরেছে ভোরের শিশিরের মত নরম আর স্বচ্ছ মসলিনের শবনম শাড়ি। হাত দুটো জোড় করে ছোট্ট একটা নমস্কার করেই গান ধরল হীরাবাঈ—

ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িয়াল বজাওয়ি
যো দিন যাওয়ি সো বাহুড়ি ন আওয়ি—

যে দিন যায় সে দিন আর ফিরে আসে না——মিঞাকী মল্লার রাগে সে-গানের করুণ মধুর স্বরে জলসাঘরের বাতাস কেমন আচ্ছন্ন ও বিবশ হয়ে এল। আর যেই গান শেষ হল, অমনি নিজস্ব পরিচারিকার সঙ্গে অন্দরমহলে চলে গেল হীরাবাঈ।

এ কী রকম বাঈজী, আমাদের সঙ্গে একটা কথাও বলল না—এত দেমাক—

হুঁ, কথা তো দূরের কথা, মুখ থেকে ওড়নাটা পর্যন্ত সরাল না—

শ্রোতাদের ভেতরে বিরক্তির গুঞ্জন ফুটল। বৈষ্ণবচরণ বলল, খানদানী বাঈজী। মুখের ওড়না সরাবে না, আর একমাত্র আমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে একটা কথাও বলবে না—এই দুটো শর্তে সে আগ্রা থেকে এসেছে।

কেউ একটা কথা বলল না। শুধু ভেতরে ভেতরে নিঃশব্দে জ্বলে যেতে লাগল। কেউ দু'এক ঢোক মদ খেল, কেউ খেল না। ক্ষুণ্ণ মনে একে একে সব বিদায় নিল। গেল না—গেল না শুধু একজন—অম্বিকা বিশ্বাস।

বৈষ্ণবচরণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দেশজুড়ে তার তেজারতির কারবার। খড়দার ডাকসাইটে জমিদার অম্বিকা বিশ্বাস। মুচকি হেসে আর ভ্রূ-দুটো নাচিয়ে বেশ অর্থপূর্ণ একটা ইঙ্গিত করে বলল, হ্যাঁরে বৈষ্ণবচরণ—তোর কা..ও কি মুখের ওড়না সরাবনি?

মাথাটা ঝাঁকাল বৈষ্ণবচরণ। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আরে না রে ভাই—একেবারে জাত কেউটে। কাছে গেলেই ফোঁস করে ওঠে।

অম্বিকা কথা বলে না। তার জমিদারী রক্তে আগুন ধরে যায়। একটা বেশ্যা মাগীর এত দেমাক! দাঁতে দাঁত চেপে বলে, তুই একদিন—এক রাত্তিরের জন্যে আমার কাছে পাঠাবি ওকে?

হো হো করে হেসে উঠল বৈষ্ণবচরণ। হাসির দমক কমলে বলল, হীরাবাঈ যাবে তোমার ওই এদো পুকুরে ভরা অজ পাড়াগাঁয়ে! একটু থেমে তাচ্ছিল্যে মুখখানা বেঁকিয়ে বলল, আর এক রাত্তিরের জন্য জান ওর কত ফি?

কত?

এক হাজার মোহর।

আমি দু হাজার দেব।

তোমার খড়দার সারা জমিদারীটা লিখে দিলেও যাবে না হীরাবাঈ।

একটি কথাও বলল না অম্বিকা বিশ্বাস। রাগে অপমানে তার মুখখানা অমানুষিক হয়ে উঠল। চোয়াল দুটোকে খিলের মত শক্ত করে বলল, আচ্ছা, যায় কিনা দেখা যাবে। আহত সাপের মত তীব্র প্রতিহিংসার বিষ বহন করে চলে গেল খড়দার জমিদার।

আগ্রার খানদানী বাঈজী হীরাবাঈ যেমন কখনো মুখের ওড়না সরাতো না তেমনি তার আরও একটা বাতিক ছিল।

গঙ্গা স্নান। প্রতিদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে তার গঙ্গায় অবগাহন করা চাই। শেষ রাত্রে বৈঠকখানা (গোবিন্দপুর) অঞ্চলেব লোক শুনতে পেত পালকীর বেহারাদের একটানা গান—

বাঁয়ে কালো হাতি হিঁপ্পো—

হিপ্পোলো হুকুমম্মা—

পালকীশুদ্ধু জলে ডুবিয়ে স্নান করানো হত হীরাবাঈকে। একদিন পালকী নিয়ে বেয়ারারা পাড়ে উঠে আসবে অমনি কোথা থেকে একদল দুর্বৃত্ত ঝাঁপিয়ে পড়ল বাজপাখির মত। ভয়ে পালিয়ে গেল পাইক বরকান্দাজ আর বেয়ারারা। শেষরাতের ঝুকি ঝুকি অন্ধকারে সেই অপরূপ রূপসীকে বহন করে কোথায় উধাও হয়ে গেল পালকী।

সবই বুঝতে পারল বৈষ্ণবচরণ। কিন্তু টুঁ শব্দটি করল না। মর্যাদায় বাধল। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন, প্যারীচাঁদ, ডাফ সাহেব ইত্যাদি সেকালের কলকাতায় মানীগুণী লোকের সঙ্গে যার ওঠাবসা সে একটা বাঈজীর জন্য দাঙ্গা হাঙ্গামা কি থানা পুলিশ করতে পারে না।

হীরাবাঈকে সৈকতে এনে তুলেছিল অম্বিকা বিশ্বাস। তারপর যা হয়ে থাকে।

খড়দার জমিদার অম্বিকা বিশ্বাস ছিল যেমন অত্যন্ত সুপুরুষ, দীর্ঘ গৌরবর্ণ চেহারা, তেমনি ছিল তার প্রচণ্ড পৌরুষ। সেই সব কারণেই হয়তো হীরাবাঈয়ের মন টলেছিল। হীরাবাঈয়ের আদরে ভালবাসায় উচ্ছ্বসিত আনন্দ টলোমলো দশ-দশটা বছর সময়ের পাখায় ভর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল।

একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিল অম্বিকা বিশ্বাস। বিষয়-আশয় জমিদারীর যাবতীয় ভার দেওয়ান চিন্তাহরণের ওপর ছেড়ে দিয়ে সে যেন এক সুখ স্বপ্নের রাজ্যে বাস করত। কখনো কখনো দেখা যেত সন্ধ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন গঙ্গার বুকে আলো ঝলমলে ময়ূরপঙ্খী ভেসে চলেছে। গান ধরেছে হীরাবাঈ—'পিয়া গিয়ো পরদেশ'—

আবার চাঁদনী রাতে দেখা যেত সৈকতের ছাদে কোন নিপুণ চিত্রকরের আঁকা হরগৌরীর ছবি হয়ে তারা বসে থাকত। প্রায়ই নাকি বিশ্বাস মশাই বলত, 'জানো হীরা' তোমার সঙ্গসুখের এই মুহূর্তগুলোকে মণি-মুক্তার মত মূল্যবান মনে হয়।

আমি তুচ্ছ একটা বাঈজী, হীরাবাঈ মাঝে মাঝে তাকে সজাগ করে দেওয়ার চেষ্টা করত, আমার জন্য তুমি বাড়ি ছেড়েছো, বিষয়-আশয় জমিদারী—

না—না ওসব কথা বল না—বল না হীরা, কেমন আচ্ছন্নের মত বলত বিশ্বাস মশাই, তোমাকে ছাড়া—আর কিছু ভাবতে পারি না—ভাবতে চাইনা—

জমিদারবাবু বিরক্ত হবে জেনেও দেওয়ান চিন্তাহরণ আসত। জমিদারী সংক্রান্ত গোলমালের কথা বলার চেষ্টা করত। যাও যাও এখানে কেন আসো—তোমাকে কতবার নিষেধ করেছি—এখানে এস না, ঘেয়ো কুকুরের মত তাড়িয়ে দিত।

একদিন ঘটে গেল সেই দুর্ঘটনা। সেদিন ছিল ঝড় জলের রাত। তার ওপরে আবার ছিল অমাবস্যার ঘুটঘুটি অন্ধকার। প্রতিদিনের মত সেদিনও হীরাবাঈয়ের কবোষ্ণ সান্নিধ্যে প্রমত্ত নিশি যাপন করছিল অম্বিকা বিশ্বাস। আর যখন তাকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরে নিবিড় এক সুখের আবেশে একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছিল ঠিক সেই অসময়ে বেজে উঠল দরজার কড়া—খট-খট-খট।

কে এখানে? রুদ্ধ আক্রোশে চিৎকার করে উঠল বিশ্বাস মশাই দেওয়ালে ঝোলানো টাঙ্গীটা হাতে নিয়ে দরজা খুলেই ঘন অন্ধকারে আগন্তুকের ছায়াদেহ লক্ষ্য করে বসিয়ে দিল কোপ। সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। আহত মানুষটা নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে বলল, বাবু—জঙ্গল মহলের জমিটার কাল নীলামের ডাক।

'চি—ন্তা—হরণ তুমি ! এ আমি কী করলাম ! বদ্ধ উন্মাদের মত চিৎকার করে উঠল অম্বিকা বিশ্বাস। সেই আঘাতেই মারা গেল চিন্তাহরণ।

আলিপুর কোর্ট থেকে সুপ্রীম কোর্ট * পর্যন্ত গড়িয়েছিল। জজ সাহেব সিটনকার বলে বসল, যে বাঈজীর সঙ্গ-সুখের ব্যাঘাতের জন্য মানুষ খুন করেছিল আসামী, তাকে কোর্টে হাজির করো।

মুহূর্তে বাতাসের বেগে খবর রটে গেল হীরাবাঈকে আদালতে উপস্থিত হতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল কোর্ট। হীরাবাঈ উঠল কাঠগড়ায়। কিন্তু হতাশ হয়ে গেল দর্শকরা।

কি দেখবে ? ওড়নায় তো মুখ ঢাকা হীরাবাঈয়ের।

জজ—আপনাকে ওড়না খুলতে হবে।

হীরাবাঈ—বাইরের কোন লোকের সামনে আমি কখনো তা করি না।

জজ—খুলুন ওড়না—নইলে আদালত অবমাননার দায়ে পড়বেন।

তবুও খুলল না ওড়না। তখন জোর করেই সরিয়ে দেওয়া হলো মাকড়সার জালের মত স্বচ্ছ তার সেই 'ঝুনা' মসলিনের তৈরি সুদৃশ্য ওড়না। আদালত ঘরে যেন বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল চমকে উঠল—দর্শকদের চোখের দৃষ্টি। আর ইংরেজ জজ সিটনকারের অপলক দুটো চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি ফুটে উঠল—সত্যিই আশ্চর্য সুন্দর মুখশ্রী! অস্ফুটস্বরে বলেছিল, এই মুখের জন্য আমি একটা কেন—আমি দুশোটা মানুষ খুন করতে পারি—

এসব ১৮৬৮ সালের কথা।

এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল সেই বৃদ্ধ। অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা সৈকতের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে আবার আস্তে আস্তে বলেছিল,সেই দুর্ঘটনার পঞ্চাশ বছর পর কবি কান্তি ঘোষ এই সৈকতে বসেই ওমর খৈয়ামের অনুবাদ করেছিলেন। তখন বাড়িটার কণ্ডিশান খুব ভাল ছিল। নদীর ভাঙ্গনে ওই হাল হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে।

আর একটি কথাও বলল না সে। সৈকতের সেই অভিশপ্ত শ্মশানপুরীর দিকে তাকিয়ে বিনিদ্র এক শ্মশান-পালের মতই চুপ করে বসে রইল।

বিগত শতকের সাত ও আটের দশকেই শহর কলকাতার বাবু-গৌরবে

---

* তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টই আধুনিক কালের কলকাতার হাইকোর্ট।

পড়ল ভাটার টান। কালের নিয়মেই বাবুদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিলাসের সহচরীরাও তলিয়ে গেল বিস্মৃতির অতলান্তে।

হাজার হাজার বছর আগে যাদের আলোকজ্জল প্রাসাদের সুরম্য কক্ষ বীণা-মুরজ-মুরলীর ঝঙ্কারে ও নূপুর নিক্কনের ধ্বনিতে মুখরিত থাকতো আজ তাদেরই উত্তরসূরীদের বস্তিতে খোলার ঘরে অভিশপ্ত অন্ধকার খাঁ খাঁ করে।

এখানকার যে রাত্রির অপ্সরীরা ধোঁয়া ওঠা কেরাসিনের ডিবের আলোয়, সস্তার পাউডার মাখা কৃশ করুণ মুখখানাকে উজ্জ্বল করে নাগরের জন্য অপেক্ষা করে; কিম্বা জনাকীর্ণ আর আলোঝলমলে রাজপথে কোন গাড়িবারান্দার নীচে ছায়া ছায়া অন্ধকারে একটা প্রেতিনীর মত শিকারের আশায় দাঁড়িয়ে থাকে তাদের দেখে মনে হয়—

মনে হয় সেই অসাধারণ বুদ্ধিমতী নগরসুন্দরী সুলসা, আয়ুর্বেদশাস্ত্র বিদুষী শালবতী ভরতের নাট্যশাস্ত্রবিশেষজ্ঞ মন্দার, ধ্রুবস্বামিনী, আনারকলি, লালকুঁয়ার শমশেরবেগম, লোলা মন্তাজরা সব—সব যেন—

সুদূর এক একটা স্বপ্ন।

—*—